নিবেদন

কিছুকাল থেকে পত্র-পত্রিকা ও মুদ্রিত পুস্তকে চল্লিশ দশকের সংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য এবং সেগুলির বিশ্লেষণ সম্বলিত রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। যেহেতু ঘটনাগুলি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে ঘটেছে এবং সেগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংস্কৃতি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি প্রভাবান্বিত হতে পারে তাই সেই আন্দোলনের একজন অংশীদার হিসাবে আমার বক্তব্য যা' ছিল—তা' উৎসাহী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ লক্ষ্য করেছি অনেক আলোচক প্রসঙ্গ ক্রমে আমার নাম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে মতবাদ মূলক বিতর্কে আমি কখন কোন পক্ষে ছিলাম যেন তাই কেবল তাদের বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য। আমার নিজের যে কিছু বক্তব্য রচনা হিসাবে সেই সময় প্রকাশিত হয়ে বিতর্কগুলিকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছে —কদাচিৎ সেগুলির কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

চল্লিশ দশকের সংস্কৃতি আন্দোলন মার্ক্সবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তখন বাংলা ভাষায় মার্ক্সবাদ সম্পর্কে লেখকের সংখ্যা প্রায় আঙুলে গুনে বলা যেত। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বিদেশী বইপত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল —বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের ফলে। তৎকালীন বাঙালী লেখকদের সকলের শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানসিক প্রস্তুতি এক রকমের ছিল না। ফলে মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির অবস্থা বর্ণনা, যুগের প্রধান সামাজিক বিকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় এবং সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংস্কৃতির নিজস্ব বিকাশের সমস্যা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল—আমার এই প্রবন্ধগুলির মারফৎ পাঠকরা তার কিছু অংশ পাবেন এবং গবেষকদের পক্ষে অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ হতে পারে।

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ যখন লিখি তখনো আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হইনি এবং ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের বক্তৃতাবলীর সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার জেলের বন্ধু ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন—তাঁর আগ্রহে তাঁদের সম্পাদিত 'নবপর্য্যায় ভারত'

কাগজের শারদীয়া সংখ্যার জন্য লিখেছিলাম। ঐ কাগজের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক গোপাল হালদার প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের গোচরে আনেন। তিনি 'অলকা' কাগজে সেই বছরের শারদীয়া পত্রিকা গুলির রচনার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকারের কিছু উদ্ধৃতির পর আমার প্রবন্ধটির প্রথম দিককার অনেকাংশের উদ্ধৃতি দেন। এই লেখার কিছু কাল পরে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রগতিলেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা যদি আমার Marxist cultural movement in India পড়েন এবং *প্রগতিলেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে* প্রদত্ত বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের প্রবন্ধগুলি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন প্রগতিলেখক সংঘের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনের বিতর্ক গুলির কিছু যুক্তি আমার প্রবন্ধে আছে। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে লেখা নিয়ে আমি 'প্রগতি সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের একদিকে' আলোচনা করেছি তাও তখনো আমার পড়ার সুযোগ হয় নি। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় বিনয় ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়, কারণ তিনি 'নবপর্য্যায় ভারতে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রগতি লেখক-সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে সরোজ দত্তের সঙ্গে আলাপ হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ-'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বোধকরি বাংলাভাষায় প্রথম সংক্ষেপে মার্ক্সীয় দর্শন বিষয়ক রচনা —১৯৭০ সালে আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু এই প্রবন্ধ পড়ে আজকালকার পাঠকরা বুঝতে পারবেন—কি পরিমাণ দার্শনিক পুঁজি নিয়ে আমরা কাজে নেমেছিলাম। সে যুগের আনন্দবাজার পত্রিকার অনেক লেখক আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে এই রচনা প্রকাশিত হয়—এবং ছাত্রফেডারেশনের সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধের মত আরো প্রবন্ধ লিখতে আমায় অনুরোধ করেন। 'অরণি'তে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য ও মার্ক্সবাদ' যখন লিখেছি তখন আমি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠক। সেই সময় শ্লোগান ধর্মী একটি গানের বই লিখেছিলেন আমাদের মহিলা নেত্রী কনক মুখার্জী এবং সেই গানগুলির সুর দিয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রধান সংগঠক বিনয় রায়। বইটি ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটি আমার ভাল লাগেনি—এই প্রবন্ধ লিখে আমি কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়ে নিয়েছিলাম। প্রবন্ধটি পড়ে কবি বিষ্ণু দে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন।

'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'পত্রিকা প্রসঙ্গে' একহিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাংলা শারদীয়া সাহিত্যের প্রথম আলোচনা। ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ অফিসে তারাশঙ্কর, মানিক, নারায়ণ গাঙ্গুলী, গোপাল হালদার প্রমুখ প্রবীণ ও তরুণ অসংখ্য লেখকের সামনে ছোট ছোট নোট দেখে বক্তৃতা করি—যা অধ্যাপক গোপাল হালদার সামান্য মার্জিত করে ছাপিয়ে দেন। নারায়ণ গাঙ্গুলী সম্পর্কে অল্প কথা বলেছিলাম বলে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন—কিন্তু তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস সরস মন্তব্য করে লিখেছিলেন *'রাণুর প্রথম ভাগ' না পড়লে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখার* রস আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়! 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'প্রেমচন্দজীর দান' এক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রেমচন্দ বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ। এই রচনার জন্য আমি আমার বন্ধু ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার কাছে ঋণী, অবশ্য আমি সেই সময় হিন্দি সাহিত্য পড়ার অভ্যাস ও রেখেছিলাম।

'অগ্রণী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত 'প্রগতি সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের একদিক' আমি ভট্টনায়ক ছদ্মনামে লিখেছি। তখন আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেছি—কিন্তু প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত আছি। এই প্রবন্ধে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম দিককার উপব যে প্রবন্ধ লিখি তাতে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশোভন সরকার বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার সমস্ত তথ্য সে যুগের 'পরিচয়ে' সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও প্রসিদ্ধ লেখক রাধারমণ মিত্রের মুখ থেকে শোনা। এই প্রবন্ধের জন্য বহু তরুণ আমাব বাসায় এসে পড়ে গেছেন এবং বাংলার বাইরেও কিছু উৎসাহী পাঠক প্রবন্ধগুলি সংরক্ষণ করেছেন তা' আমি নিজে দেখে এসেছি। 'পরিচয়' সম্পর্কিত আমার মন্তব্য বোধ করি হীরণ সান্যালকে উৎসাহিত করেছিল 'পরিচয়' সম্পর্কিত তাঁর ধারাবাহিক রচনায়। তাই আমার রচনার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে আমার মনে হয়। এই রচনায় প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং গণনাট্য সংঘের আদি উদ্যোক্তা কবি আলি সর্দার জাফ্‌রীর বিখ্যাত কবি ইকবালের সম্পর্কে একটি রচনার উল্লেখ আছে। জাফ্‌রী ইকবালের ফ্যাশিজম প্রীতি, পাকিস্তান গঠন সম্পর্কে মনোভাব ও অন্যান্য দুর্বলতাগুলির উল্লেখ করেছিলেন। দুই বছর আগে সারা ভারতে যে ইকবাল জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল—জাফ্‌রী তার সর্বভারতীয়

কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন এবং ইকবাল সম্পর্কে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কাগজে বড় প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু কোথাও সে সবের উল্লেখ নেই। ক'লকাতাতে ইকবাল সম্পর্কে যে সভা হয়েছিল—তাতে দেখলাম—মার্ক্সবাদী বক্তারা সেইসব বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ করলেন না। অথচ আমরা বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায় থেকে—এ যুগের নিত্যপ্রিয় ঘোষ এবং নক্‌শাল প্রভাবান্বিত তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো কম বিশ্লেষণ করিনি। মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিচারকে যতক্ষণ এই পরিস্থিতির রাজনীতি থেকে মুক্ত করা না যাবে—ততক্ষণ এই ধরণের হাস্যকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

'তারাশঙ্করের কমিউনিষ্ট-বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটি লেখা হয় তাঁর দুটি রচনার প্রতিবাদে। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় তিনি আমাদের অনেককে অত্যন্ত প্রশংসা করে কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। লেখাটি পড়ে আমি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বলি—একত্রে প্রতিবাদ লিখতে। কিন্তু তিনি বলেন, 'চেপে যান, আপনাকে তো অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন', তখন আমি গোলাম কুদ্দুস ও সরোজ দত্তকে আমার প্রবন্ধ দেখাই এবং তাদের উৎসাহে বিশেষ করে সরোজ দত্তের চেষ্টায় রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখার জন্য সজনীকান্ত দাসের নিজস্ব লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন এবং তিনিই তারাশঙ্করকে বারণ করেছিলেন—আমার জবাব না দিতে। শুনেছি এই লেখা পড়ে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরা থেকে যে প্রশংসা পত্র পাঠিয়েছিলেন—তা' আজো আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। 'কৃষক সমস্যা ও রামমোহন' সম্পর্কে এই প্রবন্ধ দিলাম এই কারণে যে আমার ইচ্ছা ছিল শাস্ত্র ও উপনিষদগুলি থেকে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত উল্লাসকর দত্তের পিতা দ্বিজদাস দত্ত ও অতুল গুপ্তের এদেশীয় ভূমি সমস্যা সম্পর্কে মতামত বিশ্লেষণ মূলক প্রবন্ধে আলোচনা করব। কারণ আমার দৃঢ় ধারণা এদেশের যে সকল বুদ্ধিজীবী আমাদের ভূমি সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করেন না—তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনা কখনো চরম উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। আমি নিজে ১৯৩৯ সালে রজনীপাম দত্তের India to day'র ভিত্তিতে 'কৃষি ভারতের নগ্ন রূপ' নামে বই লিখি—যাতে বৃটিশ সরকার নিযুক্ত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশগুলির ও আলোচনা ছিল।

অধ্যাপক গোপাল হালদার এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। ১৯৫২ সালে রামমোহন সম্পর্কিত এই তথ্যগুলির জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, ব্রাহ্ম সমাজের লাইব্রেরী প্রভৃতি অনুসন্ধান করে শেষ পর্য্যন্ত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বিনয় ঘোষ ও আমি 'বেঙ্গল হরকরা'র জরাজীর্ণ ফাইল থেকে এগুলি উদ্ধার করেছিলাম।

এরপর গণনাট্য সংঘের ইতিহাস সম্পর্কে ছোট একটা প্রবন্ধ দিয়ে পরে 'জনান্তিকে'র এবং 'গণনাট্য' কাগজে প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলি দিলাম—তা' সর্বভারতীয় গণনাট্যসংঘের সংকটকালের সম্পর্কে লেখা। কমিউনিষ্ট পার্টি ও তখনো বিভেদের মুখে। আমি ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে গণনাট্য সংঘের সর্বশেষ সর্বভারতীয় সম্মেলনে পদত্যাগ পত্র দিই। গণনাট্যের আদর্শও সংগঠন নিয়ে যে আদর্শগত বিতর্ক আমার সঙ্গে ষ্টিয়ারীং কমিটির অন্যান্য অনেক সদস্যদের হয়—তাতে বুঝি আমার মত পার্টি'র বাইরের লোকেরা আর ফ্রণ্টের ঐক্য রাখতে পারবে না। কনফারেন্সের মধ্যে পি, সি, জোশী একটি ক্যাম্পে থাকতেন এবং গণনাট্যসংঘের পার্টি সদস্যদের পরিচালনা করতেন। তিনি অবশ্য আমাকে সকলের বড় 'দাদার মত' মানিয়ে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি নীতির প্রশ্নে কোন আপোষের পক্ষপাতী ছিলাম না। চীন থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং কলকাতা থেকে আমি গণনাট্যের ঘোষণা সম্পর্কে পৃথক প্রস্তাব আলোচনার জন্য রাখি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫৩ সালে গৃহীত ঘোষণা পত্র সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়। এই সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমার Marxist cultural movement এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করব।

গণনাট্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির প্রকাশ কাল লক্ষ্য করতে আমার পাঠকদের অনুরোধ করি। পশ্চিম বাংলায় গণনাট্য সংঘ বর্তমানে খুব সক্রিয়। সারা ভারতের কোন কোন রাজ্যে গণনাট্য সংঘ নাম নিয়ে বা ভিন্ন নামে সি পি আই এবং সি পি আই (মার্ক্সিষ্ট) এর প্রভাবে কাজ হচ্ছে। আবার এমন কিছু সংগঠন আছে যেখানে পুরানো গণনাট্যের কর্মীরা সকল নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কাজ করছেন। সারা ভারতে গণনাট্য আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের আভাস দেখা যাচ্ছে। এই কাজে আমার প্রবন্ধগুলির কিছু যে ভূমিকা ছিল তা' গবেষকদের চোখে পড়বে। কারণ আজ যারা নেতৃত্ব করছেন—তাদের মধ্যে মধ্যকলিকাতা আড়িয়াদহ, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের কিছু গণনাট্য কর্মী ছাড়া প্রথমে কেউ

আমার পিছনে দাঁড়ান নি। মধ্যকলকাতার কিছু পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের সাহায্যে আমি 'নীলদর্পণ' 'কুলীনকুল সর্বস্ব' 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' অভিনয় করাতে সক্ষম হই। সেদিনের নেতাদের অনেকেই পুরো ডাঙ্গে পন্থী, কেউ নকশালপন্থী এবং কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় হওয়ার রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যবিল প্রতিরোধ আন্দোলনে রেভলিউশনারী সোসালিষ্ট পার্টির ক্রান্তি শিল্পী সংঘের কর্মীদের সাহায্য নিতে হয়েছিল— প্রাথমিক সংগঠনের জন্য। 'সংঘ' বনাম 'আন্দোলন', না 'আন্দোলন' বনাম 'সুবিধাবাদী নায়কতন্ত্র ?' প্রবন্ধে প্রায় কুড়ি বছরের গণনাট্যের ইতিহাস বলার চেষ্টা করেছি।

শেষে উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটারে' ছাপা আমার বিরুদ্ধে কুৎসার জবাবে যে দুটি দলিলের একটি সম্পূর্ণ এবং অপরটি আংশিক Photostat করে ছাপিয়েছি তা' ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসনের জন্য নয়। সংস্কৃতি আন্দোলনে আমাকে যারা জানেন যে আমি দীর্ঘ দিন ধরে নাট্য আন্দোলনের দুটি ঝোঁক— যার একটির প্রবক্তা শম্ভু মিত্র এবং অপরটির প্রবক্তা উৎপল দত্ত—তার বিরুদ্ধে তত্ত্বগত সংগ্রাম চালিয়েছি। বামফ্রন্টের প্রবল ইচ্ছা ছিল শম্ভুবাবু ও উৎপল দত্ত সমেত সকলকে একত্র করা এবং পার্টি ও মন্ত্রীদের স্তরে এ চেষ্টা হয়েও ছিল। কিন্তু শম্ভুবাবু রাজী হন নি—অপর পক্ষে উৎপলবাবু প্রথমে নকশাল এবং পরে প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের কিছু আগে পরিস্থিতি বুঝে কৌশল পরিবর্তন করেন এবং নির্বাচনে সি পি এমের পক্ষে ৮টি অনুষ্ঠান করে বামফ্রন্টের বড দলের নেতাদের আস্থা ভাজন হন। এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে যত লিখেছি তা এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। 'বহুরূপী' থেকে শম্ভুবাবুর সরে আসাতে সেখানকার অনেক সদস্যই আমার দীর্ঘদিনের সংগ্রামেব তাৎপর্য্য বুঝছেন। অপর পক্ষে বামফ্রন্টের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের প্রধান সাংস্কৃতিক যোদ্ধা এখন উৎপল দত্ত। অবশ্য যারা একদিন ইন্দিরা-সিদ্ধার্থের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলার নীতিকে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সাংস্কৃতিক নীতি বলেও চলেছিলেন – তারা যদি বামফ্রন্টের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে আসতে পারেন —তাহলে উৎপল বাবুর অপরাধ কেন মার্জনা করা হবে না এই যুক্তিই এখন প্রবল। স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় কামনাতে কিছু কাজ উৎপলবাবুর আগেই আমি করেছিলাম—কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জন-

সাধারণকে জানাতে হবে যে তাদের সংগঠিত শক্তিই এযুদ্ধে প্রধান অস্ত্র—টিনের তরোয়াল নয়।

সহজ করে বলার চেষ্টায় অনেক রচনার ভাষাও বাক্য গঠনের সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিনি—কিন্তু এখন তা' পরিবর্তন করা উচিত মনে করলাম না। আমার অনুজ প্রতিম ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস এবং আমার মেয়ে মিতালী ব্যানার্জী প্রবন্ধগুলির কপি করে দিয়েছে। তারা আমার বিশেষ আপনজন সুতরাং কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ নেই। আমার প্রীতিভাজন অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র বইটির নির্ঘণ্ট তৈরী করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু 'পুস্তক বিপণি'র তরুণ কর্মী শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার যে তৎপরতার সঙ্গে বইটি ছাপিয়েছেন—তা যদি পাঠক মহলে সমাদৃত হয় তাহলে আমি পরবর্তী প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের সুযোগ পাব। চলচ্চিত্র, থিয়েটার, বেতার, গ্রামোফোন প্রভৃতির শিল্পীও কলাকুশলীদের আন্দোলন শুরু করতে এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে যত লিখেছি, সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাসে তারও মূল্য আছে—এমন কথা আমার অনেক পুরানো সহকর্মীরা বলছেন। শরীর সক্ষম থাকলে নিশ্চয় তাদের আশা পূর্ণ করতে পারবো। ইতি

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের স্বরূপ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বুঝতে হলে ইউরোপীয় ও বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য জানা দরকার—এই তাগিদে এই প্রবন্ধ লেখা। অতি আধুনিক সাহিত্যের Cocktail, Marcovitch অথবা রাধা অনুরাধা দলের মন জানাজানির আখ্যানগুলি কাষ্টম অফিসারের সদ্য পাশ করা বিদেশী মালমাত্র। ঘটনাটা এক হিসাবে অনিবার্য্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাছোড়বান্দা রকমের দোকানদারী প্রেম শুধু ম্যানচেষ্টারের কাপড় রপ্তানীতে শেষ হয় নি, ব্যবসায়ের নানারকম উপকরণ সমেত বিলাতী বটতলার বইয়ের বাজারটাও সঙ্গে সঙ্গে উপহার দিয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রাপদ্ধতি তার অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত করে। সমষ্টিগত চিন্তা যা সাহিত্যে, ধর্মে ও দর্শনে প্রকাশ পেয়েছে তার জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে হলে ব্যক্তি বিশেষের মগজের দিকে না তাকিয়ে—সমাজে বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার আলোচনা করলে মিলবে। যে কালে সমাজে কৃষিপ্রধান ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল সে কালের সাহিত্যে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলায় যদি ঘোড়া ছাগলের উৎপাত বা দেব দৈত্যের হানা হয়ে থাকে তো আজ তা শুনে লোকে আশ্চর্য্য হয় না। তেমনি আধুনিক সমাজের জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের হাজারো রকম অসুবিধা সৃষ্টি করেছে—ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন মুষ্টিমেয় অকেজো লোকের ব্যাঙ্কের সম্পত্তি। তাই এ সাহিত্যে বিরাট সমাজের বহু অংশের ছায়া পড়ে না—পড়বার উপায়ও নেই। কারণ উচ্চশ্রেণী একদিকে যেমন প্রচার করে থাকেন ধন-সম্পত্তি Minority efficiencyর অধিকারভুক্ত তেমনি সাহিত্য বস্তুটিও নিতান্ত ব্যক্তিগত। অতএব Minority culture এর অন্তর্গত। ইংরাজী সাহিত্যের এই নির্দ্দেশ বাংলা সাহিত্য এই কিছুদিন হ'ল মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে এদেশে যতটুকু শিল্পের প্রসার হয়েছে তারই ভিতর বাংলা সাহিত্য পল্লীর 'অরক্ষণীয়া' ছাড়িয়ে সহরের 'অমিতার প্রেম' এর ব্যাপারে উঁকিঝুঁকি মারছে এবং দক্ষিণ কলিকাতা যদি বেশী জনবহুল হয় এবং তাতে যদি সাহিত্যের জাতি-চ্যুতির আশঙ্কা থাকে—সেই জন্ম বালীগঞ্জের কেতাদুরস্ত ফাঁক ফাঁক বাড়ীগুলির

হলঘরের অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্বপ্নালোকিত কোণে বাংলা সাহিত্যের বাসস্থান ঠিক করা হচ্ছে।

গণসাহিত্য ? তার জন্য আছে বটতলা, ৬ পেনী সিরিজের ডিক্টেটিভ নভেল —দু'পয়সার দৈনিক সংবাদপত্র ও এক আনার সিনেমা সাপ্তাহিক। এতো গেল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠ্য—চাষীরা কি পড়ে জানতে চাইলে জানা যায় সস্তায় রামায়ণ-মহাভারত, চণ্ডী বা ফতিমা বিবির কেচ্ছা। সবদিক থেকে অনাহারের ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি করা হয়েছে। তা নাহলে পাছে মুখ খুলে যায়, পাছে বলে বসে সভ্যতার নামে কেন এমন করে অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতি রোধ করা হচ্ছে ? সর্বদেশের তথাকথিত কৃষ্টির মুষ্টিমেয় সেবকগণ এই সমস্যাকে অগ্রাহ্য করে মত্ত আছেন তাদের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতিকে আরো সূক্ষ্ম করার কাজে এবং তাদের ভোগক্লান্ত অসুস্থ মনের অবিরাম আত্ম-বিশ্লেষণ দুরারোগ্য রোগের মতই বেড়ে চলেছে।

সাহিত্যে রাজনীতি বা সমাজনীতিমূলক সমস্যা উঠবে একথা বল্লেই অনেক সাহিত্যিক বিব্রত বোধ করতে থাকেন এবং তারা যে শ্রেণীর সাহিত্য প্রচার করেন —সে শ্রেণী চিরকালই এই সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলতে চান। Swift তার Batttle of Book বইটাতে মৌমাছি ও মাকড়সা নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলেন। মৌমাছি হচ্ছেন সে কালের সাহিত্যিক। তিনি জানেন—যেহেতু তিনি ফুলের পাড়াপড়শি এবং একই প্রকৃতি রাজ্যের প্রজা সেইহেতু তিনি ফুল সংসর্গ করে থাকেন এবং ফুলের মধুও খেয়ে থাকেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিক মাকড়সা যে জাল বোনেন সকলেই তাতে জড়িয়ে পড়ে—তিনি যথাক্রমে তাদের রক্ত চুষে খান এবং বলে বেড়ান যে তিনি কারো ধার ধাবেন না এবং তার জাল স্বয়ম্ভূত ! সমাজ হতে সর্ব্বরকমে দূরে থেকে এবং সমাজের বিত্তের উপর যথারীতি ভাগ বসিয়ে অনেক সাহিত্যিক যে সাহিত্য প্রচার করছেন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরণের স্নায়বিক রোগগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ বচন। সেকালের সাহিত্যে এ দোষ ছিল না। এবং সাহিত্যিকরা সকলেই নামকরা Public man ছিলেন। সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সুখদুঃখের হিসাব তাদের নিতে হত। গ্রীক সাহিত্য তাই বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যের ছবিতে উজ্জ্বল। Pericles পরিষ্কার বলেছিলেন, যে সমস্ত লোক সাধারণের কাছ থেকে দূরে থাকে তাদের অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়। এমন কি গ্রীক প্রাইভেট পার্সন-এর প্রতিশব্দ—ইডিয়ট !

গ্রীকদের থেকে আমরা যে আত্ম-সচেতন সেকথা আজ অস্বীকার করবার

উপায় নেই, কিন্তু মেকী শ্রেণী বিভাগের আমলে এসে এই আত্ম-বোধটা তথা-কথিত কালচার আর রিফাইনমেণ্টের নামে আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দৈনিক জীবনযাত্রার বাস্তব সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে পারাটাই শিল্পীর চরিত্রের বিশেষ গুণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। গ্রীসে এই ভূয়ো সম্মানের বালাই ছিল না—জীবনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির আলোক ছিল সাহিত্যের মূল ভিত্তি। ক্ষুদ্র পারি-বারিক গণ্ডী ও ব্যাঙ্কের টাকার ব্যবস্থা গ্রীসে প্রচলিত ছিল না। প্লেটোর 'রিপাবলিকে' 'পারিবারিক জীবনের নাম গন্ধ নেই, তবু একথা মনে রাখতে হবে যে গ্রীসের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও দাস প্রথার উপর। রূপার খনিতে ও মারবেল পাথরের পাহাড়ে দিনের পর দিন দাসেরা প্রাণ দিয়েছে—তাই গড়ে উঠেছিল ফিডিয়াসের তৈরী হোমারের স্বপ্ন—তাই সম্ভব হত সত্য, শিব ও অমরত্বের প্রশ্ন নিয়ে সক্রেটিসের আলোচনা। এই আলোচনা সমস্যা তুললো রাজনীতি, সমাজনীতি ও জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে; শাসকবর্গ সহ্য করতে পারলো না। পৃথিবীর আদি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দার্শনিককে তারা নির্বিরোধে হত্যা করলো। Pericles এর শিক্ষাগুরু Anaxagorus চাঁদকে পাথর বলায় তাকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। সে যুগের সাহিত্যিকরা জীবনের স্পন্দনে সাড়া দিতে গিয়েছিলেন সাহিত্যের পূর্ণ দাবীতে তাই তার দাম দিতে হ'ল এমনি করে।

Prof. Toynbee বলেছেন যে রোমের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্যিককে একই সঙ্গে ধ্বংস করে; ফলে সাহিত্যিকরা অভিজাত সম্প্রদায়ের চারণ হয়ে দাঁড়ায়। এথেন্সের নাট্যশালায় সুঅভিনয় দেখার জন্য সমগ্র এষ্টেটের লোক ভিড় করে থাকতো—রোমের রাজত্বে সেগুলি হ'ল—Amphi-theatre এবং রিক্তসর্ব্বস্ব পশুবৎ নাগরিকরা শাসকবর্গের নিমন্ত্রণে ওখানে আসতো—নৃশংস বর্ব্বরতা দেখতে। সমাজের বড় দিকটায় অপরিসীম দারিদ্র্য অপর দিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অপরিমিত সম্পদ। চিন্তাধারায় তাই দুটি মতবাদ দেখা দিল—Christianity ও Stoicism। সাহিত্যেও এর ছায়া পড়েছে। ডিমাগগ ক্যাটালিনা এক জায়গায় বলছেন: "তারা হ্রদের উপর অট্টালিকা নির্মাণ করে—পাহাড় কেটে উদ্যান বানায়—নিত্য নূতন আনন্দের জন্য যত রকম উপায়ে সম্ভব অর্থের অপব্যয় করে—তাদের মদমত্ত খেয়ালের যেমন সীমা নেই তেমনি সম্পদেরও শেষ নেই। অথচ আমাদের গৃহে দারিদ্র্যের করালছায়া, পথে পাওনা-দারের লাঞ্ছনা,—আমাদের বর্তমান অন্ধকার,—ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার।"

দারিদ্র্যের হতাশা ও অন্ধকার পথে যাত্রার কথা যেমন বেশ বোঝা যাচ্ছে তেমনি সেই সময়ে ধনীর ভোগক্লান্তি লক্ষ্য করার বিষয়। ষ্টোয়িক সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস তার "Meditation'-এ বলেছেন: "মানুষের জীবন কী ভঙ্গুর। ইন্দ্রিয়গুলি কত অল্পে নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ে।" ষ্টোয়িক দার্শনিক সেনেকা লিখেছেন: 'জগতের সকল বন্ধন থেকে মন যখন মুক্তি পায় তখনি সে মহান হয়ে ওঠে, তাই ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি।'

এর পর ১৮শ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে আসা যাক। এই সময়টা ইউরোপে শিল্প বাণিজ্য অবারিত ভাবে গড়ে উঠেছে, মূলধনী প্রথা কোথাও বিশেষ বাধা পায় নি। কারণ আজকের সোভিয়েট রুশিয়া বা কমিউনিষ্ট পার্টির মত জুজুর ভয় ক্যাপিটালিজমের ছিল না। হিসাবমত দুঃখও থাকা উচিত নয়। অথচ রাস্‌কিন ও উইলিয়াম মরিসের লেখা তুলে দেখাচ্ছি—ইতিহাসের বিচিত্র প্রকাশ। রাসকিন বলেন "A civilised nation of modern Europe consists in broad terms of (1) a half-taught, discontented and most penniless populace, calling itself—the people, of (2) a thing which calls itself a Government meaning as an apparatus for collecting and spending money, and of (3) a small number of capitalists, many of them rogues, and most of them stupid persons who have no idea of any object of human existence other than money making and gambling··· A certain quantity of literary men, saying anything they can be paid to say; of clergy men saying anything they have been taught to say and of nobility saying nothing at all, combine in disguising the action and perfecting the disorganisation of masses.

উইলিয়াম মরিস এক জায়গায় আর্ট সম্বন্ধে বলেছেন:

"Art, the joy of life, ruined by this sticky mass of useless luxury goods which is the product of competitive commerce and enslaves millions—in its manufacturer. The manufacturers sell them only by stirring up of a feverish desire for petty excitement, the outward token of which is known by the conventional name of fashion.

এই সঙ্গে কার্লাইলের কথা শুনুন :

"Hero-warship, heartfelt, prostrate admiration, submission burning, boundless for noblest, god-like form of man…। ক্রমওয়েল কার্লাইলের প্রিয় বীর ছিলেন এবং আজ কালকার ডুসেও ও ফুরারদের আর্কিটাইপ। এতক্ষণে সুইফ্‌ট-এর মাকড়সার দৃষ্টান্ত বোধকরি পরিস্ফুট হয়েছে।

এদের পরে বানার্ডশ'র কথা আনা যেতে পারে। তাঁর সমস্ত লেখায় তিনি বুর্জোয়া সাহিত্য, নীতি, বিবাহবন্ধন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। এবং বর্তমানে ইংলণ্ডে তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি সোভিয়েট রাশিযাকে খোলাখুলি সমর্থন করেছেন। এরই সমসাময়িক আর এক দল লেখককে দেখতে পাওয়া যায় যারা গণজীবনের সুখ-দুঃখ, অন্যায় অত্যাচারের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি অথচ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকের কাছে সাহিত্যিক বলে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং বলে বেড়িয়েছেন সামাজিক সমস্যার ছোঁয়া সাহিত্যে লাগলে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। ওয়াল্টার পিটার এই দলেব অন্যতম। তাঁর Renaissance and Marius the Epicurian বইতে তিনি লিখেছেন—For art comes to you, proposing frankly to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake·· Everyone of those impressions is the individual in his isolation ; each mind keeping as a solitary prisoner of its own dream of world· সেই গল্পের মাকড়সা আবার দেখা দিলেন তাই না ? এই ওয়াল্টার পিটার সাহিত্যে আর্ট ফর আর্ট সেকের নীতির প্রবর্তনকারী। এবং এই নীতি আজও অনেকে সোৎসাহে মেনে চলেন। রবীন্দ্রনাথও বারবার এইমত নানাভাবে সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভায় এই মতের বিপরীত ধারণারও প্রকাশ ঘটেছে বলে আমরা তাঁর স্ববিরোধিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা করি। কিন্তু তাঁর কিছু শিষ্যেরা ঐ নীতির আড়ালে সাহিত্যকে এমন পাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন যে যতক্ষণ তাদের শ্রেণী ধ্বসে না পড়বে ততক্ষণ সাহিত্যের নিস্তার নেই।

পিটারের নীতি অস্কার ওয়াইল্ড সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেন। অস্কার ওয়াইল্ডের মত প্রতিভাশালী লেখক পৃথিবীর সাহিত্যে খুব কমই আছে—কিন্তু

তার প্রতিভার সঙ্গে মিশেছিল সে যুগের বুর্জোয়া মনের রোগগ্রস্ত পঙ্কিলতা। 'পিকচার অব দ্য ডোরিয়ান গ্রে' রচনার ভূমিকায় যে কটি কথা অস্কার লিখেছেন তা পড়লেই বোঝা যাবে তার স্ববিরোধী মনোভাব: "All art is quite useless. Those who go beneath the surface do so at their peril. Beautiful things only mean beauty--books are well written or badly written. শেষে নিজের মাথায় নিজেই কুড়ুল মেরে বলছেন:

"The nineteenth century's dislike of realism is the rage of a caliban seeing his own face in the glass."পিটারের লেখা ছিল জীবনের নিত্য নূতন ছন্দে নিবিড় ভাবে হারিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, প্রতি মুহূর্তের হিসাব না করে যে মুহূর্ত আনন্দের সেটাকে মেনে নেওয়া এবং একটা বিস্তৃত কল্পনারাজ্যে বিচরণ করার আভাস। কিন্তু অস্কার তাকে সীমাবদ্ধ এবং গতিহীন করেছেন, স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন। 'Intention' এ অস্কার ওয়াইল্ড লিখছেন: "Life ! Life ! don't let us go to the life for the fulfilment of our experience. It is a thing too narrowed by circumstances. It is through art and through art only we can shield ourselves from the sordid points of existence." নিষ্ঠুর বাস্তবকে এড়িয়ে তথাকথিত শান্ত শীতল ছায়ায় যাওয়ার কি বিপুল আগ্রহ! জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা ওয়াইল্ড একা করেন নি। যুগে যুগে, এমন কি বহু আদর্শবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও—যার মধ্যে প্লেটো ও হেগেল পড়েন, করে গেছেন। তবে ওয়াইল্ডের বিশেষত্ব এই যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তার সাহিত্য নিস্ফল আবেগের মূলধনে গড়া।

এর পর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। দস্যুতার ইংরাজ না জার্মানি বড় এই প্রমাণ করতে গিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার নগ্নমূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তথাকথিত কালচার ও প্রগতির নাম করে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গত যুদ্ধে প্রমাণ হল যে সেটা পাশবিকতার নামান্তর মাত্র। ইংলণ্ডের অসংখ্য বেকার বুঝতে পারলো যে জাতীয় জীবনে তাদের দরকার ফুরিয়েছে। ১৯২৯ সালের অর্থ-নৈতিক সংকটে বর্তমান সমাজব্যবস্থার ভিত্তিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে, মূলধনী সমাজ ব্যবস্থার বোঝাপড়ার দিন এসেছে। তাই শাসক সম্প্রদায় ও তার লেজুড়দের মনে আতঙ্কের সীমা পরিসীমা নেই। গত যুদ্ধে

ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের অর্থ নৈতিক ক্ষতি বড একটা হয়নি—তাই ভোগের মাত্রা তাদের কম হয় নি। অথচ চারিদিকে পৃথিবীর যুদ্ধ ভয়। নিজেদের সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কায় একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে যাদের লেখায়—প্রবল নৈরাশ্য দেখা যায়। এদের মধ্যে নামকরা টি. এস. এলিয়ট, অল্ডাস হাক্সলে ও ডি. এইচ্-লরেন্স। অনেকে বলেন এ যুগের আধ্যাত্মিক দুরবস্থা এলিয়ট ভাল করে দেখিয়েছেন। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তিনিও ঐ আর্ট ফর আর্ট সেকের মতাবলম্বী। তিনি তাঁর 'The sacred wood' এ লিখেছেন: My meaning is that a poet is not a personality to express but a particular medium—the medium is poetry. এলিয়টের গুণমুগ্ধ রিচার্ড তার "Science and poetry" তে বলেছেন: "It is not the poet's businees to make true statement. অস্কার ওয়াইল্ডের 'Decay of telling lie" প্রবন্ধটি মনে করুন, দেখবেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। লরেন্স ঠিক এর বিপরীত। তাঁর জন্ম খনিমজুরের ঘরে, শিক্ষা পেয়েছিলেন বুর্জোয়া আঁওতায়, মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, তীব্র অভাববোধ এবং সর্বোপরি বুর্জোয়া সমাজের অধঃপতন তাঁর লেখায় মত্ত আবেগের বন্যা এনেছিল—কিন্তু সে আবেগ স্থায়ী হয়নি, দৃঢ় হয় নি, দূরদর্শী হয় নি। বুর্জোয়া সভ্যতার অধঃপতন, অন্যায় অত্যাচার তাঁকে এমনি ক্ষেপিয়ে তুলেছিল যে তাঁর রসানুভূতি জীবনের অপেক্ষাকৃত হালকা তরঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেল, তাঁকে সেক্স-অবসেস্ড নাম কিনতে হ'ল। অনেকে বলেন লরেন্স কোনও বিশিষ্ট সংগ্রামশীল মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন নি বলে তাঁর লেখায় এত অসঙ্গতি। কিন্তু তিনি যে বুর্জোয়া সভ্যতার দূষিত অবস্থাকে কিছু পরিমাণে প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। Psycho-analysis and the un-conscious-'এ লরেন্স বলেছেন: "The torture of psychic starvation which civilised people proceed to suffer once they have solved for themselves the bread and butter problem of alimentation will not bear thought. True unconscious will give you hint…এই আনকনশাস হচ্ছে অন্য অর্থে জীবন। এই জীবন তথাকথিত "India-rubber idea and ideals গেড়ে বসে রয়েছে তথা-কথিত" crop-headed, flat chested, chemicalised women and wambly wambly young men." একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের দরকার

লরেন্স তা বুঝেছেন অথচ সে পরিবর্তন কেমন করে কিরূপে হবে সে ধারণা তাঁর নেই।

এদের মধ্যে আলডুাস হাক্সলের নাম এদেশে বেশী লোকের জানা। ফরাসী সমালোচকেরা বলেন যে আলডুাস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আলডুাস আধুনিক সমাজের অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তাঁর তীব্র কষাঘাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায়নি। কিন্তু দোষ হয়েছে যে পচা, দূষিত যত সামাজিক ত্রুটি আলডুাস যেন নিজের গায়ে মেখে বসে আছেন এবং বলে বেড়াচ্ছেন ও রোগ সারবে না অথচ রুগীও মরবে না। আধুনিক বুদ্ধিজীবিদের ভণ্ডামী এ মেকীত্ব দেখাতে দেখাতে তাঁর নাক সিটকান স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। এর ফলে সমস্ত কিছুর উপর অবিশ্বাস। তাঁর Point counter Point ও Brave New World বই দুটিতে তিনি সিনিসিজমের চূড়ান্ত করেছেন। Brave New World-এ বিজ্ঞান পরিচালিত সমাজ কল্পনা করে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এতে করে বেশ প্রমাণ হয় যে নিছক সাহিত্যিক তিনি নন, এক হিসাবে তিনি তাঁর শ্রেণীতে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে সাফাই গাইছেন। Brave New World-এ যে সমাজ আঁকা হয়েছে সেটা সোভিয়েত রুশিয়ার ভবিষ্যত ভেবে, কিন্তু সেটা বস্তুতঃ ফ্যাশিজমের ভবিষ্যত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মাকড়সার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মাকড়সা মাকড়সাই থেকে গেছে। ইংলণ্ডের সাহিত্যে এযুগে কেউ সমস্যা এড়িয়ে যেতে চায় না, কারণ সাহিত্যিকরা দেখতে পেয়েছে তারা এড়িয়ে গেলে এমন যারা আছে তাদের হাতে সাহিত্য যুগোপযোগী হচ্ছে, বিপ্লবী হচ্ছে। তাই ইংলণ্ডের কিছু সাহিত্যিক জ্ঞাতসারেই সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এবং বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ ফাঁকি আর চলবে না। সাহিত্যিকরা তাদের কর্তব্য বুঝতে পেরেছেন। ১৯৩৫ সালে বানার্ড শ' মস্কো শহরে 'লেনিন ও ভবিষ্যৎ সভ্যতা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন :

"If Lenin's experiment is over-thrown and fails, if the world persists on its capitalistic lines, them I shall have to take a melancholy farewell of you, my friends.'

নবপর্য্যায় ভারত—পূজা সংখ্যা ১৯৩৮

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (দর্শন)

এঙ্গেল্‌স তাঁর Development of scientific socialism এর ভূমিকায় লিখেছেন : আমাদের দর্শনের মূল উৎস কেবল মাত্র সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়ে এবং ওয়েনের মধ্যে নয়, পরন্তু কাণ্ট, ফিকটে ও হেগেলের চিন্তাধারার সূত্র বেয়ে চলে এসেছে এবং একথা স্বীকার করতে আমরা জার্মান সমাজতন্ত্রবাদীরা গৌরব বোধ করি। এই উক্তি এবং অর্থনীতি সম্পর্কে কার্লমার্ক্সের এই ধরণের বহু উক্তি থেকে বোঝা যায় যে অতীতের যে সমস্ত কার্য্যকলাপ বা বিশিষ্ট চিন্তা সমাজ জীবনে বিভিন্ন রকমের ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সংযোগ-স্থল ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে তারই ইঙ্গিতে ভবিষ্যতের দর্শন সৃষ্টি সাম্য-বাদের এই দুই ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন। মনুষ্য চেতনার পরিবেষ্টন স্বরূপ ব্যবহারিক ও পরমার্থিক বাস্তবতা যেন একটানা জলস্রোতের মত বেয়ে চলেছে, এই প্রবাহ যে কখনো বন্ধ হবে এমন কথা কল্পনাতীত ; বন্ধ হলে মানুষের ভাল হবে কি মন্দ হবে সে কথাও অবাস্তব। কিন্তু এই নীতির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারাটা যে নিরাপত্তার অন্যতম উপায এ বিষয়ে কারো অমত নেই এবং সেই প্রবাহকে সময়ে সময়ে নিজেদের সুবিধামত মোড় ফেরাতে পারলে যে আরো ভাল হয় সেটা আমরা ঠেকে শিখছি। তাই যুগে যুগে বহু মানুষের গবেষণায় যে বস্তু আলোচিত হয়েছে তার সর্বজনীনতা স্বীকার না করেই উপায় নেই। অতিকায় জীবের কঙ্কাল, রাজা অশোকের স্মারকলিপি বা হেগেলের 'absolute idea'র মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করতে যাওয়া আপাত-দৃষ্টিতে বিচিত্র ঠেকলেও পৃথিবী নামক একটা বিরাট ঘটনার ক্ষেত্রে সে বস্তু আশ্চর্য্য তো নয়ই—আকস্মিকও নয়।

মূলতঃ মনুষ্য চেতনার ইতিহাসে বিভিন্ন কালোপযোগী প্রশ্নগুলি বিভিন্ন পরিবেশে বহু লোকের কর্মানুশীলনে আন্দোলন সৃষ্টি করেছে—কালের মধ্যস্থতায় তাদের উত্তরও কিছু কিছু মিলেছে বটে কিন্তু প্রগতিশীল অভিব্যক্তির গতি প্রশ্নগুলিকে ব্যাপক ও বহুমুখীন করেছে মাত্র। সংযোগ হারায়নি। তাই কেউ যদি বলেন যে মার্ক্স নিজের মতকে পূর্ব্ববর্তী বিশিষ্ট চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ দর্শিয়ে ভুঁইফোড় নামক অপবাদটির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতেচেয়েছিলেন বা বিশিষ্ট চিন্তাধারার বিরূপ সমালোচনা করে নিতান্ত প্রচলিত উপায়ে নিজের মতটি

জাহির করার মতলবে ছিলেন, তাহলে তাঁরা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবেন। মার্ক্সের সমসাময়িককালে যদি বা একথা বলা চ.তো কিন্তু আজকের দিনে তা বলা চলে না। আমরা দেখেছি চিন্তার রাজ্যে, জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে যত কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পড়ে আছে তাদেরকে সংগ্রহিত করে তাদের সংযোগস্থল দর্শিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয়তার অংশ বর্জন করে তাদের উৎপত্তিকে dialectics এর ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে মার্ক্স এক ব্যবহারিক দর্শনসৃষ্টি করেছেন ; দার্শনিকদের অকেজো কল্পনাবিলাস, নিষ্ক্রিয় বিশ্লেষণ আজ রূপান্তরিত হয়েছে পৃথিবীর অনির্দ্দেশ পথযাত্রার নির্দ্দেশক, ভবিষ্যৎ অভিযানের রথসারথী হিসাবে।

যে পদ্ধতির দ্বারা মার্ক্স অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রহস্যাবৃত ঘটনাগুলির রহস্য মোচন করতে পেরেছেন, সে পদ্ধতিও মার্ক্সের নিজের আবিষ্কৃত নয়। আমরা দেখতে পাব পূর্ব্ববর্তী বহু দর্শনে তার নবাঙ্কুর স্থানে স্থানে মাথা তুলে আলোকের পথে অগ্রসর হতে চাইছে। মার্ক্স তাকে সময় মত উদ্ধার করে এবং সমৃদ্ধিশালী করে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও অপ্রাসঙ্গিক তবুও এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের অন্যতম প্রধান শত্রু হিটলারের একটি কথা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না : "লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কার্ল মার্ক্স এমনি একজন লোক ছিলেন যিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার অচঞ্চল দৃষ্টির সাহায্যে এই গলিত জগতের আসল বিষটি খুঁজে বার করেছেন এবং ম্যাজিকের কৌশলে সেই বিষ বার করে নিয়েছেন...।"

মার্ক্সবাদের এই অস্ত্র হচ্ছে তার dialectics। আসলে ফিক্‌টে, স্পিনোজা ও হেগেল প্রভৃতি অনেক দার্শনিক এই পদ্ধতিটির সাহায্যে বহু প্রশ্নের সমাধান করেছেন। কিন্তু মার্ক্সের হাতে এ যেন নবরূপ পেল। বহুকেলে মরচে পড়া তরবারি অকস্মাৎ শানিত হয়ে উঠলো। তাই মার্ক্সবাদের যে কোন জিনিস বুঝতে হলে এই dialectics না বুঝলে প্রকৃত জিনিসটা অবোধ্য থেকে যায়।

গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের মত মার্ক্স সামাজিক ও প্রাকৃতিক যাবতীয় ঘটনাগুলি সব সময়ে গতিশীল অবস্থা বলে নির্ণয় করেছেন। ধর্ম, অর্থ, সাহিত্য ও ইতিহাস কোথাও কোন জিনিস দাঁড় করিয়ে দেখা চলে না। কেননা যে মানুষ বা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনার মুখ্য কারণ, সেই মানুষ, সেই জীবজগৎ, কেউই স্থিতিশীল নয় পরন্তু পরিবর্তনশীল। তাই পদার্থ বিজ্ঞানে বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গতির অবস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক ঘটনার ভিতর দিয়ে পরিবর্তনকামী এমনি চঞ্চল

ছন্দ বার করা সম্ভব হয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন নব নব পরিবর্তনগুলির তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করে। মার্ক্স দেখিয়েছেন যে এই গতি সক্রিয় ভাবে প্রত্যেকটি ঘটনাতে থাকার ফলে (থিসিস) এমনি একটি আভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি কার্যে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় (এ্যান্টি-থিসিস) যার নব পরিণতি অবশ্যম্ভাবী (সিনথিসিস)। এই নব পরিণতির বিশেষত্ব হচ্ছে—পূর্ব্ববস্তুর (থিসিস) সঙ্গে গুণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য (qualitative and quantitative difference)।

অনেক সরল লোক আছেন যাঁরা এই ব্যাপাবটাকে জীবনের প্রচলিত ভাঙ্গাগড়া, আলোছায়ার দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখাতে চান, নব পরিণতিকে দুটো বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য হিসাবে গ্রহণ করতে চান। এই ধরণের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। পদার্থবিদদের সঙ্গে মার্ক্সও বলেছেন যে বস্তু ও গতি পৃথক বাস করতে পারেনা। গতি ছাড়া বস্ত বা বস্তু ছাড়া গতি কল্পনায় আনা যায় কিনা সে বিষয় চিন্তা করার আছে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন উদাহবণ মেলে না। সুতরাং অন্তর্নিহিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল অবস্থাকে বিরোধ সাব্যস্ত করে তাকে পৃথক করে একটা প্রচলিত রকমের আপোষ রফা করার চেষ্টা অবাস্তবতা, সে বিরোধ যত তীব্র এবং যত মারাত্মকই হোক না কেন। এই ধরণের চেষ্টায় যে বিরোধ হতে পারে তার দার্শনিক নাম হচ্ছে মেকানিজম, সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে যন্ত্রবৎ মনে করা। জাগতিক ব্যাপারে বহু জায়গায় যন্ত্রের খেলা দেখতে পেলেও মূলতঃ কোন ঘটনা যান্ত্রিক নয়। তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রত্যেক ঘটনার তৃতীয় অবস্থাতে (সিনথিসিসে) যে পরিণতি হচ্ছে সেটা পূর্ব্ব বস্তু নয়, তার বিরোধও নয় একটা নবগুণ ও মাত্রা সমন্বিত বস্তু। কথাটা বিশদ ভাবে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই।

কারণ বস্তুতান্ত্রিক বলতে সে যুগের গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিমিনডার থেকে এ যুগের তথাকথিত সাম্যবাদী 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' গ্রন্থের লেখক বুখারিণ পর্য্যন্ত অনেকেই একই গোত্র হলেও তাদের সঙ্গে মার্ক্স দর্শনের যে অভিনব পার্থক্য আছে সেটা ভাল করে বোঝা দরকার। শরীরতত্ত্ববিদ যারা তারা সকলেই জানেন যে মেটাবলিজম কথাটা অর্থ হচ্ছে এনাবলিজম ও ক্যাটাবলিজম এবং অনেকে তার অর্থ করেন ভাঙা ও গড়া। কিন্তু সকলেই জানেন শরীরের কোন একটি জায়গায় ভাঙা বা অন্য একটি জায়গায় গড়ার কারখানা নাই। যে সমস্ত

মৌলিক উপাদানে শরীর গঠিত, নানাভাবে সেগুলি শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাহচর্যে যাচ্ছে—নব নব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শৈশব থেকে যৌবন যৌবন থেকে বার্ধক্য প্রভৃতি মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে শরীরের বহিরাবরণ বাহ্যিক প্রকৃতির সম্পর্কে পরিবর্তিত হতে হতে মৌলিক অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য জীবকোষের অন্তর্নিহিত কার্য্যকারিতার ফলে নতুন চামড়া গড়ে উঠছে। এই ব্যাপারে যান্ত্রিক এবং ডায়েলেকটিকাল পদ্ধতির ক্রিয়া বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রতি দিনের ক্ষয়পূরণটা যেমন যান্ত্রিক—গোটা জীবনটা তেমন ডায়েলেকটিকাল।

এই থেকে আমাদের ধারণা করা সহজ হবে যে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বনিয়াদ মার্ক্স-এঙ্গেলেস-র পূর্ব্ববর্তী দার্শনিকদের চিন্তাধারার পরিবর্তনশীল ছন্দের ভিতর লুকিয়েছিল। তাই দেখি, দর্শনশাস্ত্রের যে কোন ছাত্রের চোখে পড়ে আঠারো শতাব্দীর যন্ত্রপন্থী দর্শনকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য হেগেলের ডায়েলেক্‌টিক্‌স কেমন করে মার্ক্স প্রয়োগ করেছেন। বোধকরি এই কারণেই রাশিয়ার প্রথম ও বিখ্যাত (পরে কুখ্যাত) প্লেখানভ বলেছিলেন: মার্ক্সের বস্তুবাদ স্পিনোজার বস্তুবাদের রূপান্তর মাত্র। কারণ স্পিনোজার মতে প্রকৃতি, ঈশ্বর বা সদ্বস্তু (Nature, God, Substance or Thing in itself) সবই এক এমন কি এক জায়গায় স্পিনোজা অদ্ভুত ভাবে বলেছেন: ঈশ্বর নিজেই ব্যাপ্তি (extension)। এই অনুসারে ঈশ্বর হয়ে গেলেন দেশ পর্য্যায়ভুক্ত, ফলে শুধু তাঁর অসীমত্ব ঘুচলো এমন নয় তিনি কাল সাপেক্ষ হলেন। ঈশ্বরকে এত ছোট করতে স্পিনোজা চাননি, কিন্তু তার নিজের যুক্তিই তাঁকে এই ধরণের বিপথে এনে দিয়েছিল।

স্পিনোজার ইচ্ছা ছিল সবভূতে ঈশ্বর অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে Pantheism তাই প্রচার করা। কিন্তু আত্মার বোধ্য জগৎ ছাড়া বস্তুময় জগৎ কল্পনা করতে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত বস্তুতান্ত্রিকদের দলে ঢুকতে হয়েছিল।

বেকন, স্পিনোজা, ডেকার্টে ও লাইবনিজ ছিলেন রেনেশাঁসের দার্শনিক। ইউরোপের সেই নব অভ্যুত্থানের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই ধারণা জন্মেছিল যে প্রকৃতির গর্ভেই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারলে সে ভাণ্ডারের চাবিকাঠি মানুষের করায়ত্ত হতে পারে এবং ন্যান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার ফলকে সে যুগের দর্শনে ঠাঁই দেওয়া দরকার হ'ল। এ নইলে শুধু যে মানের হানি হত তা নয় দর্শনের মূল যা ধ্বসে পড়েছিল তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে এ কার্য্য করতে

হয়েছিল। এদিকে ঈশ্বরের মূল কারণের মোহ তখনও কাটেনি অথচ তাঁর স্থান নির্দেশ দরকার। কিন্তু মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা বিজ্ঞান, বহু যুগের আয়াস-লব্ধ ক্রমবর্ধমান ব্যবহারিক জ্ঞান প্রকৃতিকে একান্ত করে উঠে পড়ে লেগেছে দেখে সকলে মিলে প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বানিয়ে বসলেন। বেকন বিজ্ঞানের বড় উৎসাহী ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি বললেন: প্রকৃতিবিশ্লেষণে ঈশ্বর লাভ সুনিশ্চিত। ডেকার্টে একথা সমর্থন করে বললেন: ঈশ্বরই সকল বস্তুর মূল কারণ। সেদিন সকলের মনে হয়েছিল মানুষের শেষ প্রশ্ন সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনশীল মানুষ শেষ প্রশ্নকে বার বার প্রথম প্রশ্ন করে তুলেছে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আবার প্রশ্ন হ'ল সৃষ্টির কারণ যদি ঈশ্বর তাহলে প্রকৃতিতে, সমাজে এত বৈষম্য কেন? লাইবনিজ উত্তর দিলেন: সৃষ্টির পরে স্রষ্টার আর কোন দায়িত্ব থাকে না, সৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার মত চলতে থাকে mechanical system of motion। আজকালকার দিনে তথাকথিত নিও-ফিজিক্স (neo physics) এর 'শক্তি' বস্তুটি লাইবনিজের দর্শনে মনাড রূপে স্থান পেল। এই মনাড পদার্থটি সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত সার এবং সক্রিয় অবস্থাতে বর্তমান বটে কিন্তু ইন্দ্রিয় গোচর নয়— আত্মিক। এর নিজস্ব অবস্থা কি জানবার উপায় নেই তবে যারা এর প্রতি-নিধিত্ব করে তাদের দেখে একে চিনতে হয়। যেমন সুস্পষ্টতা ও নির্মলতা দেখে অনুমান করা যেতে পারে এটা কেন্দ্রস্থানীয় মনাড, মোড়ল মনাড অথবা ঈশ্বর। ইনি সকল সসীম বস্তুর স্রষ্টা আর সকল মনাডের ক্রিয়া কলাপের সামঞ্জস্যকার। তাহলে দেখা গেল মনাডগুলির প্রকৃত সত্তা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর এবং তাদের মনাডঅস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগতে পারে। কারণ লাইবনিজ নিজেই বলেছেন 'ক'খ বা চ, ত···' মনাডের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এমনি করেই অন্তহীন ভাবে চলেছে।

অথচ প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিগত জগতের বাইরে অন্য কোন আত্মিক শক্তির কল্পনা এদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না। ঈশ্বর যদি থাকেন তো তাঁকে প্রকৃতির মধ্যেই থাকতে হবে এবং প্রকৃতিতে তিনি নিশ্চয় বর্তমান এই ধারণা তাদের সমগ্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবু কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ এদেরকে বস্তুবাদের পথপ্রদর্শক বলেছেন। কেননা কাণ্ট প্রভৃতি অন্য যারা ছিলেন তাঁরা স্বস্তু (thing-in-itself) কে অজ্ঞেয় বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরমার্থিক জ্ঞান ছাড়া অন্য প্রকারের জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান এবং মূল বিরোধ হচ্ছে বিষয়ী ও বিষয় নিয়ে (sul ject-objest)। প্রথম দলেরা বিষয়ের (object) পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না ; বলে থাকেন বিষয়ী আছে বলে বিষয়ের অস্তিত্ব, সুতরাং বিষয়ের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। সরল করে এই কথাটা বল্লে এই দাঁড়ায় যে আমি subject or ego আছি, আমি যাই, আমি দেখি, এমন কি আমার আমিত্ব-বোধ সবই আমার উপর নির্ভর করছে। তুমি, রাম বা এই জগৎটা রইল কিনা তা আমার জানার উপায় কি ? আমার আমিত্ব না থাকলে তোমরা থাকবে কিনা তা আমি জানি না, সুতরাং তোমার বিষয় (object) আমার বিষয়ীর থাকার উপর নির্ভরশীল। দর্শনে এই ধরণের যুক্তিকে solipsism বলে। তর্কশাস্ত্রে এই পদ্ধতিটাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাগ করা হয়েছে, অথচ দেখা যায় যে সকল ভাববাদী এই পদ্ধতি ছাড়া চলতে পারেন নি। ফলে তাদের সমস্ত চেষ্টাই আদিতে ভ্রমাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপর পক্ষে বস্তুবাদীরা জ্ঞাতাপুরুষ (subject) থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞেয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন : আমি আছি, এই কথা থেকে বোঝা যায় যে আমি দেশে বা কোন স্থানে (space) আছি এবং কালে (time) কিছু কাল ধরে আছি। সুতরাং বিষয়ীর সঙ্গে স্থান ব্যাপ্তি ও কাল ব্যাপ্তির অবস্থাব অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতীতি জন্মে এবং বিষয় ও বিষয়ীব স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হয়। এই দুই ধরণের যুক্তি বিশ্লেষণে অনেক কিছু লেখা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তুর ভিতরে এগুলি সংক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নিচ্ছি। কারণ বস্তু জিনিষটার (matter) আকার বা প্রকৃতি সম্বন্ধে এ যুগের সব বিজ্ঞানের যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তার দরুণ এডিংটন, জিনস ও মিলিকান প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক হৈ চৈ তুলেছেন। এই জায়গায় কার্ল মার্ক্স এর উপযুক্ত শিষ্য লেনিনের একটা কথা উল্লেখ করে এই তর্ক সমাপ্ত করে দেব। লেনিনের অতুলনীয় ভাষায় বস্তু হচ্ছে এই যে চেতনা বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে তার হেতু স্বরূপ এবং তার বহির্ভূত বিষয়ের দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র (matter is a philosophical category representing objective reality)। পূর্বোক্ত দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা বর্তমান জগৎকে নিয়ে বহু পরীক্ষা করার পরও দার্শনিক-ভাবে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন এবং প্রধানত solipsistic তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বস্তু বুদ্ধির খেলা মাত্র এবং বস্তুর অস্তিত্ব অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত। এই সময়ে একটা কথা স্বভাবতই মনে আসে যে প্রতিটি সমাজ

বিপ্লবের প্রারম্ভে ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণী থেকে একদল দার্শনিক বেরিয়ে আসেন—যাদের উদ্দেশ্য থাকে পরিবর্তনকামী শক্তিকে এই বোঝানো যে জগৎটাই যখন মায়া তখন তার সুখ দুঃখের কথা ভেবে লাভ কি? এবং একথা আজ পরিষ্কার যে মার্ক্সবাদী দর্শন পরিবর্ত্তনকামী শক্তির দর্শন। প্রচলিত দর্শন বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে পূর্বোক্ত শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ মিল এই কারণে আজ স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে যদিচ এদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অত্যন্ত বাস্তব।

আবার স্পিনোজার কথায় আসা যাক। তিনি বলেছেন যে আত্মাও ব্যাপ্তি অথবা গুণ (quality) ও মাত্রা (quantity) এক জিনিষ নয়—বরং এমন একটা মৌলিক বস্তু সম্ভব যার এই দুই গুণই বর্ত্তমান এবং যাকে কোন কালেই এই দুই গুণ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তিনি স্বীকার করলেন যে এইরূপ একটি মৌলিক বস্তু প্রচ্ছন্ন ভাবে দেশ ও কালব্যাপী রয়েছে। এইখানে স্পিনোজাকে মার্ক্স গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্পিনোজার মূলসূত্রগুলি পারস্পারিক সম্বন্ধবিহীন একটা নিশ্চল অবস্থার নামান্তর মার্ক্স সে ক্ষেত্রে স্বয়ংগতিশীল নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনেব অবস্থা প্রমাণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনার মধ্যে যে আকস্মিকতা—breaks বা accident দেখতে পাওয়া যায় এবং যাকে আমরা অনেক সময় দৈবের ঘাড়ে চাপিযে দিয়ে উদ্ধার পেতে চাই, মার্ক্সের মতে সেগুলি দৈব নয়. যথাযথ কারণপ্রসূত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব আয়ত্বাধীন। স্পিনোজা বলতেন, শরীর (body) ও আত্মা (soul) দুটি পৃথক বস্তু। মার্ক্সের মতে জড় জগতেব গতি জড়েব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ও প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান এবং গতি সমন্বিত জড়ের অন্য দুটী স্বীকার্য বিষয় দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি। কিন্তু দেশ ও কাল বস্তু ছাড়া পৃথক নয়। তবু শেষোক্ত দুই অবস্থার আনুকূল্যে নবগুণসম্পন্ন জৈব জগতের (organic) অভিব্যক্তি (evolution) সম্ভব হয়েছে।

এর পরেই আসে কাণ্ট ও হেগেলের কথা। মার্ক্সের মতে হেগেল ভাববাদী দর্শনের শেষ কথা বলে দিয়েছেন। আর কেউ নতুন কিছু এ সম্পর্কে বলতে কেবল কাণ্ট ও হেগেলের যুক্তির পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য উপায় খুঁজে পাবে না। বস্তুতঃ ইউরোপের বর্তমান দর্শনে পুরানো হেগেল, পুরানো কাণ্ট আবার নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে, মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হেগেলের দর্শনে সম্পূর্ণতা এতখানি ছিল বলেই মার্ক্স তার দ্বারা প্রভাবান্বিত

হয়েছিলেন। কারণ, ধনতান্ত্রিক যুগের উন্নতির বিশেষ অবস্থায় তার বিরোধগুলি যেমন স্পষ্ট ও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল ঠিক তেমনি জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে বিপুল সম্ভার জোগাড় করা হয়েছে সেইখানেই তার অযৌক্তিকতা, তার পরস্পর বিরোধী মতগুলি তত তীব্রভাবে প্রকট হয়েছে এবং মার্ক্সের ডায়েলেকটিকস্ অনুযায়ী নবপরিণতি, নবদর্শনের উৎস সেইখানেই মিলবে, সেখানকার কারখানাতে তৈরী হবে তার কাঠামো, তার অস্থিমজ্জা, তার নব বেশভূষা।

জ্ঞানের স্বরূপ ও জ্ঞেয়বস্তুর বাস্তবতা কাণ্ট পৃথকভাবে দেখেছেন। যেমন: জ্ঞেয় জগতের বহুচিন্তা বিশৃঙ্খলভাবে বর্ত্তমান—কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ মাত্রই তারা জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, কোনটা শব্দ আর কোনটা গন্ধ তার বিভেদ ও রূপকরণ জ্ঞানই করবে। কিন্তু তার পদ্ধতি প্রকৃতি থেকে ধার করা বা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মনুযায়ী করা হয়ে থাকে—একথা কাণ্ট মানতে চাননি। তিনি বলছেন যে প্রজ্ঞা (Reason) প্রকৃতি থেকে নিয়ম পায় না বরং নিজেই নিয়ম তৈরী করে প্রকৃতিতে আরোপ করে (Thus reason does not get its laws apriori from nature but prescribe them to)। আরও বলেছেন যে হয়তো সদ্বস্তু (Thing-in-itself) চেতনাকে সাড়া দেয়, জাগিয়ে তোলে এবং চেতনা জেগেও ওঠে—কিন্তু কে যে জাগালো সে খবর তার জানবার উপায় নেই, অধিকারও নেই—এমনকি চেষ্টা করলেও জানা যাবে না—Thing in itself is unknowable—সদ্বস্তু অজ্ঞেয়। যা জানা যায় তা কেবল প্রতিবিম্ব মাত্র। আমিও আমার ছায়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকা সম্ভব—এক্ষেত্রেও তাই। কাণ্টের এই চিন্তাধারার সঙ্গে হেগেলের দর্শনের কোন যোগ নেই। কারণ হেগেলের মতে কোথাও এই দ্বিত্বভাব নেই। ফিক্‌টে এই ক্ষেত্রে এদের দুই জনের ভিতর যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস করেছেন—এই বলে যে বিষয় (Subject) ও বিষয়ী (Object) প্রজ্ঞাকে (Reason) করেছে —তাদের মিলন ক্ষেত্র—কাণ্টের Non-ago অথবা Thing-in-itself (সদ্বস্তু) ego (অহং) এর অংশ মাত্র ও প্রজ্ঞা অধিগম্য। ফিক্‌টের মতে Ego ও Non-ego'র অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিরোধ ও গতি স্বীকার্য্য হ'ল—কিন্তু তাদের সামঞ্জস্যের হেতু নির্ণয় হ'ল—তাদের স্বকীয় সীমা নির্দেশ করে। এইভাবে অদ্বৈতবাদ (absolute monism) স্বীকার করে তার ভিতর ডায়েলেকটিকের অস্তিত্ব দেখিয়ে হেগেল ও কাণ্টের

মধ্যে ফিকটে সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করে দিলেন এবং হেগেলের আসার পথ সহজ করে রাখলেন।

হেগেলের 'পরমাত্মা' (absolute spirit) বিষয় ছাড়িয়ে রইল না। কাণ্টের অজ্ঞেয় হেগেলের হাতে সকল জ্ঞানের মূল উৎস হয়ে দাঁড়াল। সকল বস্তুর স্রষ্টা বা পারমার্থিক ডিজাইন হয়ে গেল। হেগেল বলেছেন যে চঞ্চল ও নিরপেক্ষ আত্মার জীর্ণবসন হ'ল প্রকৃতি। জগতপদ্ধতির কোথাও কোন অন্যায় নেই—কেননা রয়েছে ন্যায়বান আত্মা এবং জগৎ কারণে নিয়ম বর্তমান রয়েছে—তদনুযায়ী প্রত্যেকটি ঘটনাকে পূর্বেকার ঘটনার প্রয়োজনীয় যোগসূত্র হিসাবে ধরতে হবে। সকল বিষয়ের মূলে রয়েছে নিরপেক্ষ আত্মার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তি। মানুষের প্রতীতিতে উপলব্ধিগত বস্তু গুণ হিসাবে ধরা পড়ে এবং সেইভাবে বিষয়—বিষয়ীর (Subject—Object) যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিষয়ী-বিষয়কে যে ভাবে গ্রহণ করে তাকে ঊর্ধ্বাভিমুখী আত্মার (idea) ছায়া বা image অনুযায়ী বলা যেতে পারে। এবং এই ঊর্ধ্বগামী আত্মা বিশ্বের সারবস্তু। কিন্তু এই বিকাশগুলি কল্পিত নাম বা সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নয়। তথাপি মূল বিরোধের উপর গড়ে উঠেছে বলে এদের ভিতর প্রগতি ও পরিবর্তন আছে।

দেখা যাচ্ছে যে হেগেলের দর্শনে ফিকটের ডায়েলেকটিক প্রায় একই রকম। তবে হেগেল চিৎপদার্থ ভিন্ন বাহ্যিক জগৎ স্বীকার করে তাকে বিষয়ী করে নিয়েছেন—এই যা পার্থক্য।

হেগেলের যুক্তি অনুযায়ী চেতনানিরপেক্ষ জগৎ সাব্যস্ত হ'ল, ক্রম পরিবর্তনশীল অভিব্যক্তির কারণ খুঁজতে গিয়ে সকল ঘটনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'ল এবং নিয়মের রীতিনীতি ঐ দ্বন্দ্বের নির্দেশ অনুযায়ী বলে স্থির করা হ'ল। পুরানো ভাববাদী দর্শনের একমাত্র যোগসূত্র রইল পরমাত্মা বা absolute idea'র মধ্যে। মার্ক্স তাই বলেছেন যে তাঁর দর্শন—হেগেলের 'উল্টা পুরান'। কারণ হেগেল বলেছেন যে পরমাত্মা উত্তরোত্তর বিকাশের পথে বস্তুগুণ সমন্বিত হচ্ছে। আর মার্ক্সের বক্তব্য হ'ল যে গতি সমন্বিত বস্তু ক্রমবিকাশের পথে আত্মিক হয়ে উঠছে। হেগেলের জগৎ মাথা দিয়ে হাঁটছিল—মার্ক্স প্রমাণ করলেন যে সে পায়ে হাঁটছে। এখানে মার্ক্সীয় দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা এঞ্জেলসের বক্তব্য শুনুন: "বস্তু পরমাত্মার কোন বিশিষ্ট অবস্থার ছায়া

এই ধারনা মেনে না নিয়ে আমরা বলছি যে বস্তুর ছায়া হচ্ছে পরমাত্মা। এর ফলে ডায়েলেকটিক পরিণত হ'ল মানুষের মনোজগত ও বহির্জগতের গতিবিজ্ঞানের সর্ব্বজনীন আইনবোধে। মনে হয় দুই জগতে দুই সেট আইন—কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এরা এক হলেও মানুষের মন এই নিয়মকে যতটা সচেতন ভাবে কাজে লাগাতে পারবে—এর প্রকাশের ভঙ্গী ততই বহির্জগতের ডায়েলেকটিক থেকে পৃথক হবে। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত প্রকৃতিতে ও মনুষ্য ইতিহাসে পর পর অসংখ্য বাহ্যিক আকস্মিকতার ভিতর দিযে বাইরের প্রয়োজনের তাগিদে প্রধানতঃ অচেতন ভাবেই এ ব্যাপার ঘটে আসছে। এইজন্য প্রকৃতিজগতের দ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তি মানুষের মনে জ্ঞাতভাবে কেবল প্রতিবিম্বিত হযেছে মাত্র। আর সেই কারণে হেগেলের ডায়েলেকটিককে উলটিয়ে অর্থাৎ মাথা দিয়ে না হাঁটিয়ে পায়ে হাঁটানো হয়েছে।"

এরপরে যার সঙ্গে মার্ক্সের দার্শনিক যোগাযোগ খুব বেশী তিনি হলেন ফয়েরবাক। ফয়েরবাককে মার্ক্স এতখানি নিয়েছেন এবং ফয়ের-বাক সম্পর্কে চলতি দর্শন শাস্ত্র ও দার্শনিকরা এত অবজ্ঞা করেছেন যে খুব অল্পে ফয়েরবাকের কথা শেস করা চলে না। কাজেই এ প্রবন্ধে আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

তবে সবলেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে অতীতের চিন্তারাজির প্রগতিশীল অংশটি কেমন করে মার্ক্সের দর্শনে সংক্রামিত হয়েছে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসা বিরোধ কেমন করে মার্ক্স ধরতে পেরেছেন, এই বিরোধ থেকে দর্শনকে মুক্ত করেছেন—দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে—তাকে ভবিষ্যৎজগতের পথনির্দ্দেশক করে দিয়েছেন। পরিবর্ত্তনের তীব্র কামনায় মার্ক্সীয় দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বা বৈপ্লবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্সের আগে দর্শনের কাজ ছিল—ব্যাখ্যার কাজ, তাই দার্শনিকরা প্রায় ব্যাখ্যাকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মার্ক্স বলেন: "দার্শনিকরা তাদের নিজেদের মত জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন—কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে—এই জগতকে বদলিয়ে দেওয়া"। একটু পিছনে তাকালে শুনতে পাব হেগেলের কণ্ঠস্বর "বিরোধই এগিয়ে নিয়ে চলে।"

হেগেল বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর এই কথা উপযুক্ত লোকের হাতে পড়ে সমগ্র দর্শনের রূপ পরিবর্ত্তন করে দেবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা—রবিবাসরীয় সংখ্যা ৬ই জুন, ১৯৪০।

বাংলা সাহিত্য ও মার্ক্সবাদ

আমাদের দেশে অনেক 'খাঁটি' সাহিত্যিক আছেন যাঁরা মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার নাম শুনলে আঁৎকে ওঠেন, নাক সিটকান এবং কেউ কেউ সরাসরি এই সমালোচনা অগ্রাহ্যও করেন। এর প্রধান কারণ অবশ্য মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখ্‌বার সুযোগ তাঁদের হয়নি এবং মার্ক্সবাদীরাও তাঁদের বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে মার্ক্সবাদ যে সমালোচনা করেছে, প্রত্যক্ষ-ভাবেই হোক আর অপ্রত্যক্ষভাবেই হোক্ সব দেশের অধিকাংশ বড় বড় সাহিত্যিকরা তা স্বীকার না করে পারেন নি। বস্তুতঃ একথা আজ জোর করে বলা যায় যে, মার্ক্সবাদী exposure-কৌশল অন্য সমস্ত সমালোচনা-কৌশলকে কোণঠাসা করেছে এবং সেটা অনিবার্য্যভাবেই সঙ্ঘটিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, কমিউনিষ্টদের গাল দিতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে 'তথাকথিত ছদ্ম' কমিউনিষ্ট বলে গাল দিতে হয়,—আসলে কমিউনিজমকে সরাসরি অগ্রাহ্য করার সাহস আর বড একটা দেখা যায় না।

তব্ সাহিত্যিকদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ধারণা জাগে কেন? দোষ তাদের যা-ই থাক্ না কেন,—মার্কস্‌বাদী সমালোচকদের অনেকখানি আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। মার্ক্সবাদীদের সব সময়ে মনে রাখ্‌তে হবে, তাদের বিরুদ্ধবাদীরা সমাজের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে চুপচাপ কাটায় নি; তাদের অর্থ, কর্ত্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি নিয়ে, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, পুঁথিপত্র নিয়ে তারা দিনের পর দিন বিকৃত আদর্শকে লোকের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করেছে এবং অনেকাংশে সফল হয়েছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী, নৈরাশ্যবাদী ও যান্ত্রিক করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তনে' এক জায়গায় পুরাতন বদ্ধ সংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন,—'গর্ভের মধ্যেও কাজ করে,—একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয়।' সুতরাং এই রকম দৃঢ়মূল সংস্কার বা এই ধরণের দীর্ঘ, সযত্ন-রচিত শত্রু-প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার করতে হলে ধৈর্য্য চাই, সুকৌশল চাই এবং দরদ চাই। দরদ কথাটা বল্লাম এই জন্যে যে, কোন মার্কস্‌বাদী বিশ্বাস করবে না জীবনের বিরুদ্ধে জীবনের শত্রুদের কৌশল সব সময়ে জয়ী হয়। কোন মার্ক্সবাদী বিশ্বাস করবে না যে, জীবনকে সমগ্রভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে জীবনের শত্রুরা বিভক্ত করতে পারে।

কোন মার্ক্সবাদী বিশ্বাস করবে না যে, জীবন কেবল প্রভাবান্বিতই হয়, একতাল কাদার মত কেবল ছাপই বয়ে বেড়ায়—ছাপ দিতে জানে না। মার্ক্সবাদীরা জীবনের উপর বিশ্বাস রাখে, জীবনকে ভালবাসে, জীবনের সংগ্রাম-ক্ষমতা, সকল রকম বাধা-বন্ধ অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখে। বস্তুতঃ এই বিশ্বাসই মার্ক্সবাদের মূল প্রেরণা। তাই মার্ক্সবাদী সমালোচকদের বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে কোন ভাল সাহিত্যিকই মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেন না এবং সেই কারণেই সাহিত্য সমালোচনায় কেবল কর্কশ হলে চল্‌বে না—দরদের সঙ্গে তার যেটা ভাল তাকে গ্রহণ করতে হবে, যেটা মন্দ তাকে বর্জন করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি উত্থাপন করতে হবে।

আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রথমেই ভাবেন যে, আমরা সাহিত্য বলতে কেবল পার্টির লাইনের মূল স্লোগানগুলিকে প্রচার করা বুঝি—অর্থাৎ আমরা সাহিত্য বল্‌তে রাজনীতিক প্রোপাগাণ্ডা বুঝি। তাঁরা আরো ভাবেন যে, কৃষক ও মজুরদের জীবনের প্রকৃত ঘটনা ছবির মত না আঁকলে বোধ করি মার্ক্সবাদী সমালোচকদের হাত থেকে উদ্ধার নেই। একথাগুলি—যাঁরা আমাদের অনেক নিকটে এসেছেন, যাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক অনুভূতি নিয়েই এসেছেন—তাঁদের অভিযোগ। কিন্তু যাঁরা দূরে আছেন, যাঁদের সঙ্গে এখনো আমাদের সম্পর্ক হয়নি, বা প্রকৃতপক্ষে যাঁদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখনো ফিউডাল সমাজের চিহ্ন বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাঁদের অভিযোগ হল—আমরা সাহিত্যের কোন ঐতিহ্যই মানি না, সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হবে কি করে?

মার্ক্সবাদী সমালোচকদের আজ পরিষ্কার করে বলা দরকার যে আমরা সাহিত্যের ঐতিহ্য মানি, আমরা সাহিত্যকে পার্টি লাইনের স্লোগানে পরিণত করতে চাই না এবং আমরা শুধুই বলি না যে, কেবল শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থার ছবি আঁকলেই সাহিত্য—সাহিত্য হয়। লেনিনের কথা আজ আমাদের জন্য, আমাদের প্রতি সন্দেহবাদীদের জন্য এবং আমাদের শত্রুদের জন্য স্মরণ করা দরকার যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা মনে করি; —'সর্বহারার সংস্কৃতি আকাশ থেকে গজায় নি। যারা নিজেদের সর্বহারা-সংস্কৃতির বিশারদ বলে মনে করে তাদের আবিষ্কারও নয়। এ সব কথা যারা বলে তারা বাজে বকে। ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের যোয়ালে বাঁধা থেকেও মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে সর্বহারার সংস্কৃতি তারই স্বাভাবিক বিকাশ। এই সকল পথ-ঘাট

সর্বহারা সংস্কৃতির দিকে এতদিন এগিয়েছে, এখনও এগুচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্রসর হবে।'

তবুও একথা মানতে হবে যে, আমরা মার্ক্সবাদীরাই লেনিনের নির্দেশ মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলি। যে সব সাহিত্যিক বা শিল্পী অবিলম্বে উৎপাদন বাড়ানোর উপর গল্প লিখতে পারছেন না, তাঁদের উপর খাপ্পা হয়ে যাই অথবা 'খাদ্যশস্য কর রে ভাই খাদ্যশস্য কর' এই ধরণের একটা গানে বাউল সুরে স্লোগানগুলির ছড়া বানিয়ে ভাবি যে, একটা ভাল গান আমরাই বেঁধে ফেল্লাম—ভাল ভাল সুর শিল্পীর নাকের সামনে তুড়ি দিয়ে। এই ধরণের আত্মসন্তুষ্টি কেবল আমাদেরই ক্ষতি করে না, উপরন্তু সাহিত্য ও কলারসিকদের আমাদেব প্রতি সন্দেহাকুল করে তোলে, তাঁরা ভাবেন: 'সত্যিই এরা সাহিত্য-শিল্প বোঝে কি না, সে সব রসে রসিক কি না—সাহিত্য-শিল্প এদের হাতে বাঁচবে কি না?' এই সন্দেহ দূর করতে গেলে আমাদের নিজেদেরই পরিষ্কার সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। এই ধারণা না থাকায় শুধু যে আমরা সাহিত্যিকদের জাগাতে পারছি না, তাদের সন্দেহ বাড়াচ্ছি, অনেকক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধবাদী করে তুলছি তাই নয়, প্রোপাগ্যাণ্ডাকেও আমরা অক্ষম, জোলো এবং হাস্যকর করে তুলছি। লোকশিল্পের পুনরুত্থানের নামে এই প্রবণতাটি বেশি দেখা যাচ্ছে। যে সুর, যে ভঙ্গী, যে কৌশল লোকে নিম্নতর বলে পরিত্যাগ করেছে খুঁজে খুঁজে তাকেই বার করে এবং তার উপর রাজনৈতিক স্লোগানের ঘষা-মাজা করেই আমরা ভাবছি—লোক-শিল্পকলাকে আমরাই যে বাঁচাচ্ছি এ কথার প্রমাণ দেব এবং আমাদের স্লোগানগুলিকে জনপ্রিয় করব। যা পুরাতন তাকে সরাসরি বাদ দেওয়া যেমন মার্ক্সবাদী কৌশল নয় তেমনি তার গায়ে কেবল চুনকাম করেই তাকে নূতন করতে পারার বিশ্বাসও মার্ক্সবাদী বিশ্বাস নয়। পুরাতন জিনিষকে ভাল করে জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। তার মধ্যে নূতনের যে অঙ্কুর আছে তাকে বিকশিত করানোর তাগিদেই এ কাজ করতে হবে।

কিন্তু এ কাজ সৃষ্টির কাজ, খুব তাড়াতাড়ি এ কাজ করা যায় না। দেখতে হয়, শুনতে হয়, করতে হয় এবং ভাবতে হয়। কিন্তু প্রোপাগাণ্ডা এত বিলম্বের অপেক্ষা রাখে না, তাকে অত্যন্ত প্রচলিত উপায়গুলির মধ্য দিয়েই চলতে হয়। কাজেই প্রচলিত উপায়গুলি আমরা যত ভালভাবে, যত নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে পারবো ততই ভাল প্রচার হবে। কাজেই প্রচার-সাহিত্য ও প্রচার-শিল্পের সঙ্গে সৃষ্টিমূলক সাহিত্য ও শিল্পের পার্থক্যবোধ থাকা দরকার। অবশ্য দক্ষ

প্রচারকের সাহিত্যবোধ প্রখর থাকলে তিনি এই পার্থক্য অদ্ভুতভাবে কমিয়ে আনতে পারেন। কাজেই মার্ক্সবাদী প্রচারকদের কাছে এই দক্ষতায় সাধনা করা বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ আমি সোভিয়েট লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গের 'প্যারিসের পতন' উপন্যাস ও সাবোলেবের 'বুল বুল' গল্পের উল্লেখ করছি। আমার মতে দুটিই সাহিত্য সৃষ্টি; কিন্তু 'বুলবুল' গল্পটির মধ্যে ফাশিজমের বিরুদ্ধে সমস্ত সোভিয়েট নর-নারীর প্রতিরোধ-কামনা কৌশলে দেখানো হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচারে এটাকে প্রচার সাহিত্য বলা যেতে পারে, তবু এর আশ্চর্য সাহিত্যিক গুণগুলি অগ্রাহ্য করা কোন সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। অথচ 'প্যারিসের পতন'কে প্রচার-সাহিত্য বলা কোন মতেই চলতে পারে না। সমসাময়িক ঘটনা ও চরিত্রের ওপর এই উপন্যাসের ভিত্তি হলেও এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন বোধগুলি আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। পঞ্চমবাহিনীর নেতা ব্রেতিউল একটা খুনের ব্যবস্থা করে এসে নিজের শিশুপুত্রের মৃত্যুর সামনে যেভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করছে, প্যারী দখল হওয়ার পর নাজী-সামরিক কর্তার কাছে ক্ষুধার্ত জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে এসে যে ভাবে নৈরাশ্য বোধ করছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আবার নাজী বিরোধী লোকদের নামের তালিকা জমা দিয়ে পূর্বোক্তপ্রার্থনা মঞ্জুর করবার চেষ্টা করছে—এই চিত্র যে লেখক আঁকতে পারেন তাঁর সাহিত্যিক গুণ সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঠতে পারে না। মোটের উপর সৃষ্টিমূলক সাহিত্য এবং প্রোপাগ্যাণ্ডা-সাহিত্য সম্পর্কে এই দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আশা করছি জিনিষটা পরিষ্কার করতে পারলাম। সাহিত্যের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রোপাগ্যাণ্ডারও প্রয়োজন আছে এবং যেহেতু প্রোপাগ্যাণ্ডার বাহন সাহিত্য-শিল্পকে হতেই হয় সেহেতু দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোধ বজায় হলে দুই কাজই সুশৃঙ্খলরূপে, সুন্দরভাবে এবং কার্য্যকরীভাবে সফল হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

এতো গেল মার্ক্সবাদীদের ত্রুটির কথা—কিন্তু সাহিত্যিক বন্ধুদের যে ত্রুটি আছে সেটাও বলা দরকার। মজুর-কৃষকের সাহিত্য বলে মার্ক্সবাদীরা যে হৈ চৈ তোলেন তার মূলে একটা সত্য আছে। তা হ'ল যে সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের যোগ নেই তারই অভিযোগ। সাহিত্যিক বন্ধুরা কি এই অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন? আমি জানি দেশের এই দুরবস্থা, রাজনৈতিক অচল অবস্থা আমাদের অনেকের মনকে মুহ্যমান করে ফেলেছে। তবু একথা কি আজ বিশ্বাস করতে হবে যে, যাঁরা এখনো বিশুদ্ধ সাহিত্যের সম্মান

রাখার জন্য যত্নবান—তাঁদের সাহিত্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেছে? দেশব্যাপী গত এক বছর ধরে রাজনৈতিক দুর্য্যোগ ঘটে গেল। তারও আগে বার্মা পতনের পর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবনে, পরিবারে, সামাজিক বন্ধনে ইভাকুয়েশনের চাপ ধ্বংস সৃষ্টি করল, কত লোকের ব্যক্তিগত স্নেহ বা প্রেমের বন্ধন শত-ছিন্ন হয়ে গেছে। জীবনের মূল্য-বোধ বিপর্য্যস্ত হয়েছে, মানুষ ভয় পেয়েছে, শত্রুতা করেছে, কেঁদেছে, হেসেছে, ভালবেসেছে—জীবনের জন্য লড়ছে এবং লড়বে। কিন্তু এ সব কেন আমাদের বাংলার কোন সাহিত্যিককে নাড়া দিতে পারে না? কেন এই যুগে একটা ভাল উপন্যাস বা ভাল প্রেমের কবিতাই বেরোয় না? কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আজ কত পরিবার আশ্রয় নিয়েছে, এই রাস্তায় অসংখ্য মানুষের জন্ম হচ্ছে, অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। যারা রাস্তায় এখনো আসে নি তাদের তিলে তিলে মৃত্যু—সচেতন মনের আড়ষ্ট কান্না অথবা নেশার তন্দ্রা। কিন্তু তবু জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমতায় একই সঙ্গে আত্মহত্যা ও আত্মরক্ষার এই মহান সংগ্রাম কি কোন লিপিকারের লিপি কুশলতার বিষয়-বস্তু হবে না?

অনেক সাহিত্যিক বলেন যে, এই দুর্যোগ তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভাকে আক্রান্ত করেছে। তাই তাঁরা কিছু করতে পারছেন না। আমরা আবার বলব—ইউরোপের দারুণ দুর্যোগের দিনে রুশ যখন হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে তখনো সোভিয়েট- সাহিত্যিক 'প্যারিসের পতনে'র মত উপন্যাস এবং 'অপেক্ষা কর'র (wait for me—by Simonov) মত কবিতা লিখতে পারে তখন আমরাই বা পারবনা কেন?' উত্তর হবে যে,—'সে দেশে সোভিয়েট ব্যবস্থা আছে তাই সম্ভব। গ্রেট বৃটেন বা আমেরিকাতে তো এমনি কিছু বার হচ্ছে না? সত্যি, কিন্তু তার সামাজিক কারণ আছে। ধনতন্ত্রের খুঁটি এ দুটি জায়গায় অনেক দৃঢ়, তাই তার প্রভাব কাটাতে আমাদের থেকেও সে দেশের লোকদের অনেক দেরী লাগে। কিন্তু আমাদের সামনে তার অনুরূপ। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ এদেশের লোকের সামনে তার সমস্ত রকম প্রতিপত্তি হারিয়েছে, তার ক্ষমতার গর্ব আজ এখানে ধূলিস্যাৎ—নূতন জীবনের সম্ভাবনা এবং বিপদ দুই-ই এখানে অনেক বেশী; কাজেই এদেশে সাহিত্যিকদের বিষয়-বস্তুর মধ্যে ব্যাপক ও প্রচুর মূল্যবান জিনিষ খুঁজে পাওয়া উচিত। এত বড় একটা যুদ্ধ চলছে, তাতে লণ্ডন বা ন্যুইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় বা প্রদেশে প্রদেশে কি mass starvation বা mass prostitution দেখা যায়?

১৩৫০ এর শারদীয়া অরণিতে প্রকাশিত

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

পূজা সংখ্যার চারখানি কাগজের (আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, শনি-বারের চিঠি) প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসের উপর আমার এ আলোচনা। এ আলোচনার উদ্দেশ্য, এর থেকে বাঙলা সাহিত্যের গতিধারা বুঝাবার চেষ্টা। এ-জন্য বিভিন্ন লেখকের লেখার উপর যে মন্তব্য আমি করব সে-গুলি নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য, এমনকি আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য ও সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। প্রায় চল্লিশটি রচনা দ্রুত পড়ে তার সমা-লোচনা করার মধ্যে যে ভুল ক্রটির সম্ভাবনা আছে তা আমিও জানি। এই কথাটি সকলকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমস্ত লেখাগুলিকে আমি আমার সুবিধামত তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একভাগের লেখাগুলি "art for art's sake" এই নীতি অনুযায়ী লেখা বলা যেতে পারে। আর একটি ভাগ হচ্ছে—সামাজিক সমস্যা সম্বলিত বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় সব সময়ে বর্তমান থাকে যে সব অর্থনৈতিক ও মানসিক সমস্যা—তাই নিয়ে লেখা। তৃতীয়ভাগের লেখাগুলি আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা ভিত্তিক। এই লেখাগুলিতে লেখকদের যে তীব্র আবেগ প্রকাশ পেয়েছে তাকেই বোধ হয় বর্তমান কালের সমালোচকেরা social realism প্রস্থৃত বলেন।

প্রথমেই "art for art's sake" নীতি অনুযায়ী লেখাগুলি ধরা যাক। এখানে প্রথম বিচার্য্য বনফুল। এঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও লিপিকুশলতা পাঠক সমাজে সুবিদিত। দুটি গল্প এঁর পড়েছি "হিসাব" ও "একব্যক্তি"। খুব ছোট গল্প—ডবল ক্রাউন কাগজের এক পাতা বা দেড পাতার বেশী নয়। "এক ব্যক্তি"র মধ্যে আছে স্বামী-স্ত্রীর যৌবনে লেখা পত্রের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের মানসিক অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা—প্রেম খুব বেশী না থাকলেও কেবল দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে যে Companion-ship গড়ে ওঠে এই উক্তির সাফাই। পরে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী, স্বামীকে মিডিয়ম-এর মারফৎ আনিয়ে দেখলেন স্বামী তাকে একদম চিনতে

পারছেন না। গল্পের মানে বোধ হয় এই যে, সাধারণভাবে যাকে মানুষ আপনার বলে জানে ও মেনে নেয়, হয়ত অন্তরে অন্তরে সে মানুষকে সে না চাইতেও পারে, না চিনতেও পারে। তাই প্রমাণিত হত মৃত্যুর পরে দুজনার দেখা হলে, হয়ত একজনের খুব মনে পড়ত আগেকার পরিচয়, অন্যজনের কিছুতেই মনে পড়ত না সে সব। এমনি ছিল তার বাইরের পোষাকী জিনিস। দ্বিতীয় 'হিসাবে' আছে, গরীবের বয়স্কা মেয়ে—তার পিছনে পাড়ার ছেলেরা ঘুরে বেড়াতো—তাকে এক বিপত্নীক বড় সরকারী চাকুরে বিয়ে করেছে। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার দিনে ট্রেনের কামরায় উঠতে বোধকরি ভূত দেখে চীৎকার করে উঠল: না, না আমি নিজে বিয়ে করি নি—জোর করে করেছে, ইত্যাদি। এর পরে তাকে একটা মাদুলী দেওয়ায় রোগ সেরে গেল। বনফুল ডাক্তার; হয়ত তিনি দেখে থাকবেন Psychiatric case—যাকে Hysteria বলা হয়। তাই নিয়ে গল্প লেখার তাগিদ বোধ করেছেন তিনি। যাইহোক Plot, element of surprise এবং বর্ণনা বিন্যাস বিচার করে এই গল্প দুটিকে কিছুতেই বনফুল-এর প্রথম শ্রেণীর রচনা বলা চলে না বরং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সুলিখিত ভূতের গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এই ধরনের Case history psycho-analyst-দের বই-এ বহু পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে কি এগুলি রসসাহিত্য সৃষ্টি বলা চলে? আর্ট ফর আর্টস সেক—এই নীতি মেনেও সুখপাঠ্য রস সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে একথা আমি জানি। পরে শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের 'মাধব' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। গাঁয়ে বাঘ এসেছে—ঠাকুর ঘরে বিধবা মায়ের ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে গেল। মা মৃত্যুর আগে বলে গেলেন—তাঁর বহুকাল আগের মৃত সন্তান মাধব দেখা দিতে এসেছিল। এমনি ধরনের গল্প ছোট বেলায় ঠাকুরমাদের কাছে অনেক শুনেছি। বনফুল ও জগদীশ গুপ্তের এই গল্প ক'টি পড়তে পড়তে মনে হয়—একটি অদৃশ্য উৎপাত, তা ভূত-প্রেত হোক আর হিস্টিরিয়া হোক—মানুষের জীবনে অনর্থ ঘটাচ্ছে—তত্ত্ব হিসাবে এই কথাটি এই দুই লেখকের মনে চেপে বসেছে। অন্যান্য দেশের লেখকদের ক্রমপরিণতি দেখে বলা যায়, এই ধরনের ঝোঁক অর্থাৎ সুস্থ ও সবল মানুষের রাজ্য ছেড়ে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্থ মানুষের অবচেতনলব্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে কারবার করতে করতে লেখকেরা মারাত্মক রকমের Obscuritanism-এ চলে যেতে

পারেন। এবং এই মতবাদ প্রগতিশীল সাহিত্যের জীবন ধর্ম্ম নয়।

এর পরে এই দফায় আরো যে কটা গল্প পড়েছি তা আমার কাছে সব দিক থেকেই বৈচিত্রহীন বলে মনে হয়েছে। তবু নাম করে যাচ্ছি; অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'লাইন বাবু ও মালদিদি', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশ'—আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধোর মায়ের মৃত্যু'। 'লাইনবাবু ও মালদিদি' অল্প বয়সের প্রেমে পড়ার গল্প। প্রেম জমছে না বলে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মেয়ে মন্ত্র নিল: দূরে সরে যেতে হবে আকর্ষণ বাড়াবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির বিয়ে হ'ল রেলের মাল গুদামের বাবুর সঙ্গে। আর ছেলেটি চাকুরী পেয়ে হ'ল সেই ষ্টেশনের পুলিশ লাইনের দারোগা। এতে অচিন্ত্য সুলভ ভাষা ও বর্ণনার প্যাঁচ বেশ আছে কিন্তু গল্প অত্যন্ত জ'লো।

তবু ঐ সব প্যাঁচের জন্য লোকে পড়বে। কিন্তু বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "নিরুদ্দেশ" আমি পড়তে এত ধৈর্য্য হারিয়েছি যে আমি অবাক হয়েছিলাম। বিভূতিবাবুর লেখায় সাধারণতঃ একটি মিষ্টি কৌতুক রস থাকে। তাতে পাঠকের আকর্ষণ বাড়বারই কথা। আমি এতগুলি লেখা পড়তে পেরেছি—কিন্তু বিভূতি বাবু আমাকে ওঠালেন। তাঁর লেখা 'নিরুদ্দেশ' আর শেষই হয় না। অর্থাৎ একে তো বেশ বড়লেখা তার পর কোন রকম ইনটারেষ্ট পাচ্ছিলাম না। তবু শেষ করার তাগিদে আমি শেষ করেছিলাম। হয়তো আমার গল্পবোধ কম সেই জন্য আমি লেখকের কাছে মাফ চাইতে প্রস্তুত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধোর মায়ের মৃত্যুতে' আছে বুধো নামে নিম্ন শ্রেণীর একটি লোকের মা পুরী তীর্থ করতে গেল এবং সেখানে তার মৃত্যু হ'ল। দেশের লোকেরা খবর পেয়ে বল্লে—'মাগীটা খারাপ ছিল তবু বরাং ভাল তীর্থে মরতে পেল।' কিন্তু বুধোর মা মরবার সময় তার আঁচলে বাধা সাতকুড়ি টাকার হিসাব চেয়েছিল। বোধকরি পাণ্ডারা সেগুলি মেরে দেয়। এ অতি সাধারণ গল্প—কোন দিক দিয়ে প্রতিভার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে গল্প বড় নয় বলে শেষ করা যায়। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর 'পিণ্ডিতত্ব'-ও এই ভাগে পড়েছে। লেখাটাকে রস রচনা বলা হয়েছে। কতগুলি পাঁড়মাতাল—তাদের একজন আর একজনের বাড়ী নিজের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছে। মদের ঘোরে পাত্রীর সঙ্গে অসভ্য ইয়ার্কি করছে এবং নিজেই তাকে বিয়ে করতে চাইছে—এই হ'ল গল্প। নিছক মাতলামির হল্লা ও বেলেল্লাপনা দেখানোই যদি রস রচনা হয়—তাহলে সে রস থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। অপর পক্ষে সুবোধ বসুর "কথা মন্ত্রী" রস রচনা হিসাবে

বেশী কিছু না হলেও আগের গল্প থেকে সুরুচিকর এবং সুখপাঠ্যও বটে। যুদ্ধ সংবাদ নিয়ে বহু দেশের প্রচার বিভাগগুলি যে সব মিথ্যা ও মনোবলরক্ষক সংবাদ পরিবেশন করে—তাকে ব্যঙ্গ করে লেখা। তবে সাফল্যের সহিত পশ্চাদ-পসরণ প্রভৃতি কথাগুলি লেখক যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা দৈনিক কাগজ পড়ার সময়ে যত মজা পেতাম—তার বেশী পাইনি। "দশাননের কুপোকাং" এই ধরণের গল্প। যুদ্ধ, রেশনিং, কণ্ট্রোল, মাছের চড়াদাম, বাড়ী ভাড়া না পাওয়ায় অসুবিধা নিয়ে রস সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। সত্যই এই সকল বস্তু রস-রচনার জিনিষ, যে রসে হাসি পায় আবার চোখেও জল আসে। কিন্তু তেমন রসিকতার সার্টিফিকেট দিতে পারলাম কই ?

এর পর দ্বিতীয় দফার লেখায় আসছি। বরাবরকার সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা, দেহগত যৌবনেব সমস্যা, সাধারণ অভাব অভিযোগের সমস্যা নিয়ে বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজে যে সব ছোট ছোট—পিনপ্রিক্স (কাঁটার খোঁচা) বহু মানুষের জীবনে বেদনা সঞ্চার করে থাকে, ব্যর্থতার সোপান হয়ে থাকে, এই গল্পগুলি তারই ভিত্তিতে লেখা। অথচ যা লেখা হয়েছে তা গত পঞ্চাশ বছরের যে কোন সময় লেখা যেত—এবং বলাও যেত এরা সামাজিক সমস্যামূলক সাহিত্য। অন্য দেশের সাহিত্যে এমনি লেখা ভুরি ভুরি আছে। আমাদের দেশেও আছে।

এখানে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জ্বর'। একজন বিবাহিত বেকার লোক চাকুরী খুঁজতে বেরিয়েছেন, পথে পুরানো প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। মহিলাটি বর্তমানে বড় সরকারী চাকুরের মন্ত্রী। আদব করে ষ্টীমারেব কেবিনে বসে খাওয়ালেন—পুরানো দিনের গল্পও বোধকরি করলেন। জানা গেল যে মহিলাটি ষ্টীমার থেকে নামবার আগে কি একটা জিনিষের দাম দেবার জন্য তার মানিব্যাগটি ভদ্রলোকের হাতে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটি শেষ মুহূর্তে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় নিজের মানিব্যাগটি (যাতে অল্প কয়েকটি টাকা ছিল) ফেরৎ দিলেন। পরে চাকুরী না পেয়ে ভদ্রলোক জ্বর নিয়ে শ্বশুর বাড়ী ফিরে এসেছেন। ঔষধ পত্রের দাম দিতে গিয়ে যখন একশো টাকার কটা নোট বার করা হ'ল তখন শ্বশুর বেকার জামাইকে গালিগালাজ দিতে সাহস করেন নি। মহিলাটি ষ্টীমার ছাড়ার সময় প্রেমমুগ্ধ স্বরে বলেছিল—"আর যেন দেখা না হয় !" যৌবনের প্রেমের পুরানো স্মৃতি থেকে বর্তমানের দারিদ্র্যময় জীবনে কয়েক শত টাকার দাম যে বেশী এটা লেখা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু এই গল্প টেকনিকের

দিক থেকে নিখুঁত ছোট গল্প এবং তার বেশী বলা উচিত নয়। বর্তমান অর্থ-নৈতিক সংকট বোঝাবার জন্য গল্পের গোড়ায় কয়েকটি কথা আছে বটে—কিন্তু সমস্ত গল্পের মধ্যে তা অবান্তর। তবে একটা কথা বলা দরকার। প্রেমেনবাবু প্রথম শ্রেণীর লেখক, তাই তাঁর কাছে পাঠকের দাবী অনেক। কিন্তু সে দাবী তিনি মেটান নি। বরং পূজা সংখ্যায় লিখতে হয়—নাহলে সম্পাদক মানে না এমননি একটা ভাব এই লেখার মধ্যে আছে। এর পরে আছে শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের "বাঁশবাজী"। এরও প্রথমে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের আভাষ দেওয়া হয়েছে। গল্পটি হচ্ছে—একটি মুসলমান বাঁশবাজী খেলোয়াড়—তার ছেলেকে বাঁশের মাথায় ঘুরিয়ে খেলা দেখায়। ছেলে দুটি না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়াতে খেলতে চায় না। বড়টার পেটে ঘা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ছোটটা ভয়ে কাঁদতে লাগলো—খেলবে না, বড়টা শেষ পর্য্যন্ত খেলতে গেল। কিন্তু দুর্বলতার ফলে খেলার মাঝে নিজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—ক্ষত শরীর আরো বিক্ষত হয়ে গেল। তখন ছোট ছেলেটা ভয় পেয়ে কাঁদে "এবার আমাকে খেলাবে।" কারণ খেলা না দেখে কেউ পয়সা দেয় না। তাই খাওয়া জোটে না। দরিদ্র অভুক্তের প্রতি সমবেদনা নিয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকদের উপর প্রচ্ছন্ন অভিশাপ দেওয়ার চেষ্টা অচিন্ত্যবাবু করেছেন, তাদের হৃদয়হীনতার কথাও প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারাতে গল্প দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং খানিকটা অস্বাভাবিক হয়েছে। যেমন দর্শকেরা জানে, বুড়ো ভাল খেলা করে অথচ ছেলে দুটি অভুক্ত বলে খেলতে সাহস পাচ্ছে না, তবু তারা আগে পয়সা দিতে চায় না কেন? তারা যেন স্থির সংকল্প নিয়ে বসে আছে, দেখবে কেমন করে বুড়ো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় আর ছেলেটা আঘাত পায়। হৃদয়-হীনতার এত বড় কারণ দেখাবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিৎ ছিল। এই গল্পটি যে খারাপ তা বলছি না, কিন্তু অচিন্ত্যবাবুর আর একটি গল্প "বৃত্তশেষ" আরো ভালো হয়েছে। সাধারণ লোক থেকে সাধারণ পেয়াদা, নাজির, মুনসেফ, হাকিম, ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে মন্ত্রীদের ঘুষ দেওয়ার যে বিষাক্ত চক্র আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীরা জনসাধারণের ভোট নেওয়ার জন্য যে ঘুষ নিয়ে আসেন—এই বিষয়ের উপর গল্পটি লেখা। লেখাটা একটু sketchy বটে;—হয়তো 'বাঁশ-বাজীর' মত ঠাস বুনানি নয়,—তবু পড়তে রসভঙ্গ হয় না।

অমলা দেবীর 'চাওয়া ও পাওয়া' লেখাটা এই দফায় ফেলেছি। এটি "আনন্দ বাজারের' অনেকগুলি পাতা জুড়ে আছে। অথচ আমার মনে হয়েছে

লেখাটি অত্যন্ত সাধারণ। একটি তরুণ ডাক্তার—গ্রামে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের অশিক্ষিতা মেয়ে, গ্রামের মাষ্টারের অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়ে, আর হেডমাস্টারের সুশিক্ষিতা বি-এ পাশ করা শালীর সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত বি-এ পাশ করা মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে বিয়ে করল। লেখাটির মধ্যে গ্রামের কতকগুলি 'টাইপ' বেশ ফুটেছে—যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার—তার মোসাহেব এবং গ্রামের এক ধরণের প্রৌঢ়া বিধবা, যারা প্রতিবেশী বড়লোকের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তার ছেলে মেয়েদের বিয়ের ঘটকালী করে, এর-ওর বাড়ীর হাঁড়ির খবর রাখে এবং পরের কুৎসা রটনা করে জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু এ সমস্ত বাদ দিলে আসলে ঐ গল্পের নায়ককে বহু-বল্লভ সাজাতে গিয়ে এবং আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েছেলে ধরার বিশেষজ্ঞ—এই প্রমাণ করতে গিয়ে গল্প জলো হয়েছে। প্লটের কোন বিশেষত্ব নেই, কোন আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেতে চায় না—এবং প্লটের কোন সমস্যাও নেই। তবে অন্য দুটি মেয়ের একজন দ্বিতীয় পক্ষ অপরটি ফাজিল স্বামী পেয়ে যে দুর্গতি-এর জন্য পাঠকের মনে বেদনা সৃষ্টি করার একটা চেষ্টা আছে। নবীন ও অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়ের দুর্গতি দূর করার জন্য এবং মেয়ের বাপেদের জন্য খুব সাধাসিধে ভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র—কিন্তু ভাল গল্প হয় নি। এক ধরণের চরিত্র জ্ঞান এবং চরিত্র চিত্রই উপন্যাসটির আসল জোর।

এই ভাগে সুশীল জানার 'বন্দেমাতরম্' লেখাটিও আসে। লেখক এই গল্পের গত আগষ্ট আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে গল্প হ'ল—দুটি বেশ্যার জীবন নিয়ে। একজন হ'ল দারোগা বাবুর রক্ষিতা ও সন্তান-সম্ভবা। আন্দোলনের সময় দারোগাবাবুকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তার ঘর পুড়িয়ে দেয় স্বদেশীরা। তাই স্বদেশীদের উপর তার রাগ। আর একজন একটি তরুণ স্বদেশীকে পুলিশের হাত থেকে লুকিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তার উপর তার এক রাতের মায়া জন্মে গেছে। কিন্তু গল্পের সমস্যা হ'ল দারোগাবাবু চম্পট দিয়েছেন—রক্ষিতাটি ভাবছে ছেলে নষ্ট করে ব্যবসা সুরু করবে, না মা হওয়ার সুযোগ নেবে? এই হ'ল সঙ্কট। আমার মনে হয় সমাজচ্যুত মেয়ের সন্তানা-কাঙ্খার সমস্যা নিয়ে এই গল্পে অনর্থক স্বদেশী ও বন্দেমাতরমের ব্যাপার টেনে আনা হয়েছে। বরং এই যায়গায় পুরো সমস্যাটাকে ধরে গল্প জমানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল। এর পর শ্রীপ্রবোধ সান্যালের 'ব্যর্থ'—খুব ছোট গল্প। আমার মতে লেখক হিসাবে তিনি এই গল্পে অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি মেয়ে

তার ত্রিশ বছর পার হওয়ার পর দেখছে—তার প্রেমপাত্ররা একে একে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাই বার বার তার প্রশ্ন—ত্রিশের পর কি মানুষের যৌবন থাকে না যার ফলে লোকে তাকে ভালবাসতে চাইবে না—তাকে নিয়ে বেড়াতে চাইবে না—ইত্যাদি ? শেষ পর্যন্ত তিনি বৈরাগী হয়ে গেলেন এবং যাওয়ার দিন এক পুরানো প্রেমার্থীকে হাওড়া ষ্টেশনে আনিয়ে বলে গেলেন দুঃখের কথা। অর্থ সর্বস্ব সমাজে নানাবিধ বাধা বিপত্তির জন্য অল্প বয়সে যারা বিয়ে করতে পারে না তাদের মনে এই ধরণের সমস্যা সত্যই আসতে পারে। কিন্তু তাকে গল্পে রূপায়িত করার জন্য যে সমস্ত অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক তৈরী করা দরকার—তা না থাকাতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্থূল যৌন সমস্যা হিসাবে এখানে উপস্থিত রয়েছে—'সেই একদিন যখন আমি নারী ছিলাম'—গোছের এবং তাও দেড পাতার মধ্যে। ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষের 'অব্যাহতি' বলে একটি গল্পের কথায় এবার আসছি। নর্ত্তকীর সঙ্গে বড় লোকের ছেলের প্রেম—এবং বড লোকের ম্যানেজার এই উৎপাতে শঙ্কিত হয়ে কর্ত্তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় নর্তকীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বোঝালেন তার প্রেমাস্পদকে ভালবেসে সে কি সর্বনাশ করেছে। কাজেই তার ভবিষ্যতের জন্য নর্তকী ভালবাসায় ত্যাগধর্মই শ্রেষ্ঠ মেনে নিয়ে ভাল একটা নাচের মাথায় "প্রিয় তুমি এলে না—এখনো এলে না" বলতে বলতে বিষ খেয়ে মারা গেল। যেমন মোটা প্লট, তেমনি লেখা, এর বেশী বলার দরকার নেই। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও অনেক পূজা সাহিত্যের ব্যবসায়ী এত কাগজ পেয়েছেন যে, কি করে পাতা পোরাবেন তা ঠিক পান নি, এই মনে হচ্ছে। এর পরে নন্দদুলাল সেনগুপ্তের 'বনবিডাল' (বালীগঞ্জের বড় লোকের বাডীর মেয়ের সঙ্গে 'বন বিডাল' প্রাইভেট টিউটরের লুকিয়ে বিয়ে) এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রস্তাব' (ত্রিশ বছর বয়সে বিগত যৌবনা অবিবাহিতা পিসিমার কাছে যে প্রেম নিবেদন করতে এল—দেখা গেল তা পিসিমার জন্য নয়—পিসিমার ফ্রক পরা ভাইঝির জন্য)। প্রথমটি পড়ে বালিগঞ্জের মেয়েদের হুঁসিয়ার মায়েরা আরো সতর্ক হবেন, এবং শেষেরটায় বুড়ো ঠাকুরমারা খুশী হবেন। গল্প হিসাবে এদের স্বপক্ষে এই বলা চলে, আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলেন, "দেখ, এমন গল্প লিখবে যা অল্প শিক্ষিতা সেকেলে ঠাকুরমা দিদিমারা পর্য্যন্ত বেলা তিনটার সময় হেঁসেলের কাজ সেরে নাকে চসমা এঁটে পড়বেন এবং আনন্দ পাবেন ; অথচ তোমার উদ্দেশ্যে ভিড়বেন।" বন্ধুটির নাম সোমনাথ লাহিড়ী।

যাঁদের ঠাকুরমা দিদিমা আছেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন কথাটা একবার এইসব গল্প দিয়ে পরখ করে দেখেন।

এবার আমি শেষ দফায় আসছি। এই দফায় আমি ১৪।১৫টি গল্প পড়েছি। গল্পগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করব না। যদিও আমি মনে করি এই গল্পগুলি সকলের পড়া উচিত বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ঝোঁক বোঝবার জন্য। এইগুলির লেখক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমলা দেবী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, নবেন্দু ঘোষ ও রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ। একটা কথা আমার খুব গর্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আছে। তা হচ্ছে এই যে, এঁরা প্রায় সকলেই প্রগতি-মূলক সাহিত্য ও জীবনে আস্থাবান, প্রথম চারজন তো সেরূপ প্রতিষ্ঠানের (ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের) সক্রিয় সভ্য। বাংলা সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ ও গঠন মূলক সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন চেষ্টায় এরা যে রকম ভাবে এগিয়েছেন তাতে শুধু আমরা নই, সমস্ত পাঠক শ্রেণী আনন্দিত হবেন এবং নিজেদের সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হবেন।

আমার মতে এবারকার পূজার লেখায় অবিসংবাদিতভাবে নেতৃত্ব করছেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। কারণ হল এই যে বাংলা সাহিত্যিকের জীবনে আজ যে যোগাযোগ ঘটেছে তার সদ্ব্যবহারের সমস্যা এখনো মেটেনি। বাংলার সাহিত্যিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাইপ সৃষ্টি করে নিঃশেষিত হয়ে যান। ঘটনার সাক্ষাৎ কদাচিত ঘটে। ঘটনার মধ্য দিয়ে সেইসব টাইপ কি বিশেষ রূপ নিচ্ছে তা দেখেন না—জীবনেই নেই ঘটনা তা তাঁরা কি করবেন? ধীরে ধীরে সাধারণের অলক্ষিতে জীবনের ভিত্তি যে খসে পড়ছে তা দেখে ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য। তবু এই ধরনের সমাজবোধ সাহিত্যে আনবার জন্য কিছুদিন হল চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এল যুদ্ধ—গ্রাম ছাড়ানো danial policy, জাপানী আক্রমণ, রাজনৈতিক সংকট, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় বড় ঘটনা পৃথিবীর খুব কম জায়গায় ঘটেছে। সাহিত্যিকদের জীবনেও এতবড় সুযোগ আর কখনো আসেনি। এইসব ঘটনার সঙ্গে চরিত্র সৃষ্টি একত্রে যিনি করতে পারবেন তিনিই কেবল এই মহা-ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন—এই ছিল সাহিত্যিকদের সামনে সমস্যা। এই সমস্যাকে যারা সচেতনভাবে মেনে নিয়ে কাজে নেমেছেন এবং সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর আমার মতে শ্রেষ্ঠ এবং অনেকখানি সার্থক।

তাঁর লেখায় ঘটনার ও চরিত্রের যে ব্যাপ্তি আছে সেই পরিমাণে তাঁর সমধর্মী লেখকদের নেই। মাণিকবাবু, মনোজবাবু প্রভৃতি ভাল গল্প লিখেছেন কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে। হয়তো তারই ফলে তাঁরা প্রচলিত লেখার মাপকাঠিতে নিখুঁত লিখেছেন—কিন্তু তারাশঙ্কর বড় জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে যে পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছেন—তাতে আধুনিক standard-এ না মিললেও তার জন্য নতুন করে বিচার করতে হবে। কেউ কেউ বলছিলেন তারাশঙ্করের লেখাগুলি diffused হয়ে গেছে—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। সাফল্য অনেক বড়। তারাশঙ্করের লেখায় আর একটি জিনিস ধরা পড়ে। তাঁর তীব্র আবেগ, বাংলার দুঃখ কষ্টে তাঁর মর্মান্তিক বেদনাবোধ এবং তার মধ্যে তাঁকে যেন কে সব সময়েই কণ্ঠরোধ করছে এমনি একটা শংকিত দৃষ্টি। তবু তিনি বলবেন মানুষের এই দুর্গতির কথা, যথাসাধ্য প্রচার করবেন তার কারণ এবং দুঃখী মানুষের কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন তাঁর নিজের আত্মার কান্না। "বোবা কান্নায়" তো এটা পরিষ্কার। 'বোবা কান্না' বাংলা দেশের কান্না যাকে বোবা করে রাখা হয়েছিল; বোবা কান্না তারাশঙ্করেরও বটে—এতগুলি পাতা লিখেও। "বোবা কান্না" ও "শেষ কথাতে" তারাশঙ্কর খানিকটা প্রতীকধর্মী হয়েছেন। তার কারণ সুস্পষ্ট—প্রেস আইন। "বোবা কান্নায়" আছে একটি গ্রামস্থ ইনফর্মারের সুন্দরী স্ত্রী, গ্রামের ডাক্তার, একটি সিঁদেল চোর, একটি পুরোহিত। যুদ্ধ এনেছে অনাহার এবং আজকে ব্যাধি পীড়িত বাংলা। ইনফর্মারটি অসুখে মারা গেল, তার একমাত্র সন্তান সেইদিনই অসুখে পড়ল। সুন্দরী বিধবার সেই সন্তানকে রক্ষার জন্য বিজ্ঞান ধর্মী ডাক্তার, ঈশ্বর বিশ্বাসী পুরোহিত এবং রবীনহুড ধর্মী চোর তিনজন লেগে গেল যে যার মত করে। তিনজনেই পরস্পর বিরোধী। মেয়েটির সৌন্দর্যের জন্য যে তারা আকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, মোটের উপর একটা সাধারণ মমতায় তারা একত্র চেষ্টা করলে। মেয়েটি যে বোবা, জানা গেল—সন্তান মারা গেলে। পরাজয়ে ডাক্তার বিষ খেতে যায়, পুরোহিত বলির খড়গ নিজের গলায় তুলতে উদ্যত হয় আর চোর গলায় দড়ি দেয়। বাংলার বিরাট বিপর্যয়ে বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান, ধার্মিকের ঈশ্বর বিশ্বাস, সাধারণ দোষ গুণে গড়া মানুষের কল্যাণবোধ কিছুই কাজে এল না। কিন্তু মানুষের গড়া এই বিপর্যয়ে যুদ্ধ আসছে কেবল এরোপ্লেনের শব্দের মধ্য দিয়ে, আপদে ঔষধের চোরাবাজারের মধ্য দিয়ে, কুইনিনের আম্পুলে জল প্রভৃতি সব ঘটনার মধ্য দিয়ে। কান্নায় লেখকের

ঘৃণা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কেন? তারাশঙ্করবাবু নিজের আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করতে কসুর করেন নি, আজ তাই তাঁর মত নেতৃস্থানীয় লেখকের কাছ থেকে সেই মহান ঘৃণার উদ্যত হওয়ার প্রয়োজন ছিল—যারা আঘাত পাওয়ার যোগ্য তাদের উপব সে আঘাত দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। "শেষ কথা"তে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে দিয়ে গান্ধীজীর কারাগারে উপবাস এবং কস্তুরবার মৃত্যু ব্যাপারটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এও এক নতুন ধবণের চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনকল্পে গান্ধীজীর উপবাসকে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে রূপ দেওয়াটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। "পৌষলক্ষী" তে মাঠ ভরা ধান অথচ রোগাক্রান্ত অনাহারক্লিষ্ট চাষীর ধান তোলার প্রানান্ত চেষ্টা, নবান্নের দিনে মৃত্যু। এবং "ইস্কাপনের" মধ্যে চোর জেল থেকে গ্রামে ফিরে দেখে, জমিদার ঘর দুয়ার অধিকার করেছে, চার আনার পয়সায় এক পেট খাবার তো দূরের কথা এক গাল খাবার পাওয়া যায় না। লঙ্গরখানা—সেখানে তার সহকর্মীর ছেলে মেয়েও যায়। নানা দুঃখে গ্রামের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে কাশী গেল—সেখানে তাদের দলের তীর্থযাত্রীদেব লুটপাট করে খায়। শেষ পর্য্যন্ত এক বিধবা বাঙালী মহিলার সান্নিধ্যে এসে আবার তার স্মরণে পড়ে যায় বাংলার গ্রামেব অসংখ্য মনোরম স্মৃতি। সে আবার বাংলায় ফিবে যেতে চায়।

এর পরে মানিকবাবুর 'নমুনা' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পটিতে আছে—গ্রাম থেকে শহরে মেয়ে ধরে এনে বিক্রী করার কাহিনী। অবশ্য এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় যে লোকটি মেয়ে ধবে আনলো এবারে তাকে মেয়ের বাপের তাগিদে ঠাকুর ঘরে দাঁড়িয়ে ধর্মপত্নী বলে মেয়েকে গ্রহণ করতে হল। মেয়েটির জন্য শহরে এসে মায়াও একটু তাব জন্মেছিল এবং অন্য লোককে তার ঘরে যেতে দিত না। তারপর আর একটি bussiness trip দিয়ে যখন শহরে ফিরলো, দেখে বাড়ীওয়ালী মেয়েটির ঘরে লোক ঢুকেছে। ধর্মস্ত্রীর ঘরে লোক? পরিবর্তে বিরাট একতাড়া নোট এল চালের কারবারীর হাত থেকে। স্বামিত্ববোধ চুপ করে গেল। ছোট ব্যাপার। কিন্তু এর মধ্যে অভাবের তাড়নায় মানুষের বহুকালের অভ্যাস ও সংস্কার কিভাবে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে মানিকবাবু তা সুন্দর দেখিয়েছেন। এটি নিখুঁত গল্প এবং বেশ ভাল গল্প। মনোজবাবুর "নিমন্ত্রণ,' 'নৌকা' ও 'ধান পেকেচে' গল্পে আছে শহরে দুঃস্থদের ভিড়, denial policy-র জন্য সরকার কর্তৃক নৌকা নিয়ে নেওয়া এবং তার মধ্যে শহরের বাবুদের গেরিলা যুদ্ধ শিখতে বলার মুখে কৃষকের স্বদেশ প্রেমের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। মনোজ বাবুর লেখার মধ্যে আবেগ আছে

যথেষ্ট কিন্তু তারাশঙ্করের মত ব্যাপ্তি নাই বা মানিকের মত Precision-ও নাই। বেশী আবেগ প্রকাশ পাওয়ায় খানিকটা তরল হয়ে পড়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালো জল' ও 'খড়্গ': এই দুটি গল্পের প্রথমটিতে আছে অনাচার পীড়িত বাংলার এক পরিবারের ধ্বংসের ছবি এবং তার সঙ্গে মজুতদারের কাণ্ড—দুই ঘটনার দর্শক এক নৌকার মাঝি। দ্বিতীয়টিতে আছে—অভাবের তাড়নায় বন্ধু (চামড়া ব্যবসায়ী মুচী) অন্য এক বন্ধুর (গাড়োয়ান) গরু বিষ খাইয়ে মারছে—আর শেষোক্ত লোকটির যুবতী স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে গ্রামের পয়সাওয়ালা ব্যবসাদার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় একটি জিনিস খুব দেখা যায়। অন্যায়ের প্রতি hatred তাঁর লেখায় বেশ বেরিয়ে আসে। এবং মাঝে মাঝে তা এমনি হয় যে, গল্প ছেড়ে প্রচার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। নারায়ণবাবুর তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করার চেষ্টাকে প্রশংসা করি; এবং একথা বলি যে, তিনি বেশ গভীর ভাবে বোধ করেছেন বলেই এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে লিখেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের বেদনাবোধ যেখানে গল্পের মধ্যে ফল্গুনদীর মত বয়ে চলেছে, গল্প ছাড়িয়ে প্রকাশ হয় নি—নারায়ণবাবু সেক্ষেত্রে অনেক জায়গায় গল্প থামিয়ে বেশ কিছু গাল দিয়ে নিয়েছেন।

অমলা দেবীর 'হারাধন'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হারাধন' চরিত্রের প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন অবস্থা নানাভাবে দেখানো হয়েছে। হারাধন প্রজাদের চাল মেরে বড়লোক হলেন। কিন্তু তার অসুস্থ পুত্রের ভাত খাওয়া বারণ। এই গল্পটিতে একত্রে অনেক ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া আছে যাতে দুর্ভিক্ষের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শিল্প কুশলতা তত বেশী লক্ষ্য করা যায় না।

এর পরে আবুল কালাম সামসুদ্দিনের 'কেরায়া নায়ের মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'আগুন', রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের 'মেঘনা চরের চাষী' এবং নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার' এই দফায় পড়ে। প্রথম তিনটি দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বিভিন্ন অবস্থার লোকের ছবি। অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে বটে, তবে খুব উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্য হয়নি। নবেন্দু ঘোষের বাঁকা তলোয়ারও অনুরূপ গল্প; কিন্তু গল্পের নায়িকা দুঃস্থা একটি নারীকে লেখক কিসের জোরে ভরসা দিলেন 'তলোয়ার শানানো হচ্ছে ভয় নেই' এটা বোঝা গেল না। অনেকটা যেন আকাশবাণী হল।

মোটের উপর এই হল আমার বক্তব্য। এতগুলি লেখা সম্পর্কে খুব সঠিক

মতামত দিতে হলে আরো সময় এবং আরো স্থান লাগে। সেগুলি না পাওয়ার ফলে কিছু অবিচারও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে সবই মানি—এবং সেইজন্য লেখকদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে তাঁদের লেখা পড়ে আমার মত সাধারণ পাঠকের মনে প্রথম যা এসেছে তাই বল্লাম। তাঁদের ক্ষমতার উপর কটাক্ষ করার কোন ইচ্ছা আমার নেই—এবং আমি বিশেষজ্ঞের সম্মান দাবী করি না।

পরিচয়—১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণ।

প্রেমচন্দজীর দান

তিন চার বছর আগেও বলা যেত আমরা বাঙালীরা বাংলা অনুবাদে মোটেই আগ্রহশীল নই। অথচ একথা আমরা সবাই জানি নিজের সাহিত্য উচ্চ কোটির হলেও বিদেশের সম্পদ নিজের ভাষায় অনুবাদ করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। ইংরেজী সাহিত্য বিরাট তবু সে ভাষা কি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে উদাসীন? হিন্দি সাহিত্য তো অনুবাদের আশ্রয়ে হিন্দি সংসারকে যথেষ্ট সবল ও সজাগ করে রেখেছে। আনন্দের কথা, আজ বাঙালী বিদেশী সাহিত্যকে বাংলা করতে কতকটা উদ্যোগী হয়েছে। তবু ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সম্পদকে আমরা এখনো যথেষ্ট মূল্য দিই না। বাংলার তুলনায় তাদের মোট সম্পদ এখনো হয়তো স্বল্প। কিন্তু তব তাদেব মধ্যেও এমন প্রতিভাবান স্রষ্টা কেউ কেউ আছেন যাঁদেব সৃষ্টি অনেক বড সাহিত্যে সাদবে গ্রাহ্য হবে। এমনি সাহিত্যিক ছিলেন হিন্দির অমর কথাশিল্পী প্রেমচন্দজী।

প্রেমচন্দের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'সপ্ত-সরোজ' এর নবম সংস্করণ পাঠে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: "গল্পগুলি বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট ও ভাবপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সহিত ইহার তুলনা করা অন্যায় ও অনুচিত সাহস; কিন্তু অন্য কোন বাঙালী লেখক এত ভাল গল্প লিখিতে পারেন কিনা সন্দেহের বিষয়।" অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বাংলা উপন্যাসের একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ভিন্ন প্রদেশের সমসাময়িক প্রতিভাকে অকুণ্ঠভাবে নিজের চেয়েও উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন।

তবু অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের নিকট প্রেমচন্দজী সুপরিচিত নন। অথচ একদিক থেকে দেখতে গেলে সত্য সত্যই বাংলা সাহিত্যেও তাঁর জুড়ি নেই। প্রেমচন্দের জনৈক লব্ধ প্রতিষ্ঠ হিন্দিভাষী সমালোচক বলেছেন: "বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস যাহারা বাংলায পড়িয়াছেন, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে আমার কথা স্বীকার করিবেন যে 'প্রেমাশ্রম'-এর অনেক স্থানে মনস্তত্ব বিচারের ছবি আঁকিতে গিয়া প্রেমচন্দজী কোথাও কোথাও বঙ্কিমবাবুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাহারা স্বীকার কবিবেন যে বাংলায় বঙ্কিমবাবুর রীতি যেখানে শব্দ-বহুল, প্রেমচন্দজী সেখানে অনেক স্থলে অল্প কথায় সুকৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসলেখক যখন ভারতীয় উপন্যাসের

আলোচনা করিবেন, তখন কৃষকের চিত্র সুন্দর ও যথার্থভাবে আঁকিয়াছেন বলিয়া প্রেমচন্দকে প্রধান স্থান দিতে হইবে।"

এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও স্বর্ণপ্রভা সেনের অনূদিত প্রেমচন্দজীর প্রধান উপন্যাস 'গোদান'-এর ভূমিকায়। কিন্তু কথাটি যে বাড়াবাড়ি নয় তার প্রমাণ এই উপন্যাস আর তার অনুবাদ এতদিনে বাংলায় পেয়ে বাঙালী পাঠক সমাজ অনুবাদকের কাছে কৃতজ্ঞ হবেন। সত্যই এতদিনে প্রেমচন্দজীর দানের একটা যথার্থ পরিমাপ পাওয়া গেল।

বাংলা সাহিত্যে অবশ্য প্রেমচন্দের পরিচয় আরও আগে ঘটানো উচিত ছিল। ইংরেজি মারফৎ তাঁর পরিচয় ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘের এক সংকলন পত্রিকায় তাঁর 'কফন' গল্পের অনুবাদ পড়ে আমরা চমকিত হয়েছিলাম। তাছাড়া সাহিত্যরসিকমাত্রেই শুনে থাকবেন যে প্রেমচন্দজী হিন্দি সাহিত্যের গর্ব। তিনি হিন্দি জগতে দীর্ঘ দিন ধরে আপনার সৃষ্টির বলে একটি আশ্চর্য আবহাওয়া সৃষ্টি করে যান; তাতে সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা হিন্দি সংসারে প্রবলবেগে প্রসারিত হয়ে পড়ে—একদিক থেকে ঠিক যেমনটা শরৎচন্দ্র করতে পেরেছিলেন বাঙালী সমাজে তাঁরই সমকালে।

"গোদান" বহু সমালোচকের মতে প্রেমচন্দের শ্রেষ্ঠ অবদান। আবার অনেকে বলেন যে তাঁর 'রঙ্গভূমি' 'কায়াকল্প' ও 'গোদান' একই পর্যায়ের উপন্যাস। কিন্তু অধিকাংশের মত 'গোদান'-এর পক্ষে পাল্লাভারী করেছে।

এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে প্রধানত কৃষক জীবন নিয়ে। অবশ্য প্রেমচন্দের অধিকাংশ লেখাই তাদের নিয়ে। তবু অন্যান্য চরিত্রের কোন অভাব 'গোদানে'-এ নেই বা তাদের চরিত্র চিত্রণে কোন অমনোযোগিতাও দেখা যায় না। কিন্তু আসল বৈশিষ্ট্য এইখানে—তিনিই প্রথম ভারতীয় লেখক যিনি ভারতের শতকরা ৭৫ জনের জীবন উপন্যাসের প্রধান উপকরণ করেছেন এবং সার্থক লেখা লিখেছেন। প্রেমচন্দ টলস্টয়ের সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন—নিজে তাঁর গল্পের অনুবাদও করেছেন। আনাতোলফ্রাঁস, রবীন্দ্রনাথ ও গলসওয়ার্দির লেখাও তিনি অনুবাদ করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যের এই সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর সাহিত্যিক মনকে সম্পদশালী করেছিল। তাছাড়া প্রেমচন্দের জীবন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। গান্ধীজীর ডাকে তিনি স্কুল ইন্সপেকটরের কাজ ছেড়ে এসেছিলেন। ভারতের রাজনীতি

ও সমাজনীতিতে প্রগতির যে ধারা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে তার প্রধান প্রবাহ হল উত্তর ভারতে আর্য সমাজী আন্দোলন ; কংগ্রেস আন্দোলনের গোড়ার দিকে সংস্কারবাদী উদারপন্থীদের প্রাথমিক চেষ্টা, গান্ধীজীর গণ আন্দোলন এবং সর্বশেষে সাম্যবাদী চিন্তা ও আন্দোলন। এ সব আন্দোলনের প্রভাব প্রেমচন্দের লেখার মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসেছে। এমন কি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে "দেবতার ফৌজ" নামক লেখায় তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি নিজের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এই সমস্ত বিচার করলে দেখা যায় যে ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের পাশেই। ভারতের গণআন্দোলনে যিনি প্রথম জোয়ার আনেন সেই গান্ধীজী স্বয়ং টলস্টয়ের অত্যন্ত ভক্ত এবং টলস্টয়ের জীবনের অনেক কিছু তিনি অনুকরণ করেছেন বল্লেও অন্যায় হয় না। আমাদের দেশের কোন্ সাংস্কৃতিক নেতাই বা টলস্টয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত? কিন্তু প্রেমচন্দজীকে কৃষক সাজতে হয়নি। তিনি তাদের মধ্যেই ছিলেন ছোটবেলা থেকেই, আজীবন কাল তাদের দেখেছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে। কৃষকদের চরিত্র অংকনে তাই তাঁর দক্ষতার তুলনা নেই। এবং গান্ধীজী যখন নিজে কৃষক সাজবার চেষ্টায় নিজেকে ভদ্রলোক ও কৃষক দুই পক্ষের কাছে দুর্বোধ্য করে তুললেন তখন প্রেমচন্দ নিঃসংশয়ে কৃষক-মজুরের রাজ্য রুশিয়ার দিকে আঙুল দিয়ে কৃষকদের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। এই দিক দিয়ে এক বড় বিচিত্র এবং গর্বের জিনিষ আমাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ উভয়ের উপর গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাই বলে ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই মহান বিশ্বনেতা সংস্কৃতির বৈপ্লবিক ঐতিহ্য যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পিছপাও হন নি। কোন দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লব হওয়ার আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দরকার। আমাদের দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক নেতারা সেই বিপ্লবের বীজ বপন করেছেন বলে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পারি।

প্রেমচন্দ সম্পর্কে অনেক কথাই বলার আছে। এতক্ষণ যা বলেছি তাতে হয়তো অনেক কথা অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে। হঠাৎ একটা বিরাট সম্পদের সামনে দাঁড়ালে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা জানি। আশাকরি পাঠকও তা বুঝবেন। আমি মনে করি যে প্রেমচন্দের অন্যান্য লেখার বাংলা অনুবাদ হওয়া দরকার এবং সেগুলির উপর আলোচনা হওয়ারও

প্রয়োজন। প্রেমচন্দ অনেক লিখেছেন এবং অনেক বিষয়ে লিখেছেন। সে সম্পর্কে আলোচনা আমার এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অনেকগুলি বই হয়তো সেজন্য লিখতে হবে। এবং আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রয়োজনে তা করারও দরকার বলে আমি মনে করি। সক্ষম ব্যক্তিরা সে কাজ করবেন এই আশা নিয়ে আমি 'গোদান'-এর আখ্যানভাগ সম্পর্কে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

অযোধ্যার বেলারী গ্রামের হরি মাহাতো একজন মাঝারি অবস্থার কৃষক। তার স্ত্রী ধনিয়া, যুবক ছেলে গোবর ও দুই মেয়ে সোনা ও রূপা। হরির ছোট দুই ভাই শোভা ও হীরা বড় হয়ে বিয়ে করার পর আলাদা হয়ে যায়। হরির সম্পদের মধ্যে থাকে ৩'৪ বিঘা জমি।

একদিন হরির সঙ্গে মৃতদার ভোলা গোয়ালার দেখা। ভোলার একটি সুশ্রী গাইয়ের উপর হরির লোভ ছিল। হরি প্রৌঢ় ভোলাকে বিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ৮০ টাকার চুক্তিতে ঐ গাই পেয়ে যায়। অবশ্য টাকা নগদ দিতে হয় না। গরু আনতে গিয়ে ভোলার বালবিধবা কন্যা ঝুনিয়ার সঙ্গে হরির ছেলে গোবরের প্রণয়ের সুত্রপাত হয়। গরু কেনাতে ভাই হীরা চটে গেল। সে ভাবলে যে বড় ভাই তাদের প্রবঞ্চিত করে যে টাকা জমিয়ে রেখেছিল তাই দিয়ে গরু কিনেছে। তাই একদিন রাত্রে বিষ খাইয়ে ঐ গরুকে মারল। হরি ব্যাপারটি জানতে পেরে গোপনে স্ত্রীকে সে কথা বলে। অবশ্য সে তাকে মানাও করেছিল যেন পাড়া-পড়শীর কানে কথাটা না যায়। ধনিয়া কিন্তু সে পাত্রীই নয়। তার চীৎকারে দারোগা পর্য্যন্ত এসে হাজির। ভয়ে হীরা তো গৃহত্যাগী হ'ল—আর হরি বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঘুষ দিয়ে দারোগাকে সরিয়ে দিল—ভাইয়ের ঘর তল্লাসী হতে দিল না।

এদিকে গোবর ও ঝুনিয়ার প্রণয়ের ফলে ঝুনিয়া সন্তানসম্ভবা হল। গোবর এক রাত্রিতে ঝুনিয়াকে নিজের বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে শহরে পালিয়ে গেল। ঝুনিয়ার উপর রাগ থাকলেও নিজের ছেলের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে বলে হরি ও ধনিয়া ঝুনিয়াকে কন্যা স্নেহে আশ্রয় দিল। ফলে সমস্ত গ্রামের অসন্তোষ হরির উপর পড়ল। এমন কি ঝুনিয়ার বাবা ভোলা পর্য্যন্ত এসে গরু বিক্রি বাবদ পাওনা ৮০ টাকার বদলে হরির দুটি বলদ নিয়ে গেল। শেষে গ্রাম সমাজের কাছে জরিমানা দিতে হরি সর্বস্বান্ত হ'ল। গোবর শহরে কাজ করছিল, বাড়ী ফিরে বাপের দুরবস্থা দেখে প্রতিকার করতে চাইল। কিন্তু হরির আত্মসম্মান বোধ সে পথে বাধা। ফলে গোবর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে শহরে ফিরে গেল।

হরিকে নিজের সংসার এবং ভাই হীরার স্ত্রীর সংসার দেখতে হত। তার উপর মেয়ে সোনা রূপার বিয়ে দিতে গিয়ে ঋণের ভার আরো বেড়ে গেল। এই অবস্থায় একদিন মাঠে খাটতে লু' লেগে হরি মারা গেল।

এই হ'ল 'গোদানের' একাংশ। এর মধ্যে আরো অনেক চরিত্র আছে। গ্রামের মহাজন পণ্ডিত দাতাদিন, তার ছেলে মাতাদিন। (ইনি চামারণীর সঙ্গে প্রেম করেন—কিন্তু স্বহস্তে পাক করে খান বলে জাত যায় না!) ঝিংগুরী সিং, পটেশ্বরী লাল ও নোখেরাম। কৃষক প্রধান গ্রামে যাদের দেখা যায় আশা করি তাদের কেউই বাদ যায় নি চরিত্রের এই তালিকা থেকে।

এছাড়াও আরো একটি গল্প আছে এরই পাশে পাশে। বেলারী গ্রামের পাশে সেমরি গ্রামের রায় সাহেব অমর পাল সিং ঐ অঞ্চলের জমিদার। কাউন-সিলের সদস্য পদ ছেড়ে তিনি জেলে গেলেন—কিন্তু রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাব। তার সম্পাদক বন্ধু ওঙ্কারনাথ দেশের কথা ভেবে শরীর 'জল' করে ফেলেছেন। তার আর একটি বন্ধু শ্যামবিহারী তনখা ওকালতিতে পশার না হওয়ায় বড়লোকের দালালী করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ মেহতা, ব্যাংকের ম্যানেজার এবং চিনির কলের মালিক সিঃ খান্না ও তার স্ত্রী কামিনী এবং অতি আধুনিকা ডাঃ মিস মালতী—অক্সফোর্ডে দর্শন পড়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী পাশ করে এসে দেশে প্র্যাকটিশ করছেন।

তা ছাড়া এই আড্ডার আর একটি বন্ধুলোক মীর্জা খুরশীদ—বসরার বহু টাকার ব্যবসা এক মেমসাহেবের প্রেমে আহুতি দিয়ে এখন লখ্‌নৌয়ে জুতার দোকান খুলেছেন। ইনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও দিলখোলা লোক। মালতী এই আড্ডার মক্ষীরানী এবং খান্না, মেহতা ও খান্নার স্ত্রীকে নিয়ে এই সম্পর্কে একটা ঈর্ষার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

মোটামুটি বলতে পারা যায় যে ভারতীয় সমাজের সমস্ত অংশ এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে। মনে রাখতে হবে এটি ১০।১২ বছর আগে লেখা। ভারতের ধ্বংস ও নতুন বিকাশ সম্পর্কে বিচারের ব্যাপারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গড়ে ওঠার অবকাশ পায় নি। কাজেই সমাজতত্ত্বের চুলচেরা বিচার এখানে উচিত হবে না। তবু একখানা উপন্যাসের মারফৎ যদি বিশ্ব-দরবারে ভারতকে পরিচয় দিতে হয় তো 'গোদান' নিশ্চয় বিবেচিত হবে।

'গোদানে'র বিষয় বস্তু নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। অনেকে বলেছেন যে এক দিকে হরির কাহিনী এবং আর একদিকে রায় সাহেবদের

কাহিনী নিয়ে দুটি পূর্ণাঙ্গ ভাল উপন্যাস লেখা যেতে পারতো। কিন্তু আমার মনে হয় প্রেমচন্দ একই সঙ্গে ভারতীয় জীবনের দুটি ধারা দেখাতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশ কৃষকের কাছে নতুন জীবনের বার্ত্তা বয়ে এনে তাদের সঙ্গে নিজেরও মুক্তি অর্জন করতে পারে—বইটিতে এই ইঙ্গিত তিনি সুস্পষ্ট দিয়ে গেছেন। কাজেই রচনারীতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়তে পারে জেনেও লেখকের পক্ষে এ কাজ করা খুবই স্বাভাবিক। গৃহত্যাগীভাই হীরার প্রত্যাবর্ত্তন এমন ভাবে হয়েছে যাকে রীতি সঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু সে কথা পাঠকের বেশীক্ষণ মনে থাকবে না। উপন্যাসের যে অংশে তাকে আনা হয়েছে সে অংশের গতিবেগের জন্য পাঠকের ভাববার অবকাশ কম। রায় সাহেবের আড্ডার সঙ্গে হরির সংযোগ অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হবে। হরি রায়সাহেবের সাধারণ প্রজা। পালে পার্বনে বা খাজনা দিতে জমিদার বাড়ীতে আসা ছাড়া অন্য কাজ তার থাকতে পারে না। এবং সবসময়ে জমিদারদের দেখা পাওয়া স্বাভাবিক নয়। অপর পক্ষে মীর্জ্জা ও মালতীর বাড়ীতে গোবরের চাকরী করার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে আখ্যানভাগের দুর্ব্বলতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা পাঠকের কাছে এই সব দুর্ব্বলতা বড় হয়ে উঠবেনা। 'টেল অব টু সিটিজ্' এর মত দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার মাঝখানে কোন শক্ত সেতুই বা পাওয়া যায় দালাল কিম্বা দাস ছাড়া ?

'গোদানে'র ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে এই রকম দুর্ব্বলতা বেশী নেই। মিঃ খান্নার চিনির কলে আগুন লাগা বা 'লু' লেগে হরির মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। শহর ও গ্রামের অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সাবলীল স্রোতে গল্প বিস্তার লাভ করেছে। অথচ কোন জায়গা সুদীর্ঘ বলে মনে হয় নি।

এই বিষয়ে এবং প্রকৃতি বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। গ্রামের জীবন বহুকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে অনেক বড় ধাক্কা সহজে মাথার উপর দিয়ে পার করে দিয়েছে। বিরাট বিরাট ঘটনার ঢেউ কদাচিৎ গ্রামের জীবনে স্পন্দন এনেছে। অথচ তার একঘেয়ে পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার পর্ণকুটীর। নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানের মত কিংবা বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ এই জীবনকে তারা মেনে নিয়েছে। "উহাদের সমগ্রজীবন প্রকৃতির অনুরূপ। গাছে ফল ধরিল,

লোকে তাহা খাইবে, ক্ষেতে আনাজ পাতি হইলে তাহাও সংসারে পাঁচজনের কাজে লাগে ; গরুর বাটে দুধ প্রচুর, সে কি উহা নিজে পান করে ? পাঁচ জনে তাহা পান করিয়া বাঁচে ; মেঘ বৃষ্টির ধারা দান করে, পৃথিবী তাহাতে শীতল হয়। এই যে বিধান ইহার মধ্যে স্বার্থের স্থান কোথায় ?" প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাই এদের দেশ বিদেশ ঘুরে উপভোগ করতে হয় না—নিজেদের মধ্যে তাকে সব সময়ে পাওয়া যায়। মাথার উপর নীল আকাশ, সম্মুখে বিস্তৃত শস্য শ্যামল মাঠ, নদ-নদী-বিল, রাত্রে অমাবস্যার অন্ধকার বা জোৎস্নার আলো— এই সব সামান্য জিনিষের সংযোগে একটা গোটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রেমচন্দের লেখায় গ্রামের সকাল, সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার রূপ কলমের দুই একটি আঁচড়ে যে ভাবে ফুটেছে তা গ্রামের খবর যারা রাখেন তারা উপভোগ করবেন। যুক্তপ্রদেশ বা বিহাবেব গ্রামগুলির কাছে পাহাড়, তৎসংলগ্ন বন বা ঝরণা থাকায় প্রেমচন্দের পক্ষে আরও সুবিধা হয়েছে।

প্রকৃতি ও মানুষের রূপবর্ণনায় প্রেমচন্দ কুশলী :

"নদীর ধারে কে যেন রূপার চাদর বিছাইয়া, আর নদী রত্নখচিত অলঙ্কারে সাজিয়া মধুর স্বরে গাহিয়া চলিয়াছে ; তারাকে ও তন্দ্রাচ্ছন্ন গাছগুলিকে চন্দ্র আপনার নৃত্য দেখাইতেছে।"

মিঃ খান্নার চিনির কলে আগুন লাগার বর্ণনা এমনি :

"আগুনের সাগর আকাশ পযন্ত উথলাইয়া উঠিয়াছে⋯উন্মত্ত লহরী এক এক ঝলকে তাহার লোল জিহ্বা মেলিয়া এমনি উঁচুতে উঠিয়াছে, মনে হয় আকাশ-কেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঐ অগ্নিসমুদ্রের নীচে ধোঁয়া এমনি ছাইয়া ফেলিয়াছে, মনে হইতেছে শ্রাবণের ঘনঘটা যেন কাজল সমুদ্রে স্নান করিয়া ধরায় অবতরণ করিয়াছে। আর উপরে দাঁড়াইয়া আছে হিমালয়, উদ্বেল, কম্পমান। ⋯মনে হয় শেষ নাগ বুঝি সহস্র মুখ বিস্তার করিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতেছে।

অন্যদিকে মানুষের রূপ বর্ণনাতেও প্রেমচন্দ অদ্বিতীয় :

"যুবতীর রং কালো, তাও আবার মিশ কালো, কাপড় ময়লা, ছেঁড়া, গহনার মধ্যে হাতে দুই গাছা মোটা চুড়ি, মাথার চুল এলো-মেলো, উস্‌কোখুস্‌কো। মুখের মধ্যে এমন কোন জায়গা নাই যাকে বেশ সুন্দর বলা যায়। কিন্তু স্বচ্ছ নির্মল জল ও হাওয়া ঐ কালো রংকে এমন লাবণ্যমণ্ডিত করিয়াছে আর প্রকৃতির কোলে মুক্ত ও অবাধ চলাফেরার ফলে উহার দেহ এমনি সুঠাম, সুডৌল এবং

গতিভঙ্গী এমনি স্বচ্ছন্দ যে মনোহর যৌবনের চিত্র আঁকিতে হইলে ইহার অধিক সুন্দর তুলনা বুঝি মিলিবে না।"

আগেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির কথা বলেছি। দুইটি গল্পের চারটি প্রধান চরিত্র বলা যায়। এক দিকে হরি ও ধনিয়া—অপর দিকে ডঃ মেহতা এবং মালতী। হরিই প্রধান চরিত্র। কত সার্থকভাবে প্রেমচন্দ এই চরিত্র এঁকেছেন তা অল্পে বলা সম্ভব নয়। ভারতের কৃষকের সভ্যতা,নীতি ও ধর্মবোধ শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রশংসিত হয়েছে। হরি সেই সভ্যতার সমস্ত দোষগুণ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এই কৃষককে ভাল না বেসে পারা যায় না—আবার এর জাগরণের জন্য আঘাত এলে আপশোস করতে ইচ্ছে করে। কার্ল মার্কস বলেছেন যে ভারতের গ্রামের কূপমণ্ডুকতা ভাঙ্গতে ইংরেজ শাসনের হাতুড়ি কড়া লাগলেও উপায় কি ছিল? 'গোদান' এর অন্যতম নায়ক ডঃ মেহতা ভাবছেন: "জ্ঞানীরা নিজেদের মনগড়া এক আদর্শ সংসার সৃষ্টি করিয়া আদর্শ মানবতার আবাদ করিতেছেন—তাহাতে ডুবিয়া আছেন। বাস্তব কি রকম অসম্ভব, কত দুর্বোধ্য, কতটা অগম্য, তাহা উহারা ভাবেন না। চোখ মেলিয়া এই সত্যকে দেখিবার সাহস নাই যে গ্রামের লোকের ভালমানুষী তাহাদের দুর্দশার মূল। সম্ভবত উহারা যদি এত ভাল মানুষ না হইত, তবে এমন হালও হইত না। দেশে কি হইতেছে, দেশে বিপ্লবও যদি আসিয়া যায় তবু উহারা তাহার কিছুই খবর রাখে না। বলশালী রূপে যে কোন দল উহাদের সামনে আসিবে তাহার কাছে উহারা মাথা নোয়াইতে প্রস্তুত। উহাদের স্বভাব নির্বীর্য জড়তার সীমায় পৌছিয়াছে। উহাদের কর্মঠ করিবার জন্য চাই কঠিন আঘাত। আত্মা যেন চারিদিক হইতে নিরাশ হইয়া এখন নিজের মধ্যে পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, জীবনের চেতনাই যেন ইহাদের লুপ্ত হইয়াছে।"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কারক বা বিপ্লবীরা সচরাচর কৃষকের জীবনে আঘাত হেনেই পরিবর্তন আনার কথা ভাবেন—ব্যস্তববিমুখ বা সাবজেকটিভ চিন্তাধারার ফলে। প্রেমচন্দ এনিয়ে কোন তর্ক তোলেন নি। কারণ তিনি যে সময় লিখেছেন সে সময়ে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন খুব কমই হয়েছে। কোন কোন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন হয়েছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তার যোগ সাজস হয় নি। "কায়াকল্প" উপন্যাসে চক্রধর চরিত্রটি বলেছে: "আমাদের নেতাদের এই বড় দোষ। নিজেরা সহরে পড়ে থাকবে, গ্রামমুখো হবে না। প্রকৃত অবস্থা না জানলে তার প্রতিকারের শক্তিও আয়ত্ত করা

যায় না। ফলে জনতার উপর প্রভাবও তেমন হয় না, অথচ এ ছাড়া রাজনৈতিক সাফল্য সম্ভব নয়।" কাজেই কৃষকদের মধ্যে কাজ করার কৌশল কি সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে প্রেমচন্দ নিখুঁতভাবে কৃষকদের ছবি এঁকে ক্ষান্ত হয়েছেন। মেহতার মুখ দিয়ে কৃষক জীবনের যে জড়ত্বের কথা বলা হয়েছে হরির জীবনে ঠিক সেই চিত্র প্রকাশ পায় নি। যে কোন সামাজিক সংস্কারের কাছে হরির মাথা নত করার প্রবৃত্তিকে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু সেই কুসংস্কারের পিছনে রয়েছে গ্রামের পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বের উপর আস্থা। নতুবা হীরা বিষ দিয়ে গরু মেরেছে জেনেও হীরার ঘরে থানাতল্লাসী বন্ধ করতে হরি নিজের বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে, দেনা করে দারগাকে ঘুষ দিতে যাচ্ছে, গোবরের ছেলের মা বলে ঝুনিয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং তার জন্য সমস্ত বিপদ মাথায় তুলে নিচ্ছে, হীরার বউয়ের ঘর আগলাচ্ছে, তার জমি জায়গায় ফসল তৈরি করে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু কিছুতেই হরি ভেঙ্গে পড়ে না, জীবনের সঙ্গে অফুরন্ত সংগ্রামে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ে, সংগ্রাম করে হারে, কিন্তু থামে না। হরির এই সংগ্রামেব ধরণই অন্য রকম।

জামাই রামসেবক বলে: "যতই নরম হবে ততই লোকে পেয়ে বসবে। থানা, পুলিশ, আপিস সবাই হল আমাদের রক্ষার জন্য। কিন্তু রক্ষা করে না কেউ। চারিদিকে লুঠ হচ্ছে। যে গরীব, যে দুর্বল, তার গলা কাটতে সবাই সেজে থাকে। ভগবান করুন, যেন বেইমানি না করি, সেটা পাপ। ...কৃষক কিনা সকলের পায়ের নিচে। পাটোয়ারীর নজরানা আর দস্তুরী না দাও, তবে তোমার গাঁয়ে থাকা মুসকিল। জমিদারের পেয়াদার পেট না ভরলে তোমাব দিন কাটানো ভার। আর থানার দারোগা কনেস্টবল তো জামাই, গাঁয়ে তাদের কাজ পড়লেই জামাই-আদর কর, নজরানা দাও। নইলে এক রিপোর্টে গাঁ-কে গাঁ সাবা। কখনও কানুনগো, কখনও তহশিলদার, ডিপুটি, কখনো জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও কালেকটর, কখনও আসবে কমিশনার—আর অমনি কিসানকে জোড়হাত করে দাঁড়াতে হবে। তাদের জন্য সিধের ব্যবস্থা কর...।" "তেমনি এক ডাক্তার আসছেন কুয়োর জল সাফ করতে। আর এক ডাক্তার আসছেন গরু বাছুর দেখতে। ছেলেদের পরীক্ষা নিতে আসেন ইন্‌সপেকটর—আর অফিসার যে কত আসেন তা বলে শেষ করা যায় না। খালের ভিন্ন, জঙ্গলের ভিন্ন, তাড়ি-মদের ভিন্ন, কৃষি বিভাগের ভিন্ন। এর উপর গ্রাম্য সংস্কারক আছেন। পাদরী এলেও তার রসদ যোগাতে-হবে। এত সব হাঙ্গামা, এত সব অফিসার

এসে যদি কিসানের কিছু ভাল করত তাও বুঝতাম।' হরি এইসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তার জীবনে এই লড়াই কেবল কাহিনী। মেয়ের বিয়েতে দুশো টাকা নিয়ে সে ভাবে জীবন যুদ্ধে তার হার হল: ত্রিশ বছর যুদ্ধ করিবার পর জীবনে হার মানিল! এই হার এমন যে উহার মনে হইল, কে যেন উহাকে নগরের প্রবেশ পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। আর যে কেহ নগরে আসে সকলেই যেন উহার মুখে থুথু দিতেছে।' আবার হীরা যেদিন ফিরে এসে বল্লে যে প্রাণ দিয়েও সে দাদার ঋণ শোধ করতে পারবে না—সেদিন হরি আবার ভাবে: "কে বলে জীবন সংগ্রামে তাহার হার হইযাছে? এই গর্ব, এই পুলক, একি পরাজয়ের লক্ষণ? এই হারেই তার জয়। তাহার টুটা ফটা অস্ত্র তাহার বিজয় পতাকা।" তব সে মৃত্যুর মুখে স্ত্রীকে বলছে: 'আমার রূঢ় কথা মাফ করিস ধনিয়া, আমি এখন যাচ্ছি। গরুর জন্য লালসা মনেই রয়ে গেল।' গরু, জমি, ঘর, পরিবার, প্রতিবেশী ও গ্রাম-সমাজ—এর জন্যই কৃষকের মনে মমতা, কর্তব্য, তার থেকে যে নীতিবোধ জন্মানো সম্ভব সেই বিশ্বাসে হরি আজীবন সংগ্রাম করেছে এবং সেই সংগ্রামে জীবনপাত করেছে। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনে। কিন্তু সেই ব্যর্থতা ও মহত্বের অমর কাহিনী না জানা থাকলে সে মানুষকে আপনার জন বলে ভাবা যেত না—সাথী হিসাবে পাশে দাঁড়ানো যেত না। তাই প্রেমচন্দের উপন্যাসের গোবর ভাবে: "ছেলেবেলা হইতেই গোবর গ্রামের এই হাল দেখিয়াছে, তাহাতেই ও অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আজ চার বৎসর যাবৎ ও যে এক নতুন জগৎ দেখিয়াছে······রাজনৈতিক সভায় সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া ও নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়াছে, আর সে সকল কথা উহার মর্মে মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছে। শুনিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়াছে ভাগ্যকে মানুষ নিজে গঠন করে, নিজের বুদ্ধি ও সাহস দিয়া সব বিপদ-আপদ জয় করিতে হয়। কোন দেবতা বা গুপ্ত শক্তি সাহায্য করিতে আসে না। উহাদের মধ্যে সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে—দুঃখ এক সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে।'

গোবর কিছু আগেও ভেবেছিল যে সে শহরে মাত্র একজন মালিকের অধীনে কাজ করে। কিন্তু গ্রামের লোকের মালিকের অন্ত নেই। গোবর জানে এক মালিকের বিরুদ্ধে দল বেঁধে ধর্মঘট করার কথা। হরির জীবনে যেখানে অধিকার রক্ষার প্রশ্নে পরাজয় আসে, স্ত্রী ধনিয়া ও পুত্র গোবর সেখানে কিছুতেই পিছু হটিতে চায় না। অথচ ধনিয়াকে বাহ্য দৃষ্টিতে কিছু স্থূল মনে

হলেও এই চরিত্রটি যেমন সত্য, তেমনি সার্থক হয়েছে। হরির সহধর্মিণী, সহ-কর্মিণী, সখী ও সচিব সে।

এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের অন্য অংশের নারী চরিত্রগুলির আলোচনা করা দরকার। অনেকে বলেন যে প্রেমচন্দ স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতীয় আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই ভারতীয় আদর্শ কি তা কেউ স্পষ্ট করে বলেন নি। অতি আধুনিক সভ্যতার নামে এবং স্ত্রী স্বাধীনতার আড়ালে ফ্লার্ট করা বা অবাধ যৌন মিলনের অধিকার স্বীকার করার আদর্শ কোন দেশ স্বীকার করে নি। বুর্জোয়া সভ্যতা প্রসূত বিকৃত রুচিকে আধুনিক কালের আদর্শ বলে ধরে নিয়ে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় বা প্রাচীন আদর্শের নামে লড়াই করা ঠিক নয়। 'গোদানে' মালতী অতি আধুনিক মেয়ে এবং ডঃ মেহতা ১৯৩০-৩২ সালের সংস্কারপন্থী সমাজবাদী এবং এ্যাগনষ্টিক (ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় বাদী) দার্শনিক হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। ঐযুগে অনেক রাজনৈতিক কর্মীর জীবন দর্শনও এমনি ছিল। ডঃ মেহতা আধুনিক স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। অথচ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল। আর সেই কারণে তার চরিত্রের প্রভাবে মালতীর জীবনেও অবশেষে পরিবর্তন এল। ফলে দুজনের জীবন বিপরীত দিক থেকে একমুখী হয়ে উঠল। মালতী গরীব লোকের মধ্যে, কৃষকের মধ্যে কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিল, বেশভূষা তার অবান্তর মনে হতে লাগলো। ফ্লার্ট করার পরিবর্তে তার ডাক্তারী শিক্ষা সমাজ সেবার কাজে লেগে গেল। ফলে মেহতা ও তার মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হয়। কিন্তু মেহতা ভাবছে যে মালতী যদি কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাকে খুন করে সে আত্মহত্যা করবে। প্রেম বলতে তখনো সে আদিম মানুষের প্রেম বোঝে। মালতী গেল পিছিয়ে। এই অবস্থায় গল্পের শেষে মালতীকে নিয়ে 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্য অথবা 'শেষ প্রশ্ন'-র কমলের কথা মনে করে ছিলাম। কিন্তু প্রেমচন্দ এই দুই চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনলেন এবং ভবিষ্যতে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ঘটাবারও ব্যবস্থা করলেন। মালতী বলছে: "আমি মাসের পর মাস এই প্রশ্ন নিয়ে বিচার করে আসছি। শেষটায় ঠিক করেছি যে বন্ধুভাবে বাস করা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের চেয়ে সুখের। আমার জন্য তোমার প্রেম, আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে ··আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার উপর বিশ্বাস রাখি। এমন প্রাণীও কচিৎ দেখা যায় বটে যে পায়ে বেড়ি লাগিয়েও বিকাশের পথে চলতে পারে, আর চলেও। কিন্তু আমি নিজের আত্মাকে এতখনি শক্ত

মনে করি না। ... এখন তোমার জীবন একটা যজ্ঞ। স্বার্থের জায়গা সেখানে অল্পই ; আমি তাকে নীচের দিকে নিয়ে যাব না। সংসারে তোমার মত সাধকের প্রয়োজন আছে ..সংসারে অন্যায়ের, আতঙ্কের, ভয়ের আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হচ্ছে; অন্ধ বিশ্বাসের, কপট ধর্মের, স্বার্থের প্রকোপে ছেয়ে আছে। তোমার কানে তাব আর্ত্তস্বর এসে পৌচেছে। তুমিও যদিনা শোন তাহলে শুনবার লোক আর কে আসবে ?...আমিও চলব তোমার পিছনে পিছনে। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও সার্থক কবে তোল। তোমার মন যদি সংসারে সুখের লোভ করে তাহলে সাধ্যমত চেষ্টা করে তার থেকে সরিয়ে দেবো। ভগবান যেন আমার চেষ্টা ব্যর্থ না কবেন। যদি ব্যর্থ হই চোখের জলে তোমাকে ছেড়ে আসতে হবে—জানি না আমার পরিণাম তখন কি হবে।" মেহতা মালতীর হুকুম স্বীকার করে নিল ; "দুইজনে একাত্ম হইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। উভয়ের চক্ষে অশ্রুব ধাবা বহিতেছিল।" এই একটি উদাহরণের সামনে হবি ও ধনিয়ার জীবন কাহিনী লক্ষনীয়। ধনিয়ার অধিকার রক্ষার জন্য সদাসজাগ ভাব, ঘাটে, মাঠে, ফসলেব খেতে হরির সহকর্মিনীর রূপ, ঝুনিয়া এবং মাতাদিনের চামারনি রক্ষিতা সিলিয়া সম্পর্কে মনোভাব—এই সমস্ত মিলিয়ে দেখলে নারী চরিত্র সম্পর্কে শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রেমচন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক মিল দেখা যাবে। বরং শরৎচন্দ্রের নারীরা শুধু অধিকারের স্বীকৃতি নিযে প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু প্রেমচন্দের কৃষক রমণীর কাছে তা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। ক্ষেত-খামারে যাদের এক সঙ্গে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদের স্বাধীনতার সমস্যা সমগ্রভাবে সমাজ বিপ্লবের সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

অনুবাদক প্রিয়রঞ্জনবাবু ভূমিকায় বলেছেন যে প্রেমচন্দ বস্তুবাদী ছিলেন না, আসলে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। ঠিক একই কথা হিন্দি সমলোচক রামরতন ভাটনগরও বলেছেন। প্রেমচন্দ নিজে একটা আপোষ করে বলেছেন যে তিনি "আদর্শোন্মুখ বস্তুবাদ" মানেন। প্রথমতঃ এই ক্ষেত্রে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ কথা দুটিকে দার্শনিক সংজ্ঞা হিসেবে এঁরা কেউই ধরেছেন বলে মনে হয় না। প্রেম-চন্দ শিল্পকলাকে উপযোগিতার কষ্টিপাথরে (ইউটিলিটি) যাচাই করেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। "সাহিত্যের উদ্দেশ্য" প্রবন্ধে (প্রগতি লেখক সংঘের নিখিল ভারত অধিবেশনে প্রথম সভাপতির ভাষণ) প্রেমচন্দ যে সব কথা বলেছেন তাতে সাহিত্যে বস্তুবাদ যে তিনি মানতেন তার হাজার প্রমাণ দেওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে পরমাত্মা মানা না মানার প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। পুর্বোক্ত ভাষণে তিনি

বলেন "অন্য জিনিষ যেমন উপযোগিতার তুলাদণ্ডে মেপে থাকি—তেমনি শিল্পকে মাপতে কোন বাধা দেখি না।....শিল্প যদি ধনিকের মোসাহেবী করে এবং নিজের দুনিয়ায় নিজে বাস করে তাহলে এই দুনিয়ায় সেই শিল্পের জায়গা না দেওয়া অন্যায় হবে না। দলিত, পীড়িত, বঞ্চিতদের তা ব্যক্তিই হোক আর সমষ্টিই হোক—তাদের ওকালতি করা সাহিত্যের ধর্ম...সাহিত্যের আধার জীবন... সাহিত্য কেবল মনোরঞ্জক নয়, বিদূষকও নয়, সে পথপ্রদর্শক...সাহিত্যিক ও শিল্পী স্বভাবতই প্রগতিশীল, এই স্বভাব না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না।"

এমনি ধরনের অসংখ্য উক্তি প্রেমচন্দের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা চলে। মানব জীবনের প্রতি যে বিশ্বাস, মানুষের ভালদিকটার ওপর যে ভরসা অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হিউম্যানিস্ট করে তুলেছে প্রেমচন্দ তাঁদের পর্যায়ে পড়তে পারেন শুধু এই দেখালেই কি প্রেমচন্দ আদর্শবাদী বলে প্রমাণিত হলেন? তাঁদের যুগে বড় বড় মানুষের মনে প্রগেসিভ ইভলিউশন, হিউম্যানিজম বা 'আদর্শোন্মুখ বস্তুবাদ' কথাগুলি সহজে ব্যবহৃত হয়েছে বলা যেতে পাবে। তাই 'গোদান' এর দার্শনিক মেহতা অনায়াসে ভাবতে পারেন : আত্মবাদ বা অনাত্ম-বাদ খুব ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া উহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির এই দুয়ের মধ্যে আছে সেবামার্গ। তাহাকে কর্মমার্গও বলিতে পারা যায়—উহাই কেবল জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিতে পারে। সর্বদা কোন ঈশ্বরে উহার বিশ্বাস নাই। তবে উহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জীবের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য এসকল ঐশ্বরিক বিধান নয়। উহার মতে মানুষ অহংকারের বলে নিজেকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে যে, সে বলে—সকল কাজের প্রেরণা ঈশ্বর হইতে আসে। ...ঈশ্বরের কল্পনারও একটা মাত্র অর্থ দেখিতে পায়,—তাহা হইল মানবজীবন। একাত্মবাদ, সর্বাত্মকবাদ বা অহিংসাতত্ত্বকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়া দেখে না, ভৌতিক দৃষ্টি দিয়া দেখে। ইতিহাসে কোন কালে উহাদের আধিপত্য না থাকিলেও মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে ইহাদের স্থান অতি উচ্চে। মানব সমাজের ঐক্যে মেহতার দৃঢ় আস্থা কিন্তু সেজন্য ঈশ্বর তত্ত্ব মানিবার প্রয়োজন সে স্বী..ার করে না। প্রাণীমাত্রই এক আত্মায় অবস্থিত—মেহতার মানবপ্রেমের মূলে এমন কোনও বিশ্বাস নাই।"...

নারী স্বাধীনতার বিষয়ে প্রেমচন্দের মতামত বিচার করার জন্য যদি মেহতাকে মুখপাত্র করা স্থির হয়ে থাকে—তাহলে তাঁর দার্শনিক মতামত সম্পর্কেও মেহতার এই উক্তি কি পরিমাণে প্রেমচন্দের নিজস্ব তা নিশ্চয় আলোচ্য।

'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৬৩ সাল।

প্রগতি সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের একদিক

নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে গণনাট্য ধারাটি যে গত কয়েক বৎসরে বাংলা দেশের নাট্য জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা' বোধ করি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে এই আন্দোলন নতুন ভাবে চালিত হবে বলে ঘোষণা পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কমার্সিয়াল মিউজিয়ামে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ির সভাপতিত্বে পেশাদার ও অপেশাদার থিয়েটার ও নাটুকে দলগুলির যে সভা হয়ে গেল তার পিছনে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন গণ-নাট্য সঙ্ঘের পুরাতন ও নতুন কর্মীরা। কাজেই গণনাট্য আন্দোলনের পুরাতন অভিজ্ঞতা আজ আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী কাজ বলে আমি মনে করি। নতুবা পুরানো ভুলগুলি সংশোধন না করে নতুন পথে পা বাড়ালে ভুলের পুনরা-বৃত্তি হবে এই আমার আশংকা। ব্যক্তিনিরপেক্ষ হবার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমিও একজন ব্যক্তি এবং এতদিন পরে পুরানো ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সব রকম কাগজপত্র অভাবে সব সময়ে যে নির্ভুল হতে পারবো তাও মনে করিনা। কিন্তু দশ বছরে মোটামুটি যা ঘটেছে তাই বলব।

কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে যে সভা হয়ে গেল তা সর্বশেষ ঘটনা। এবং এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই প্রথম পেশাদার ও অপেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটার ও সৌখিন থিয়েটারগুলির সমস্যা একত্রে আলোচনা করবেন বলে স্থির করেছেন এবং পরস্পরের সহযোগিতায় উভয়ের সংকট দূর করবেন বলে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন গণনাট্য সংঘের নতুন ও পুরানো কর্মীরা এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের কয়েকজন নাম করা কর্মী (এঁরা অবশ্য ব্যক্তি-গত ভাবে এসেছেন)। এর সঙ্গে রয়েছেন পেশাদার নাট্যমঞ্চের নামকরা নাট্যকার ও পরিচালক এবং বাংলাদেশের নাট্যশালার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। এর অর্থ হ'ল : (১) বাংলাদেশের নাট্যশালার সংকটে সকলের ঐক্যবোধ ; (২) রাজ-নৈতিক মতামতের বেড়া অতিক্রম করে এক হওয়ার প্রত্যক্ষ চেষ্টা ; (৩) নতুন নাট্য আন্দোলনের ব্যাপারে গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের কাজের স্বীকৃতি এবং (৪) নব যুগের গণআন্দোলনের আদর্শকে বুঝবার জন্য

এবং বুঝতে পারলে তাকে গ্রহণ করার জন্য নাট্যমঞ্চের পুরানো নেতা ও কর্মীদের ইতস্তত হলেও প্রথম পদক্ষেপ।

এই শেষোক্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের পেশাদার নাট্যমঞ্চের উৎপত্তি ও ভূমিকা সম্পর্কে সামান্য দু একটি কথা বলা এখানে প্রয়োজন। অবশ্য পরে সে কথা অনেক বেশী বলতে হবে কিন্তু এখানে যেটুকু প্রাসঙ্গিক কেবল সেইটুকু বলছি। বাংলার নাট্যশালা শুরু থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচালনায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন করে এসেছে। অবশ্য উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ যে পরিমাণ উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক হতে পারে তার বেশী কিছু আশা করা (সে যুগ সম্পর্কে) সঙ্গত নয়। কিন্তু একথা সত্য যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাংলা নাট্য আন্দোলনকে ঐ আন্দোলনের অভ্যুত্থানের যুগে মাতিয়ে তুলেছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সঙ্গে যেমন নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের—তেমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে শিশির কুমার ভাতুড়ির যোগাযোগ সর্বজন বিদিত। অনেকেই হয়তো জানেন না যে দেশবন্ধু দাশ মৃত্যুর আগে দার্জিলিং যাওয়ার সময় করপোরেশনের মেয়র হিসাবে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জমি স্থির করেছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাতুড়ির অনুরোধ ক্রমেই তিনি একাজ করছিলেন। এইসব প্রসঙ্গ এই প্রমাণ করার জন্য বলছি যে বাংলা থিয়েটার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের যে স্বরে বাঁধাছিল তার থেকে গণনাট্য আন্দোলনের সর্বহারা জাতীয়তাবাদের স্বরে আসাটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মধ্যেই বাংলার নাট্যশালার ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে এবং এছাড়া তার মৃত্যু। কিন্তু এই পরিবর্তন আনার জন্য যে স্বচ্ছ দৃষ্টি, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ এবং আত্মত্যাগী কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন তা কি আজ আমাদের মধ্যে আছে ?

গণনাট্য আন্দোলনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি

এর উত্তর পেতে হলে বাইরের লোকের সমালোচনা শোনা বা করার আগে আমাদের আত্ম-সমালোচনা হওয়া দরকার। এবং তার আগে জানা দরকার আমরা কে ? সঙ্গে সঙ্গে জানা দরকার পেশাদার থিয়েটারের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ইতিহাস। পেশাদার থিয়েটারের সম্পর্কে বাজারে কয়েকটি ইতিহাস বিক্রি হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রগতিবাদীদের মনে যাই থাকুক না কেন—আজ পর্যন্ত প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ইতিহাস রচিত হয়নি।

আমাদের তরফ থেকে ভাসা ভাসা কথা এখানে ওখানে লেখা হয়েছে—এবং সেগুলি প্রকৃত জ্ঞান বিতরণের পরিবর্তে পেশাদার থিয়েটারের লোকগুলিকে অকারণ চটিয়েছে বা আমাদের কর্মীদের অনর্থক উদ্ধত করেছে। ঠিক একই ভাবে আমরা নিজেদের সম্পর্কে লিখেছি। সংক্ষেপে গোটা নাট্যশালার ইতিহাসকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমরা আধুনিক রাজনীতির কয়েকটি শ্লোগানকে নাটকীয় ভাষায় প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত, স্পেন ও চীনের ঐতিহ্য দেখিয়ে বীরত্ব জাহির করেছি। ফলে গণনাট্য আন্দোলনের নামে রটনা হয়ে আছে যে ওটা কমিউনিষ্টদেব সম্পত্তি, ভুঁইফোড়দের আড্ডা অথবা পেশাদার নাট্যশালার অসন্তুষ্ট লোকদেব ব্যবসাক্ষেত্র। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নবতম এবং অত্যন্ত সম্ভবনাপূর্ণ ধারা হিসেবে গণনাট্য আন্দোলন আজো সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় নি তার কয়েকখানা নাটক, গান বা নৃত্যনাট্য জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও। এর কারণ কি ?

মার্ক্সবাদী আন্দোলনে দুর্বলতা

গণনাট্য আন্দোলন নতুন গণআন্দোলনের জমিতে জন্মলাভ করেছে। এই গণ আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী মার্ক্সবাদ। নতুন যে সর্বহারা জাতীয়তা-বাদ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছে তাব বনিয়াদও মার্ক্সবাদ। এবং ঠিক সেই বনিয়াদের জন্য গণনাট্য আন্দোলন শত দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যান্য নাটুকে দলের মত অকালে মরেনি এবং এরজন্য কৃতিত্ব গণনাট্য সংঘের কর্মীদের একার নয়—কৃতিত্ব গোটা মার্ক্সবাদী আন্দোলনেব। মার্ক্সবাদী আন্দোলন গত ২৫ বছর যাবৎ নানা রকম ভুল করে আসলেও বার বার চেষ্টা করছে জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার, জনসাধারণের নিজস্ব জিনিষ হয়ে উঠবার এবং অধিকাংশ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করবার। এই মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সচেতন অংশ কয়েকটি ছোট ছোট উপদল থেকে আজ জাতীয় দলে পরিণত হয়েছে এবং এখানে সেখানে কয়েকটি শ্রমিক ও কৃষক এলাকায় কাজ করতে করতে আজ জাতির জীবনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী শ্রেণীগুলিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ২৫ বছরের ওপর এই আন্দোলন শত আঘাত নিয়েও বেড়ে উঠেছে। গণনাট্য আন্দোলনের ১০ বছরের জীবনের গ্যারান্টি এইখানে। কিন্তু কোন রকমে বেঁচে থাকা আর ভাল করে বেঁচে থাকা এবং উন্নতিবৃদ্ধি করা এক জিনিষ নয়। আর কম পক্ষে ২৫ বছর যদি মার্ক্সবাদী আন্দোলনের জীবন হয়—

তাহলে গণনাট্য আন্দোলনের বয়স ১০।১১ বছরের কেন—এ প্রশ্ন জাগাও সম্ভব।

এর উত্তর পেতে হলে ভারতে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা দরকার। রুশ বিপ্লবের পরে ভারতে মার্ক্সবাদ আস্তে আস্তে প্রসার লাভ করতে থাকে। এবং ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও তার পরের যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিফলতার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা আকর্ষণের বস্তু হয়। তবু রাজনীতিতে একাজ যত শীঘ্র হয়েছিল সাহিত্যে, কাব্যে ও নাটকে তত সহজে একাজ সম্ভব ছিল না। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শে বচিত সংস্কৃতি আন্দোলন তখনো আমাদের সংস্কৃতিঅনুরাগীদের মন আচ্ছন্ন করেছিল। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতৃত্ব আপোষকামী হলেও তাদের পূর্বেকার বুলি জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার সফল হয়নি। কাজেই তাদেব প্রভাবে যা রচিত তাব আকর্ষণও কমবার কারণ ছিল না। তবু দেরী কবে হলেও বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিধ্বনি নানাভাবে সংস্কৃতিতে এসেছে। কিন্তু সেকথা বলার আগে মার্ক্সবাদের প্রভাব বিস্তারের স্তরে স্তরে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার সংক্ষেপ বর্ণনা করা দরকার। কারণ মার্ক্সবাদ বিস্তারের পদ্ধতির দোষ ও গুণেব ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে মার্ক্সবাদ প্রভাবান্বিত গণ আন্দোলনের সূচনা ও বৃদ্ধির দুর্বলতা ও সবলতা।

অতীতে অসংগঠিত চেষ্টা

মার্ক্সবাদী আন্দোলন বহুদিন ধরে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাহিত্য, কবিতা ও গান রচয়িতাদের প্রভাবান্বিত করছিল। কাজী নজরুল, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখার উপর মুজফ্ফর আহমদ প্রভৃতি নেতাদের কতখানি প্রভাব ছিল—তার বিবরণ একদিন হয়তো প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে জানা দরকার যে এই যুগ একেবারে প্রাথমিক যুগ, কোন সংগঠিত চেষ্টার যুগ নয়। এবং তখন মার্ক্সবাদী আন্দোলন কেবল ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে নিজের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করছে মাত্র ; বুদ্ধি-জীবীদের কাছে তখনো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ভাবধারা এবং বাংলা দেশে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের ভাবধারা অত্যন্ত প্রবল। আর সব থেকে বড় কথা : এই যুগে শ্রমিক আন্দোলনের মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা অস্বীকার করতেন। ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্ট কোন কিছুর উপর তাদের আস্থা থাকার কোন

কারণই ছিল না। রাজনীতিতে যারা নবাগত এবং প্রবলভাবে সংকীর্ণ মতবাদে পুষ্ট তাদের কাছে সংস্কৃতিআন্দোলনের মূল্যই বা কি তখন। ভারতের মার্ক্সবাদী আন্দোলন সুরুতেই এই সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট ছিল। এর পর জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের যুগ এল। সাম্যবাদী আন্দোলন জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা স্বীকার করলে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার শ্লোগান দিল। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সংযোগ এখন থেকে আরম্ভ হ'ল। দেশে বিদেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল স্বভাবতই ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তার প্রতিধ্বনি এল। ফলে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপিত হ'ল।

এই প্রগতি লেখক সংঘের প্রত্যক্ষ প্রচারে এবং ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সহযোগিতায় গণনাট্য আন্দোলন বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করে। বোম্বাই বা অন্যান্য প্রদেশে কিভাবে এ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা' এখানে আমি আলোচনা করছি না। কিন্তু যে প্রদেশে যে ধরণের গণ আন্দোলন প্রবল ছিল তারই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের যোগ সাধনের ফলে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল একথা বলা যেতে পাবে। যেমন বোম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের জমিতে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়।

তাই গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম দিককার কথা বলতে গেলে প্রগতি লেখক সংঘের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে। কারণ বাংলা দেশে গণনাট্য সংঘ ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত প্রথমে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের, পবে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সাব-কমিটি হিসাবে কাজ করেছে এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের মধ্যে শিল্পকলা সম্পর্কে যে সব পরস্পর বিরোধী মতবাদ নেতৃত্ব অর্জনের চেষ্টা কবছিল গণনাট্য সংঘে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। তাই গণনাট্য সংঘের প্রকৃত আত্ম সমালোচনা করতে হলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের আত্ম সমালোচনা করা অবশ্য প্রয়োজন।

প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম দিককাব আত্ম-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। কারণ তিনিই আমাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি, যিনি প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের এবং প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তিনি ১৩৫৮ সালের বৈশাখ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রগতি লেখক আন্দোলনের

প্রারম্ভ বলে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা' আমাদের নিরাশ করেছে। কারণ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কাজ করছিল একথা পরিস্কার করে বলতে তিনি পারেন নি—হয়তো তিনি বলতে চাননি। গণআন্দোলনগুলি কিভাবে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীগ্রহণ করছিল, এবং তার জোয়ার ও ভাঁটার সঙ্গে এই নতুন সংস্কৃতি আন্দোলন প্রভাবান্বিত হচ্ছিল—এসব কথা উল্লেখ বা তার কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। বিশেষ করে ভারতের মত উপনিবেশে জাতীয় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে স্বষ্ট সংস্কৃতির আসরে মার্ক্সবাদ প্রভাবান্বিত সংস্কৃত আন্দোলন কি বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হ'ল, সেই যুগে সেই বক্তব্যের কি তাৎপর্য্য ছিল এবং তার ফলে বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করেছিল, তাও তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন নি। কেবল এক জায়গায় তিনি অভিযোগ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দের মত সর্বজনমান্য সাহিত্যিক প্রগতিলেখক সংঘে যুক্ত হওয়ার পরও 'ষ্টেট্‌সম্যান' কাগজ এই সংঘকে কমিউনিস্ট পার্টির এক ছদ্মবেশী রূপ বলে কুৎসা রটিয়েছিল।

কোন্‌দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণযোগ্য

হীরেন্‌বাবু সম্পর্কে অনেক কথা পরে বলতে হবে। তার কারণ আগেই বলেছি। কিন্তু তার আগে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং 'ষ্টেট্‌সম্যানের' দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখাবার জন্য চীনের সংস্কৃতি আন্দোলনের এক নেতার কয়েকটি উক্তি তুলে দিচ্ছি। উক্তিগুলি 'দি পিপলস্ নিউ লিটারেচর' বই থেকে উদ্ধৃত। চীনের সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা কুয়ো-মো-জো বলছেন: "আমাদের সাহিত্যিক আন্দোলন শুরু থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত আছে এবং মে ফোর্থ আন্দোলনের যুগ থেকে এই আন্দোলন (সাহিত্যিক) তার প্রতি ধাপে রাজনৈতিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।···আফিং যুদ্ধের পর প্রায় একশ বছর ধরে চীনের গণতন্ত্র প্রসূত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য শিল্পকলার আন্দোলনগুলি সবসময়ে কম বেশী রকমে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী চরিত্র পেয়েছিল ···মে ফোর্থ আন্দোলন এবং ১৯২৭ সালের মহান বিপ্লবের মধ্যবর্তি সময়ে নতুন সংস্কৃতি আন্দোলন পুরানো সামন্ত ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রাধান্যকে লোপ করে···এই সব রচনা ব্যাপক ভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী ক্রিয়াকর্মে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ,

করে। ১৯২৭ সালের মহান বিপ্লবের ব্যর্থতা ও দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম নতুন স্তরে ওঠে এবং সাহিত্যে বামপন্থী আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলন সর্বহারা বুদ্ধিজীবী ও বৈপ্লবিক পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সাহিত্যিক যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তিতে হয়··· অসংখ্য পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের আন্দোলনে টেনে এনে এরা অসংখ্য বৈপ্লবিক ক্যাডার সৃষ্টি করে এই আন্দোলন চীন বিপ্লবে বিরাট অবদান দেয়।"

নতুন আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে গিয়ে সহজেই আমার কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক মনে হয়েছে এবং পূর্বোক্ত বইটি পড়ার আগেই আমি এই ধরণের স্তর বিন্যাস করেছি এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে এই ধারণাই আমার হচ্ছে। পূর্বে আমি বলেছি যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শে রচিত সংস্কৃতি আন্দোলন ও আমাদের সংস্কৃতি-অনুরাগীদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। কাজেই ঐসব স্লোগানের প্রভাবে সৃষ্ট সংস্কৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এখনো আমাদের দেশের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রেরণা যোগায়।

এই পরিস্থিতিতে প্রগতি লেখক সংঘের স্থাপনা নতুন কোন পথের নির্দেশ দিয়েছিল তা হীরেনবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রবন্ধে আছে: (১) সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা প্রায় ইউরোপের একটা প্রদেশ বল্লেই চলে; (২) প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপনা করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল লণ্ডনে ১৯৩২-৩৪ সালের মধ্যে; (৩) সে আলোচনায় যারা যোগ দেন তাঁদের সবাই লেখক নন; (৪) ১৯৩৫ সালে লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় এবং ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি সেই সময়কার অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৯৩০-৩২ সালে পুঁজিবাদী দুনিয়া বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল। ভারতে গান্ধীজির আইনঅমান্যআন্দোলন চলছিল। পুঁজিবাদ নিজ সংকটের সমাধানের জন্য ফ্যাসিজমের রাস্তা নিয়েছিল—যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকা সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অসংকোচে স্বীকার করে বাঙালী সাহিত্যিককে তার ·স্বাধীকার

প্রতিষ্ঠার জন্যই নূতন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করছিল ; (৫) 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অব পীস' এর সঙ্গে যোগাযোগ ও বাঙালী প্রগতি লেখকদের পক্ষ থেকে তার ব্রাসেল্‌স অধিবেশনের জন্য ঘোষণা ; (৬) ১৯৩৭ সালে বাংলা দেশে বহুস্থানে শাখা স্থাপন—'প্রগতি' প্রকাশ ; (৭) ১৯৩৮ সালে কলকাতায় দ্বিতীয় সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন, ১৯৩৯-৪১ সালে কোন খবর নেই ; (৮) ১৯৪২ সালে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংঘ নূতন নাম নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

এই প্রবন্ধের শেষে হীরেনবাবু আহ্বান জানিয়েছেন যে, প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিজমের কবল থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখকরা, আজ আবার নবকলেবরে ফ্যাসিজমের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে যুদ্ধের তাণ্ডবে দুনিয়াকে জোর করে টেনে নামাবার প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন আবার কেন আমরা পূর্বের মত তুচ্ছ ভেদাভেদের কথা বড করে না দেখে হৃদয়বান ও সমাজসচেতন সকল সাহিত্যিককেই অকপট ঐক্যের জোরে সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেখব না ?

প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের মৌলিক ত্রুটি

হীরেনবাবুর শেষ মন্তব্য সম্পর্কে বর্তমানে আলোচনা না করে যে ইতিহাস আমরা পেয়েছি তার ভিত্তিতে আলোচনা স্থুরু করা যাক। ২৫ বছর আগে ১৯৩৭ সালে 'পরিচয়' 'পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় 'সংস্কৃতি সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার কিছুটা উল্লেখ করছি : "আমাদের শুধু বক্তব্য এইযে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায় পুরানো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই। সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সব থেকে বেশী আসছে ফ্যাসিষ্ট দেশ থেকে। আর তার কারণ এই যে ফ্যাসিজম ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেষ্টা। যাঁরা একথা স্বীকার করেন তাঁদের আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে বলব সহযাত্রী।" গত ২৫ বছর ধরে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্ট গঠনে ঐ এক ফ্যাসি বিরোধী বনিয়াদ ছাড়া আর কিছু হীরেনবাবুর নজরে এল না—!

বর্তমানে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত যে ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন তার সম্পর্কে একটি কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু সে কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা। ১৯৩৯-৪০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের পর জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে ভাঙন এবং বামপন্থীদের মধ্যেও তীব্র মতভেদের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রগতি লেখকদের মধ্যে 'অগ্রণী' পত্রিকা এবং তার সঙ্গে 'অনামী চক্রের' (বিনয়

ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি) কয়েকজন লেখক যে আদর্শমূলক সংগ্রাম সুরু করে দেন তার কোন উল্লেখ হীরেনবাবু করেন নি। তাছাড়া ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত আলোচনায় বাংলাদেশে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের সহযোগিতায় ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যার শেষ অফিস ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে ছিল, যেখানে বর্তমানের প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ স্থাপিত তার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না বলেই হয়তো হীরেনবাবু এসব উল্লেখ করেন নি। কিন্তু বাংলা দেশে নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের আলোচনা করতে হলে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ না করলে আলোচনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না।

হীরেনবাবু বলেছেন যে প্রগতি লেখক সংঘকে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপন করার প্রথম প্রয়াস সুরু হয়েছিল—লণ্ডনে ১৯৩২-৩৪ সালে। শুনেছি যে কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি গঠনের কথাও সেখানে হয়েছিল। কথাটা এইজন্য উল্লেখ করলাম যে হীরেনবাবুর 'সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ইউরোপের একটি প্রদেশ—' উক্তিকে একেবারে অসার বলা চলে না। আমার মতে তাঁর এই উক্তি প্রগতি লেখক সংঘ সম্পর্কে তাঁদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি দিক খুলে ধরেছে বটে কিন্তু ঐ সময়কার প্রকৃত ইতিহাস – যে ইতিহাস দেশে বিদেশে জনসাধারণ রচনা করেছিল এবং যার ফলে ভারতে বিভিন্ন প্রগতি আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছিল—তার মৌলিক প্রেরণার ইতিহাস পরিষ্কার করে বলে না।

এদেশ ইউরোপের প্রদেশ নয়—বৃটেনের উপনিবেশ

কারণ আমাদের দেশ কোন ক্ষেত্রেই ইউরোপের কোন প্রদেশ নয় – আমাদের দেশ ইংলণ্ডের উপনিবেশ। এই সহজ কথাটা বুঝতে এতদিন গেছে বলে কি রাষ্ট্রনীতি, কি সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই আমরা সকলে মিলে এত গোলমাল পাকিয়ে তুলেছি। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ ব্যবসার খাতিরে আমাদের দেশে রেলগাড়ী চালিয়েছিল, কেরানী গড়তে গিয়ে তাদের দর্শন ও সাহিত্য পড়িয়ে নব জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর জন্মাতে পরোক্ষভাবে ইতিহাসের হাতিয়ার হয়েছিল – অতএব এদেশে যা কিছু ভাল ঘটে সব পরোক্ষ ভাবে তাদের জন্য বা তাদের দেশ থেকে ঘটে। অথবা ইউরোপের বুর্জোয়া আজ আমেরিকার পায়ে বাঁধা—তারা সকলে মিলে দেশে দেশে গণ আন্দোলন ধ্বংস করে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি আক্রমণ করবে এবং সেই জোটে আছে আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও জমিদার, মায় ধনী কৃষক পর্য্যন্ত; অতএব

হাতের কাছে যাকে পাও তাকে মার—এই একই নীতির দ্বিমুখী অথচ নিতান্ত সরল ব্যাখ্যা আসে এই ধারণা থেকে যে ভারত ইউরোপের প্রদেশ—উপনিবেশ নয়—বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণী একাকার !

১৯২৯ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংকট সুরু হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের নিজস্ব সংকট যেমন বেড়ে গিয়েছিল—নিজেরা যেমন বাজারের জন্য কাড়াকাড়িতে জন্ম দিল ফ্যাসিজমকে তেমনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে জনগণের শিবির। ফ্যাসিজম যেমন পুঁজিবাদের প্রকাশ্য আশ্রয়স্থান হ'ল তেমনি জনগণের শিবিরে তার পঞ্চমবাহিনী হ'ল—ট্রটস্কিজম ও এম, এন রায়ের ডি-কলোনাইজেশন মতবাদ। ভারতে মার্ক্সবাদীরা যাতে এই সবের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে তার জন্য বৃটেনে রজনীপাম দত্ত ও বেন ব্রাড্‌লে সচেষ্ট ছিলেন। তা'ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, জার্মানী ও চীন দেশের মার্ক্সবাদী নেতারা ভারতের মার্ক্সবাদীদের কাছে জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনেব জন্য আবেদন করেছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ব্যাপক ভাবে যে আছে তার উল্লেখ করে নূতন আন্দোলনের গণভিত্তিব বিরাট সম্ভবনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে তারা ফ্যাসিজমের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এবং সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন করছিলেন—তাতে পণ্ডিত নেহেরুর মত জাতীয়তাবাদী নেতারা মার্ক্সবাদের অনেকগুলি বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'ন এবং সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে বলতে থাকেন। এই সময় আমাদের দেশে মাদ্রাজ ও লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও গান্ধী আরুইন চুক্তি হয়, কংগ্রেস আন্দোলন বিশ্বাসঘাতকতার পথে চালিত হয় এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন অসার্থক বলে প্রমাণিত হয়। বাংলায় ও বাংলার বাইরের বন্দীনিবাসে এবং জেলে ও জেলের বাইরে অবস্থিত বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবী ক্যাডারদের মনে মার্ক্সবাদের আবেদন সাড়া জাগাতে থাকে। ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্য, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি গঠন, নিখিল ভারত কৃষক সভা গঠন প্রভৃতি অনেক গণসংগঠনের প্রস্তাব সর্ব্বত্র আলোচিত হতে থাকে। লণ্ডনে বসে প্রগতি লেখক মহলে সর্বভারতীয় ভিত্তি স্থাপনার কথা এই ভাবে আসা স্বাভাবিক। এর জন্য আমরা প্রায় ইউরোপের একটা প্রদেশে বাস করি এ-তনিতা করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কি ?

কিন্তু সে-সময় যাঁরা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন—তাঁদের কাছে এই উক্তি বোধ হয় ভনিতা ছিল না—প্রায় সত্যই ছিল। কারণ হীরেনবাবুর আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। এবং একথা যদি বলি যে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশের লোক হয়েও মনে মনে ইউরোপের বাসিন্দা ছিলেন—তাহলে হয়তো কথাটা তাঁদের পছন্দ না হতে পারে—কিন্তু সত্যের অপলাপ হবে না। ডঃ আশরফ বা সজ্জাদ জহীরের কোনো লেখা এই প্রসঙ্গে আমি পড়িনি—কাজেই তাঁদের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না। ভারতের রাজনীতিতে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে আজ তাঁরা 'সংস্কৃতির' অপেক্ষাকৃত পেলব সংসর্গ থেকে অনেক দূরে, অনেক কঠোর কাজে চলে গেছেন। মুল্‌করাজ আনন্দ তাঁর উপন্যাস ছাড়া সাধারণ ভাবে সংস্কৃতির সমস্যা সম্পর্কে ভাসা-ভাসা অনেক ভালো কথা লিখেও থিয়েটার প্রসঙ্গে যে বই লিখেছেন তাতে আমাদের দেশের থিয়েটাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না। কাজেই ১৯৩২-৩৪ সালে এঁদের অনেকের যে ভারতের সাহিত্যের সংকট সম্পর্কে দৃষ্টির খুব স্বচ্ছতা ছিল না, বরং ইউরোপের সাহিত্যের সংকট থেকে সোজাসুজি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং নামকাবাস্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক হওয়ার রাস্তাকে প্রগতি লেখক সংঘের পাকা রাস্তা বলার ঝোঁক বেশ ছিল—এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে। আর এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। তা' হল এই যে, সে-সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলনে ভাঁটা চলছে। কংগ্রেস ১৯৩০ সালের আন্দোলনে পরাজিত, বামপন্থী জাতীয়তাবাদ দিশাহারা এবং সাম্রাজ্যবাদ ব্যাপক ভাবে দমন নীতি চালাচ্ছে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর বেশী জোর দিলে অনেক সাহিত্যিক হয়তো সুরুতেই বেঁকে বসতেন।

প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার

১৯৩৫ সালে যে ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হয় আজ তা' সামান্য আলোচনা করলেই একথা বোঝা যাবে—আরো ভাল বোঝা যাবে যদি তার সঙ্গে পড়া যায় 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখা হীরেনবাবুর প্রবন্ধ 'সংস্কৃতি সংকট।' এই ইশ্‌তেহারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে এটা দরকারী হতে পারে ভেবেই আমি উদ্ধৃত করছি।

"কিছুকাল হতে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। প্রগতির পথ যারা এতদিন আটকে বসেছিল তারা যদিও আজ মৃতপ্রায় তবু

তাদের জীবনের মেয়াদ বাড়াবার মরিয়া চেষ্টা চলছে। সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গি অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা এই আমাদেব লেখকদের কর্ত্তব্য। তাঁদের উচিত সাহিত্য বিচার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা যা পারিবারিক, যৌন, ধর্মচিন্তাগত, যুদ্ধ বিগ্রহাদি সমস্ত সাহিত্য প্রসঙ্গ থেকে প্রগতি বিমুখ ও পশ্চাদগামী মনোবৃত্তিকে উন্মুলিত করবে এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌনস্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যে পরিবর্তনবিদ্বেষী শ্রেণীর হাতে বহুকাল যাবৎ সাহিত্য ও অন্যান্য কলার অবনতি ঘটেছে তাদের কবল হতে সাহিত্যকে উদ্ধার করা আমাদের সংঘের উদ্দেশ্য। আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সংগে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ। আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের কল্পনা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

"ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকার দাবী করি। আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না। ভারতীয় ও বিদেশী উৎস হতে ভাষান্তর সংগ্রহ ও মৌলিক সাহিত্যকৃতি দিয়ে যা কিছু আমাদের দেশকে নবজীবনের পথে এগিয়ে দেবে তার প্রোৎসাহন আমাদের কাজ হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতাকে নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মন্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ ব্যবস্থা ও রীতি নীতিকে যুক্তিসম্মত ভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের

কর্মীষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

এই ঘোষণার পর সংঘের লক্ষ্যের বিবরণ দিয়ে শাখা বিস্তার, প্রগতিশীল সাহিত্যসৃষ্টি ও অনুরূপ বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, প্রগতিশীল লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মতবাদ প্রকাশের অবাধ অধিকার সম্পর্কে আন্দোলন করার কথাও বলা আছে।

১৬ বছর আগে ভারতের যে-সব বুদ্ধিজীবী এই ঘোষণার খসড়া তৈরী করেছিলেন, তারা নিশ্চয় প্রগতিশীল কাজ করেছিলেন এবং আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আজ আন্দোলনের এই সংকটময় দিনে যখন অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষালাভ করে এগিয়ে যেতে হবে তখন সেই ঘোষণার কতকাংশকে বাহবা দিয়ে এ'র অস্পষ্টতাকে এড়িয়ে গেলে দৃষ্টিভঙ্গীকে সেই আলোকে স্বচ্ছ করে আশু কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পাওয়া দুষ্কর হবে।

আমি জানি এই ধরণের ইশ্‌তেহারের স্বল্প পরিসরে অনেক কথা বলা চলে না। তবু এই ইশ্‌তেহার পড়ে আজ যে প্রশ্ন জাগে তার কোন সদুত্তর প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম যুগের নেতারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এত কালের মধ্যে কদাচ দিয়েছেন। কাজটি অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য তা মানি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যত শীঘ্র এবং যত বেশী গণতান্ত্রিক শ্লোগান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মঞ্চে গ্রহণ করাতে পেরেছিল সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তত শীঘ্র তা সম্ভব হয়নি। করাচী কংগ্রেস থেকে লক্ষ্ণৌ এবং ফৌজপুর কংগ্রেস পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থী, আপোষকামী ও বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের কবলে কংগ্রেস—সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরাজয় ও দমন নীতির মাঝখানেও যেভাবে শ্রমিক, কৃষক, ফ্যাসিজম ও জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সে সবগুলির প্রভাবের সামান্যই আভাস মেলে। এই যুগের বিষয়ে লেখা রজনীপাম দত্তের 'ইণ্ডিয়া-টুডে' এবং জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস (পট্টাভি সীতারামাইয়া) পড়লে আমার কথার যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। এর কারণ রাজনৈতিক নেতারা (তা' মার্ক্সবাদী হলেও) রাজনীতিটা এতকাল যে পরিমাণে বুঝতে পেরেছেন—জাতীয় আন্দোলনে সংস্কৃতির ভূমিকা বুঝবার প্রয়োজন তত বোধ করেন নি। তা' ছাড়া সংস্কৃতি তো শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ব্যাপার। আর শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তো পণ্ডিত কেউ কারো থেকে কম নন—কাজেই কে কাকে কি বলবে! তাই ভারতের বিরাট সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের

মশাল জালিয়ে যে নতুন রাস্তা গড়ার পরিশ্রমসাধ্য দায়িত্ব ছিল তা আর পালন করা হ'ল না। ইশ্‌তেহার সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন আমার মনে জাগছে সেগুলি উল্লেখ করলে পাঠক আমার অভিযোগের কারণ বুঝতে পারবেন।

ইশ্‌তেহারের মধ্যে অস্পষ্টতা

প্রথম প্রশ্ন : কিছুকাল হতে সমাজ জীবনের যে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে তার চরিত্র কি? মার্ক্স বর্ণিত ভারতে ইংরেজ শাসন জনিত পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস ও সর্বহারা শ্রেণীর জন্মগ্রহণ ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের সূচনা, না অন্য কিছু যা' জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে সংস্কৃতিবানদের এক করতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রগতির পথ এতদিন কারা আটকিয়ে বসেছিল এবং তারা যদি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র হয়—তাহলে তারা ১৯৩৫ সালে মৃত প্রায় হ'ল কি করে?

তৃতীয় প্রশ্ন : এরপর 'সনাতনী সংস্কৃতি' থেকে 'রিক্ত ও বিকার গ্রস্ত' পর্য্যন্ত যেন ইউরোপীয় সাহিত্যের মার্ক্সবাদী সমালোচনার ফরমূলা মনে হয় না কি?

চতুর্থ প্রশ্ন : তাঁদের উচিত সাহিত্য বিচার ক্ষেত্র থেকে এমনই দৃষ্টি ভঙ্গীর ....প্রগতি বিমুখ ও পশ্চাদগামী মনোবৃত্তিকে উন্মুখিত করবে—। কিন্তু কোন কষ্টি পাথরে প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাদগামিতা বিচার করা হবে? তবু এই প্যারায় কয়েকটি স্পষ্ট কথা আছে যেমন—সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচার প্রভৃতিকে প্রগতিবিরোধী বলা হয়েছে।

পঞ্চম প্রশ্ন : ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে কোন পরিবর্ত্তন বিদ্বেষী শ্রেণীর হাতে সাহিত্য ও অন্যান্য কলা ছিল যার কবল থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি লেখক সংঘের?

ষষ্ঠ প্রশ্ন : 'ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা' কি ছিল লেখক সংঘের? জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে নিশ্চয় সাম্যবাদের পরিকল্পনা ছিল না।

সপ্তম প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রগতিদ্রোহ কোন কোন রূপে মাথা তুলছিল? এই প্রশ্নগুলি তুলেও বলছি এই ইশ্‌তেহারের শেষাংশ যথা "আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরান্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে—ইত্যাদি সেদিন অসংখ্য অনভিজ্ঞ অর্ধ-শিক্ষিত ও দেশভক্ত যুব সংস্কৃতি কর্মীদের মনে প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং প্রগতি লেখক সংঘের পাশে অসংখ্য তরুণ ছাত্র ও যুবকদের সমবেত করেছিল। যদিও প্রায় এই ধরণের কথা এদেশের বহু

মনিষীদের অনেক লেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং প্রগতিশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে অনেক কথাই নতুন নয় তবু সাহিত্যক্ষেত্রে এমন ভাবে ও এমন সময়ে কথাগুলি বলা হয়েছিল—তার স্পষ্টতার দিকটি সব দোষ ত্রুটি বাদ দিয়েও সেদিন আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দৃষ্টিভঙ্গির অস্পষ্টতায় নিজেদের মধ্যে মৃদু বিরোধ

আজ যে প্রশ্নগুলি আমি তুলেছি তার অনেকগুলি এমনি ভাবে না তুললেও ভিন্ন উপায়ে এক এক সময় কয়েকজন তুলেছেন। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্ব্ব ভারতীয় সম্মেলনের বক্তৃতাবলীর রিপোর্ট Towords Progressive criticism আমার কাছে না থাকায় নিখিল ভারতের ভিত্তিতে আমার উক্তি প্রমাণ করতে পারছি না। (বর্তমানে আমার সম্পাদিত 'মার্ক্সিষ্ট-কালচারাল মুভ্‌মেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ক্রনিক্‌ল্‌স এ্যাণ্ড ডকুমেণ্টস' বইয়ে এই রিপোর্ট ছাপা হয়েছে এবং আমার উক্তি অর্থাৎ সুরু থেকেই যে বিভ্রান্তি সারা ভারতের ক্ষেত্রে ছিল—তা প্রমানিত হয়েছে)। কিন্তু 'পরিচয়' পত্রিকা ও 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থ যা হীরেনবাবুরা এ সময় প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে যতটা সম্ভব ঐ সময়কার প্রগতিশীল সংস্কৃতি শিবিরের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব প্রকাশের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। পূর্ব্বেই বলেছি যে ইশ্‌তেহার পড়ার সময় ১৩৪৩ সালে (১৯৩৬ সাল) পরিচয়' এ প্রকাশিত হীরেনবাবুর 'সংস্কৃতি-সংকট' পড়লে ভাল হবে। আমি এখন পাঠকদের সেই প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ পড়াব।

এ সংস্কৃতি-সংকট কোন দেশের ?

এই প্রবন্ধ হীরেনবাবু এলিয়টের কবিতা দিয়ে শুরু করেছেন :

"Please will you
Give us light ?
Light
Light."

(Triumphal March)

এর পর হীরেনবাবু আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে এলিয়ট দেখতে পেয়েছেন—রাইফেল, কারবাইন, মর্টার প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীতে কত সময় যাচ্ছে। এলিয়ট হেন প্রতিভার এই দুর্গতি দেখে হীরেনবাবু মন্তব্য করছেন :

"আমাদের দেশে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন যে বর্ত্তমানে সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হয়ে আসছে বলে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য সর্বত্রই জরার চিহ্ন প্রকট হয়েছে। এলিয়টের মত যথার্থ চক্ষুষ্মান তাই বর্ত্তমানকে যথাসাধ্য বর্জন করে প্রাচীনের মহিমা পুনঃ প্রচার করছেন। নিজেকেই জ্ঞাতসারে মায়ামুগ্ধ করেছেন, যুগধর্ম প্রত্যাখ্যান করে আশ্রয় নিয়েছেন এক বাত্যাহত শৈলের ছায়ায়, কাথলিক চার্চকে বরণ করে।"

"গত পাঁচশো বছর যে সংস্কৃতি পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে সংযোজন করতে আমরা ব্যস্ত সেই সংস্কৃতি এখন ব্যধিগ্রস্ত।" হীরেনবাবু বলছেন যে সমসাময়িক ইতিহাস অবজ্ঞা করে কৃষ্টি চর্চ্চা করলে তা হবে প্রাণহীন। ইউরোপে বিজ্ঞানকে ধনতন্ত্র ব্যর্থ করছে—ফলে বিচারগ্রাহ্য জ্ঞানের স্থানে mysticism (রহস্যবাদ) intuition (অনুভূতিবাদ) ও ocultism (গুপ্ত সাধন পদ্ধতি) প্রবল হচ্ছে। ফ্যাসিষ্ট দেশে এই অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়েছে। সংস্কৃতিদ্রোহ আজ ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার পুরোহিতরা কেন এ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন? উত্তরে হীরেনবাবু নিজেই বলছেন, "ধনতন্ত্রবাদের বিপদ যেখানে বেশি, যেখানে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য ফ্যাসিজম উদ্যত হয়েছে, সেখানেই ভবিষ্যৎকে নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে অপরাধ, সেইখানেই সংস্কৃতি আজ বিপন্ন।"

"একথা যাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজে ভাবছেন যে ঝড় কেটে যাবে তাঁদের স্পর্শ না করে। যখন ইতিহাস তাঁদের পরীক্ষা করবে তখন কোন পক্ষে তাঁদের দেখা মিলবে, সে সম্বন্ধে জোর করে বলা যায় না। ঝড় আসছে জেনেও তাঁরা তৈরী হচ্ছেন না। কারণ আসলে তাঁরা চান না যে ঝড় আসে, যে আমাদের সমাজের রূপ বদলায়।" (ঝড় বলতে প্রথমে ভেবেছিলাম ফ্যাসিজমের বিপদ—তারপর দেখা গেল যে সমাজের রূপ বদলানোর ঝড়। কিন্তু এই প্রবন্ধে এই পর্য্যন্ত কোথাও এই রূপ বদলানোর কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

এর পর সাহিত্য ক্ষেত্রে সংস্কৃতি-সংকট বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন: "সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংকট বোঝাতে গেলে বলা হয় যে মোটের উপর আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে বুর্জোয়া ও ডেকাডেণ্ট। এই দুটো কথার প্রতি অনেকের বিরাগ, আর স্বীকার করতে হবে এগুলো একটু বেশি যত্রতত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন লেখককে বুর্জোয়া বা ডেকাডেন্ট বলা মানে তাদের উড়িয়ে দেওয়া নয় ···এই ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকে সভ্যতার এক যুগাবর্ত্তের সময়···আবার জোর করে বলা দরকার যে যখন প্রাউষ্ট বা জয়েসকে ডেকাডেন্ট বলা হয়—তখন একেবারেই তাঁদের অসামান্য প্রতিভা অস্বীকার করার চেষ্টা বা ইচ্ছা থাকে না। এমনকি ডেকাডেন্সের কতগুলি বিশেষ গুণ থাকে যা সুস্থ লেখায় নেই। চরিত্র বা ঘটনা বিশ্লেষণে ডেকাডেন্ট লেখকদের শক্তি ও অনুভূতি দেখলে মনে হয় তাঁরা বুঝি এক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিকারী····তবে ভুললে চলবে না যে তাঁরা যে যুগকে সাহিত্যরূপ দিচ্ছেন সে যুগ সমাপ্ত প্রায়। শুধু সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার মত তাঁদের সৃষ্টি এখনও আমাদের মুগ্ধ করছে।"

"প্রাউষ্ট-এর মত বিরাট শিল্পীর লেখায় সমসাময়িক সভ্যতার জীর্ণপ্রায় মূর্তি প্রতিভাত হয়েছে। ফরাসী সমাজ সন্দর্শনে বেরিয়ে তিনি যাদের জীবন ব্যবচ্ছেদ করে দেখলেন তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ, তাদের মধ্যেই সংস্কৃতির ছাপ আমরা আশা করতে পারি। (আণ্ডার লাইন আমার) পৃথিবীর যে জাতি সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ, সেই জাতির সর্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তিনি দেখলেন পূতি, দেখলেন জরা।···প্যারিসের উপর যখন গোলা পডছে, তখন যেন শহরের সঙ্গে সমাজও ধ্বংসোন্মুখ। প্রাউষ্টের লেখা দেখে মনে হয় যে তার অপরূপ দীপ্তি হচ্ছে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণের মতই সুন্দর ও করুণ। (কোনটা করুণ? বুর্জোয়া সমাজ ধ্বংসের অপরূপ দীপ্তি? না প্রাউষ্টের লেখার দীপ্তি? সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা বা অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণের বাস্তবতার উপমা শরৎচন্দ্রের 'কমল' দিয়েছিল আশুবভি এবং নিলীমার প্রেম উপলক্ষ্য করে 'শেষ প্রশ্নে'। অবশ্য 'কমল'-এর দর্শনকে খুব চটকদার করে বলতে গেলে হয়তো দার্শনিক নৈরাজ্য-বাদের পর্য্যায়ভুক্তকরা যায়—কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী হীরেনবাবু এ কী বলছেন? ১৯৩৯-৪০ সালে 'অগ্রণী' কাগজে যখন কবি সরোজ দত্ত কবি সমর সেনের 'ইন ডিফেন্স অব ডেকাডেন্স' প্রবন্ধের কড়া জবাব দিচ্ছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় জানতেন না যে তাঁদের অতি শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রায় চার বছর আগেই সমর বাবুদের রাস্তা সাফ করে রেখেছেন—সু. প্র)।

এরপর হীরেনবাবু ডি· এইচ· লরেন্স, হাক্সলি, ইয়েট্স, ওয়েন প্রভৃতি প্রসঙ্গে এদের সাহিত্যে নৈরাশ্য, বিষাদ, অবসাদ, অবিশ্বাস ও জীবনযুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন-পরতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন 'কিন্তু যখনই কোন যুগের অগ্রগতির ও

উৎকর্ষের সব পথ আপাত দৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয়, তখনই সে বোঝা অসহ্য হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসহনীয় বেদনার অবসাদ দেখা দিয়েছে।

"অবশ্য একথা কেউ বলছেন না যে সমাজতত্ত্ব জ্ঞান সরেশ না হলে কবির কবিতা নিরেশ হবে; বুদ্ধিমান মার্ক্সপন্থী না হলে যে বড় কবি কেউ হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে বর্তমান যুগে, ধনতন্ত্রবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায় পুরানো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই। সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সবচেয়ে বেশী আসছে ফ্যাসিষ্ট দেশ থেকে। আর তার কারণ এই যে ফ্যাসিজম ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেষ্টা। যাঁরা একথা স্বীকার করবেন তাঁদের আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে বলব সহযাত্রী ··শিল্পী·সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সমাজ বিপ্লবকামীদের সহযাত্রী তাঁরা বিপ্লবের যুগে তাঁদের আর্টকে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন অস্ত্ররূপে; "above the battle" থাকার প্রবৃত্তি বা দুর্বুদ্ধি তাদের হবে না—তাই বিপ্লব যখন আসন্ন বা আগত তখন আর্টের চেহারা বদলাবে, সে চেহারা মনোরম নয়।"

হীরেন বাবুর প্রবন্ধের মোটামুটি সার এবং প্রধান অংশগুলি তুলে দিলাম। পাঠকদের আমি জানাতে পারি যে, এই প্রবন্ধের কোথাও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সংকটের নামই নেই। এই প্রবন্ধ ইউরোপের যে কোন বামপন্থী কাগজে একটা সাহেবের নামে বেরুলে কোনো অসুবিধা হত না। এর থেকে প্রমাণ হয় যে ইউরোপের সংস্কৃতি সংকট বলতে তিনি যা বুঝেছিলেন ভারতের ক্ষেত্রে তার একটা যান্ত্রিক প্রয়োগ ছাড়া সে যুগে তিনি আর কিছু ভাবতে পারেননি। ভারতের লোক অন্নবস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, সেসময় এদেশের লেখকদের বই এক সংস্করণে পাঁচশোর বেশি বিক্রি হয় না। বিরাট কৃষক সম্প্রদায় শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ এবং সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন—ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত, এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর গোটা অংশ তখনো পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেনি, ভারতে সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক প্রসারের অবস্থাও নেই। কাজেই ইউরোপের পুরানো ধনতন্ত্রের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার রূপের সঙ্গে ভারতের অবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। অন্ততঃ কতখানি মিল আর কতখানি অমিল তা বুঝবার চেষ্টা উক্ত প্রবন্ধে নেই।

দ্বিতীয়তঃ এলিয়ট, প্রাউষ্ট, হাক্সলি প্রভৃতি ডেকাডেণ্ট সাহিত্যিকদের প্রতিভা

সম্পর্কে মার্ক্সবাদী হীরেনবাবুর এত প্রশংসার হেতু কি? সাধারণ পাঠক তো জানেই তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লেখক কিন্তু তারা যা জানে না এবং মার্ক্সবাদী সমালোচক হিসাবে হীরেনবাবুর যা বলা উচিত ছিল, তা হচ্ছে উক্ত লেখকগুলির সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় হচ্ছে তারা যে শ্রেণীকে বড় প্রিয় বলে মনে করে সেই বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংসের করুণ বর্ণনায়। তাঁদের দক্ষতা এবং সাফল্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই সাহায্য করবে। এইসব লেখক একটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার প্রতি করুণা সঞ্চার করে এবং নতুনের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়ার সাহায্য করছে—একথা হীরেনবাবু বলেন নি। আজ একথা মনে করার কারণ আছে যে তিনি এদেশের এলিয়ট-প্রুস্ত-হাক্সলি ভক্তদের সংযুক্ত ফ্রণ্টে আনার জন্য এইসব কথা বলেছেন। (ঐসব ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিকারীরা কেউই ইউরোপের পপুলার ফ্রণ্টে ছিলেন না) সেই সম্পর্কে হীরেনবাবু যে শর্ত দিয়েছেন যেমন: সমাজ বিপ্লবীদের সহযাত্রী শিল্পীসাহিত্যিকরা বিপ্লবের যুগে তাঁদের আর্টকে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন অস্ত্ররূপে, তখন আর্টের চেহারা বদলাবে, সে চেহারা মনোরম নয়, ইত্যাদি কথা কোনো শিল্পী সাহিত্যিককে তখনকার দিনে তার আশু কর্তব্যকে ভাল করে বুঝতে সাহায্য করে না বা সে দায়িত্ব পালন যে কঠোর তার ধারণাও জন্মাতে সাহায্য করেনি। হীরেনবাবু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ফাঁকা আওয়াজ পাওয়ার আশায় এদেশের ডেকাডেণ্টদের বৃথাই বাহবা দিলেন।

Most of the progressive writers and artists in the Kuomintang Controlled Areas are petty-bourgeois intellectuals, who were originally isolated from the masses· Their petty-bourgeois outlook drew them towards the literary traditions of the Western bourgeoisie, and prevented them from having a comprehensive and penetrating view of the historical reality· During the past dicade, a great part of the subject matter in literary writing centrered round the life of petty-bourgeois intellectuals, whose shortcomings were often defended, and given excuse when adversely criticised."—Mao Tun, p72· The People's New literature·

পূর্বেই বলেছি যে হীরেনবাবু তাঁর বর্তমান বছরের প্রবন্ধে বলেছেন (পরিচয়,

বৈশাখ, ১৩৫৮ সাল) সেই সময় "মার্জিত রুচি নিয়ে বিবিধ তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে তখন সত্ত প্রচারিত 'পরিচয়' পত্রিকা সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অসংকোচে স্বীকার করে বাঙালী সাহিত্যিককে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নতুন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করল। প্রগতি লেখক আন্দোলনের বনিয়াদ এদেশের বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করে দিল।"

প্রগতি লেখক আন্দোলনের বনিয়াদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে "পরিচয়" যে অন্যতম সে বিষয়ে আমিও হীরেনবাবুর সাথে একমত। কিন্তু "পরিচয়" সেই যুগে বাঙালী সাহিত্যিককে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নতুন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করল—এইভাবে 'পরিচয়ে' চরিত্র নিরূপণ করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। এটাও একটা ঢালাই বিবৃতি যা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করতে সাহায্য করে না বা 'পরিচয়ে' প্রকৃত ভূমিকা এবং তার সবলতা ও দুর্বলতা জানতে সাহায্য করে না। 'পরিচয়ে'র সংগে প্রথম থেকে যারা জড়িত ছিলেন—যেমন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—তাঁরা যদি 'পরিচয়ে' শুরু থেকে সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লেখেন তাহলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের কর্মীদের বিশেষ উপকার হবে। তাহলে আমরা জানতে পারবো সেই যুগে যে কাগজ প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষে ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রচার করছিল—শোনা যায় যে তার কর্তৃপক্ষের একাংশ সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে হীরেন-বাবুদের মত নিষ্ঠাবান ফ্যাসিষ্ট-বিরোধীদের সঙ্গে প্রায় সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ করার উপক্রম করছিলেন। এঁরা অবশ্য ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা প্রচার করতে রাজী হওয়ার সময় এমন দাবীও করেছিলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাঁরা টোটেলে-টারিয়ান বললে আপত্তি করা চলবে না। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর এই অংশ সাহিত্য সম্পর্কে প্রগতিশীল, উচ্চ শিক্ষিত এবং তীক্ষ্ণধী হওয়ার দাবী করেও আসলে সে যুগে এলিয়ট-ভালেরি বুঝতে এবং তারিফ করতে পারাটাকে তাঁদের দলে নেবার পক্ষে বিশেষ যোগ্যতা বলে মনে করতেন।

প্রগতি সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ বিরোধের উৎস

'পরিচয়ে' যে দুটি ধারা আজ প্রগতি লেখক আন্দোলনের মধ্যে এসেছে তা' ভাল করে বুঝবার তাগিদে এসব কথা জানার দরকার। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে, 'সবুজ পত্র,' 'কালি কলম,' 'লাঙল', 'সংহতি,'

'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি প্রত্যেক সাহিত্যিক যুগের বিশেষ মার্ক্সবাদী আলোচনা চালানো আজ প্রগতি লেখক আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করতে পারলে তবেই প্রগতি লেখক আন্দোলনের আদর্শগত বনিয়াদ পাকা করা যাবে এবং সত্য সত্যই তাকে বাংলা সাহিত্যের মাটিতে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। ইতিমধ্যে 'পরিচয়' নিয়ে কিছু আলোচনা আগেই করা দরকার। কেননা শুরুতে প্রগতি লেখক আন্দোলনের উপর 'পরিচয়ে'র প্রভাব যত প্রত্যক্ষ তেমন আর কোন কাগজের ছিল না এবং 'পরিচয়ে'র মধ্যে যে আদর্শের বিরোধ, 'পরিচয়' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে দুষ্ট ক্ষতের মত দেখা দেয়, আজ তার বিষের ক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে গারোদী ও আরাগঁর সাহিত্যগত মতভেদ অবলম্বনে এক পক্ষে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীরাধারমণ মিত্র এবং অপর পক্ষে অধ্যাপক বিষ্ণু দে ও জ্যোতির্ময় রায় প্রভৃতির যে সাহিত্যের আদর্শগত বিতর্ক হয়েছিল—এ তারই ক্রমবিকাশ। কাজেই 'পরিচয়ে'র ইতিহাস আলোচনা হওয়া দরকার এবং তা যোগ্য ব্যক্তিরা করবেন—এই আশা নিয়ে আমি 'পরিচয়ে'র সম্পর্কে আরো দু'একটা কথা আমার পাঠকদের বলতে চাই।

'পরিচয়ে'র পরিচয়

'কল্লোল,' 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটা সুস্থ প্রতিক্রিয়ায় 'পরিচয়ে'র জন্ম। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগে' নিজেদেরকে ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী বলেছেন—কিন্তু রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ কথাটার সঙ্গে 'কল্লোল যুগের' নাম করাটাই আমি অন্যায় বলে মনে করি। অবশ্য ঐ যুগ ছিল রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদেরই যুগ। কিন্তু তার জন্য নজরুলকে টেনে এনে সাহিত্যে ওঁদের বোহেমিয়ান কর্মকে তৎকালীন রাজনীতির সহযাত্রী বলার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখি না। যাই হোক 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহ এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে, কয়লা খনিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে 'কল্লোলের' অভিযান 'পরিচয়ে'র উদ্যোক্তা-দের কাছে খণ্ড, বিক্ষিপ্ত, বিকৃত আদর্শপুষ্ট ও দুর্বল বিশ্ববোধ থেকে উদ্ভূত বলে মনে হত। এঁরা যে বিশ্ববোধ (পশ্চিমী সাহিত্যের জের) আনতে চেয়েছিলেন তাও ঠিক তৎকালীন ইউরোপের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা ছিল না। মানুষের আত্মার সংকট বলতে 'কল্লোল' যা বুঝেছিল—তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে 'পরিচয়ে'র উদ্যোক্তাদের মনে হত। তা ছাড়া 'কল্লোলের' সংগে 'শনিবারের চিঠি'র কোন

মৌলিক পার্থক্য না দেখে 'পরিচয়' গোষ্ঠী একটা পশ্চিমী ধরণের রিভিউ পত্রিকা বার করার প্রয়োজন বোধ করেন। 'পরিচয়' কাগজ এইভাবে Introducing the latest ideas (অবশ্যই তার অধিকাংশ পশ্চিমের হবে—বুদ্ধ বা যাজ্ঞবল্কের উপর প্রবন্ধ থাকলেও) or introducing the western critical outlook হয়ে দাঁড়ালো। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ বাগচী, অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীসুশোভন সরকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিষ্ণু দে, বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, আই সি. এস প্রভৃতি যাঁরা 'পরিচয়ে'র প্রথম দিককার উদ্যোক্তা, তাঁরা সকলেই পশ্চিমের নানা বিষয় সম্পর্কে যে মোটামুটি ওয়াকিবহাল লোক ছিলেন তা বলা যেতে পারে। 'পরিচয়ে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, অধ্যাপক হামফ্রি হাউস, ষ্টেট্সম্যান কাগজের এমার্স'ন, শ্রীরাধারমণ মিত্র, শ্রীজ্যোতির্ময় রায়, জনাব আবূ সৈয়দ আয়ুব প্রভৃতি ছিলেন। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর গঠন ও আদর্শ দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে 'পরিচয়' কস্মোপলিটান, বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং 'পরিচয়ে'র খ্যাতি তার সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য অর্থাৎ গল্প কবিতার জন্য ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনার জন্য—সেগুলির পিছনে অধ্যয়ন ও চিন্তাশীলতার জন্য। এইজন্য 'পরিচয়'কে উঁচ্ কপালে (high brow) বলা নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত হবে। পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সকলেই একমত ছিলেন, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই, এঁদের মধ্যে ঐক্যের মূল ভিত্তি ছিল মননশীলতা ও পশ্চিম সম্পর্কে শ্রদ্ধা। ইউরোপের সংকট যে পৃথিবীর সংকটের পূর্বাভাস এ বোধও এঁদের মধ্যে অনেকের ছিল।

সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রণ্টের অঙ্কুর

১৯২৮-২৯ সাল থেকে পুঁজিবাদের যে সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠল এবং ফ্যাসিজম্ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল তার সামনে অর্থাৎ সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সামনে, একটা যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আর একটা যুদ্ধ আসতে পারে এমন ধরণের কথাবার্তা শুরু হওয়ার যুগে, ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে United front-এর যে বাস্তব অঙ্কুর তৈরী হচ্ছিল—বাংলাতে ১৯৩১ সালের 'পরিচয়' প্রকৃতপক্ষে তারই প্রকাশ। ব্যাপারটা প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত—তবু সত্য। এবং এই ধরণের ঘটনা বা এর থেকে আরো বড় ধরণের

ঘটনা যখন সারা পৃথিবীতে বড় আকারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিতে লাগল তখন ডিমিট্রভ ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি ঘোষণা করেন।

'পরিচয়ে' এই ধরণের যুক্ত ফ্রন্ট তার উদ্যোক্তাদের প্রায় অজ্ঞাতেই গড়ে উঠেছিল। প্রথমে বিরোধটার থেকে ঐক্য বড় ছিল এবং যার জন্য ঐক্য অর্থাৎ 'পরিচয়ে'র মারফতে নতুন ভাবধারা প্রচার—সেটা বড় কম হয় নি। তিন দশকের প্রথম দিককার বাংলায় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মানসিক পরিবর্ত্তনে অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যা, সমাজতন্ত্রবাদ, রুশীয় সাহিত্য সমালোচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, ট্রটস্কিবাদ সম্পর্কে পূর্বোক্ত লেখকদের প্রবন্ধ সে সময়কার শিক্ষার্থী মনের সামনে উজ্জ্বল আলোকপাত করেছিল।

কিন্তু এই সব হচ্ছিল নিছক বুদ্ধিচর্চার তাগিদে; কোন আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগের ফলে এসব হয়নি। অবশ্য কোন কোন মহল থেকে আশা করা গিয়েছিল যে নিষ্ঠাবান বুদ্ধিচর্চ্চা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথে আসতে বাধ্য। কিছু কিছু লোকের পক্ষে সেকথা সত্য হলেও 'পরিচয়ে'র একাংশের সঙ্গে ভিক্টর গোলাঞ্জ, জন ষ্ট্রেচী, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, অডেন প্রভৃতির অবস্থার সঙ্গে সামান্য তুলনা করা যেতে পারে। 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে প্রগতি লেখক সংঘের কলিকাতা সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্য পর্য্যন্ত করা হয়েছিল—('পরিচয়ে'র অন্যাংশের কারো কারো এতে অপ্রকাশ্য আপত্তি ছিল এবং সুধীন-বাবু নিজে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—'My own records prove that I am here under false pretences, being neither a progressive nor a writer who has ever passed beyond infriquent notoriety'—কিন্তু তাতে আন্দোলনের বা তাঁর কোন লাভই হয়নি।

এর কারণ এই যে এঁরা জনসাধারণ থেকে সম্পর্কচ্যুত বুদ্ধিজীবি ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভাবধারা গ্রহণ করে এদেশের লোককে শেখাবার যে পরিমাণ উৎসাহ এঁদের ছিল, এদেশের লোক ও আন্দোলন থেকে শিখে এদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করার দায়িত্ব বোধ এঁদের ছিল না। তাছাড়া শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি যাঁরা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছিলেন তাঁদের আধু-নিকতা ছিল Eddington, Sir James Jeans, Sir Oliver Lodge প্রভৃতি আদর্শবাদীদের উক্তির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের উক্তি মেলানোর মধ্যে। তাই শেষ

পর্যন্ত এঁদের বুদ্ধিচর্চা সৌখিন ও ফ্যাসন দুরস্ত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। আমি আগেই বলেছি যে 'পরিচয়ে'র প্রগতি চেষ্টার আগে থেকে সারা বিশ্বে এবং ভারতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকে যা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, বাংলাদেশে চটকলে ষ্ট্রাইক, পণ্ডিত নেহেরু এবং বাংলায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদ ও রুশিয়ার পক্ষে প্রচার, যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে নতুন ধরণের আন্তর্জাতিকতার ধারণা প্রচার, করতে সাহায্য করছিল—যা শেষ পর্যন্ত পরিবেশিত হত ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে আমি পণ্ডিত নেহেরুর একটি বক্তৃতা উল্লেখ করছি :—"The world is in bad way and India especially is in a perilous state inspite of the glitter and superficial splendour of our great cities. There are rumours of war and awful prophecies that the next war may result in irratrievable disaster to civilisation. But the very excess of evil may hasten the cure……What is this communist idea before which the British Empire quakes! I do not propose to discuss it here but I wish to tell you that though personally I do not agree with many of the methods of the communists and I am by no means sure to what extent communism can suit present conditions in India, I do belive in communism as an ideal of society. For essentially it is socialism and socialism, I think, is the only way if the world is to escape disaster.

"And Russia, what of her? An out-caste like us from nations and much slandered and often erring. But inspite of her many mistakes she stands to-day as the greatest opponent of imperialism and her record with the nations of the East has been just and generous. In China and Turkey and Persia of her own free will she gave up her valuable rights and concessious whilst British bombarded the crowded Chinese cities and killed Chinamen by hundreds because they

dared to protest against British imperialism. In the city of Tabriz in Persia when the Russian Ambassador first came, he called the populace together and on behalf of the Russian nation tendered formal apology for the sin of the Tsars, Russia goes to the East as equal, not as conqurer or race-proud superior. Is it any wonder that she is welcomed ?… If you go to England you will realise in full measure what race prejudice is…If any of you go to Russia you will see how racial feeling is utterly absent. (J. Nehru—Presidential address delivered at the All Bengal Students conference held in Calcutta on September 22nd 1928).

পণ্ডিত নেহেরুর এই কথাগুলি বস্তুত সেই সময়কার যে কোন প্রগতিশীল সামাজিক ক্রিয়াকলাপের রাজনৈতিক সুর বেঁধে দিচ্ছিল এবং এরই সমসাময়িক কালে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। এর সঙ্গে তুলনা করে বলতে গেলে বলা যায় 'পরিচয়ে'র প্রবন্ধকাররা প্রায় এই সুরেই সুর মিলিয়েছিলেন এবং তার সৃজনশীল সাহিত্যিক অংশ এটাকে মূলত বিতর্কমূলক রাজনীতির বিষয় ভাবলেও এসবের প্রতি উদারনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

'পরিচয়ে'র মধ্যকার প্রাথমিক বিরোধ

আগেই বলেছি যে সাহিত্যে প্রগতিশীলতার বিষয় নিয়ে যে সংকট 'পরিচয়ে' মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম করেছিল সে সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক বা কতকটা আত্মসমর্পণমূলক অবস্থা গ্রহণ করে ফ্যাসিজম-বিরোধিতার-রাজনৈতিক স্তরে ঐক্য গড়েছেন এই ধারণা হয়ত হীরেনবাবুরা করছিলেন। অবশ্য এই সব লেখকদের অনেকের কাছে রাজনৈতিক ক্ষেত্র কিছু ছিল না, ছিল রাজনৈতিক মানস। তবু সেখানেও বিরোধ শুরু হতে লাগল সারা বিশ্বের ঘটনার সাথে তাল রেখে। 'পরিচয়' প্রথমে তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হত। পড়াশুনার পর আলোচনা করে লিখতে গেলে সময় লাগে বলেই এটা করা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের সঙ্গে বা ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কহীন কাগজের ব্যয়ভার টানা মুস্কিল—। ব্যয়ভারটা সুধীন্দ্রনাথ দত্তই টানছিলেন। সেটা যখন দুঃসহ হয়ে উঠল তখন কথা হল 'পরিচয়'কে অন্যান্য কাগজের মত মাসিক ও জনপ্রিয় করা—ধারাবাহিক উপন্যাস প্রভৃতি বার করা। এই সময় 'উত্তরা'র শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'পরিচয়'

পরিচালনার ভার নেন। 'পরিচয়ে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে আর যারা প্রথম থেকে প্রায়ই যোগ দিতেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত জনাব শাহেদ সুরাবর্দী (এক-কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ও রুশিয়ার কুখ্যাত কেরেন্সকীর ইংরাজী শিক্ষক), শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীবসন্তকুমার মল্লিক (ইনি ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে অক্সফোর্ডে আশ্রম খুলেছেন), শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ প্রভৃতি। 'পরিচয়' বৈঠকের নির্দিষ্ট দিন ছাড়াও এঁরা মেলামেশা করতেন। শ্রীবিষ্ণু দে প্রমুখরা এই সব আড্ডায় যেতেন। বড়লোকদের বৈঠকখানায় উঁচ্ কপালে হালকা আলোচনা ও খানা-পিনার আসর জমানোর যে ঐতিহ্য 'পরিচয়ে'র ছিল —তার থেকে সময়মত এবং অবস্থামত সেই আড্ডা প্রধানতঃ সৌখিন, আত্ম-প্রতারণাময় ও পলায়নপর বুদ্ধিবিলাসীদের আড্ডায় পরিণত হওয়াটা কেবলমাত্র কালসাপেক্ষ ছিল। ১৯৩৪—৩৯ সালে যখন পুঁজিবাদী দুনিয়া দ্রুত সংকট ও যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ফ্যাসিজম-বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কিনা এই প্রশ্ন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামনে ক্রমান্বয়ে মাথা তুলছে এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নতুনভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য তৈরী হচ্ছে—তখন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, সুস্পষ্ট নীতি ও আত্ম-সমালোচনাহীন সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর কি অবস্থা হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। বোধকরি ১৯৩৬ সাল থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 'পরিচয়ের' বৈঠকে যোগ দেন। অধ্যাপক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ থাকতেন, অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় উৎসাহে ভাটা দিলেন এবং শ্রীরাধারমণ মিত্র মাঝে মাঝে 'পরিচয়' আসরে গিয়ে একাই আসর গরম রাখতেন। এঁরা প্রায় তখন সাহিত্যে গরমপন্থী বলে পরিচিত হন। ভারসাম্য রক্ষা করতেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ফলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী যোগাড় করার জন্য সোভিয়েতকে টোটেলেটারিয়ান বলতে দিতে হত, সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি এলিয়টকে প্রশস্তি জানাতে হত!

'প্রগতি' সংকলন

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য সম্পর্কে ঐক্যের এই নীতি কেবল 'পরিচয়ে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—এরপর প্রগতি লেখক আন্দোলনে তা' প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৩৪৪ সালে প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত

হয়। এই সংকলনে বিদেশী লেখকরা ছাড়া এদেশের শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিভা বসু, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসমর সেন, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীমানি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণকুমার মিত্র ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা গৃহীত হয়। অনুবাদকদের মধ্যে শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জনাব আবদুল কাদির, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। বিষ্ণুবাবু এলিয়টের 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' অনুবাদ করেছিলেন।

এঁরা সব কি লিখেছেন তা আপাতত না জানলেও লেখকের নামের তালিকাতে নজর দিলে আজ ১৪ বছর পরে সহজে মনে হতে পারে যে সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐক্য গড়ার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রমাণ এর থেকে মেলে, কিন্তু তার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এই সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদকরা লিখেছেন: "যাঁদের লেখা এতে আছে তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্ঘের সভ্য; কয়েকজন সভ্য না হলেও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখেছেন তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য স্থষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী, ফ্যাসিজম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে।"

১৩৪৩ সালে 'পরিচয়ে' 'সংস্কৃতি সংকট' প্রবন্ধে হীরেনবাবু যে নীতি প্রচার করছিলেন—এখানেও সেই নীতির পুনরুক্তি হয়েছে। কিন্তু এই সংকলনের লেখার কয়েকটি আলোচনা করলে দেখতে পাব সকলে এই নীতি একইভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

"Much as we may desire to see unity of the whole Indian people in the struggle against foreign rule, we have to recognise that there cannot be an abstract "Unity" of the entire Indian population, 100 percent, all sections and classes against British Imperialism. Some sections have

their interest bound up with Imperialism e. g., princes, landlords, moneylenders, reactionery religious and political elements which live on exploiting communal differences, slements among the merchants and wealthy classes······in consequence in estimating the forces of the national struggle, we have to take into account the realities of the class structure of the population under conditions of imperialism······ What is the necessary basis for such unity of all the anti-imperialist forces, such as can unite all the forces of National Congress, the trade unions, the peasants' organisation, the youth organisation, etc. ? It is clear that the essential minimum basis for such a grouping is (i) a line of consistent struggle againgt imperialism······for the complete independence of India ; (ii) active struggle for the vital needs of the toiling masses. This is the unity of the Indian people we want, the united anti-imperialist people's front for the struggle against imperialism.

[R. P. Dutt and Ben Bradley in the International Press Correspondence, Feb. 29. 1936].

'প্রগতি'তে সংকলিত রচনাগুলির আলোচনার আগেই আর একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা সেরে নিলে সময়ের ইতিহাস রক্ষা করা হবে। উক্ত সংকলনের শেষে যুক্ত 'বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী' নামে যে ইশতেহার ব্রসেলসে বিশ্বশান্তি কংগ্রেস ও প্যারিস সংস্কৃতি রক্ষা সম্মেলনে প্রেরিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই ইশতেহারে সই দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি। (তারিখ ১৪ই ভাদ্র ১৩৪৩ সাল)।

হীরেনবাবুর কথামত 'প্রধানত বাঙালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে' এই ইশতেহার ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়। এই ইশতেহারের শুরুতেই বলা হয়েছে: 'দেশে ও বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত

আশঙ্কাজনক।' তারপর দ্বিতীয় প্যারায় ভারতের জনসাধারণের নাগরিক অধিকারহীনতা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরাধীনতা, সি কাষ্টমস্ আইনানুসারে সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে' গ্রন্থাদির আমদানী বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ, দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ, ৩৪৮ খানি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং তাদের জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "চিন্তার ক্ষেত্রে যে-স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের পক্ষে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।"

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের উদাহরণ এইভাবে বর্ণনা করার পর শেষ প্যারায় বলা হয়েছে: সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাইরের অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরী খাদ্যের অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জংগীবাদীরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইটালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত হানিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়াবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্ব প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সংকটময় পরিস্থিতির এই সব পুর্বসূচনা। আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানে আমরা ঘোর বিরোধী, কারণ আমরা জানি যে আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক বা নাৎসী জার্মানীই হউক সেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে, সেখানে উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।"

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই বিবৃতি যে অত্যন্ত মূল্যবান সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ক্রিয়াকলাপ, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধসজ্জা, ফ্যাসিজমের আক্রমনাত্মক নীতির নিন্দা প্রভৃতি অনেক মূল্যবান ঘোষণা এই বিবৃতিতে আছে, তবে বাঙালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে রচিত এই বিবৃতিতে কিভাবে "সোভিয়েট ইউনিয়নে হউক বা নাৎসী জার্মানীতে হউক যেখানে সংস্কৃতিই বিপন্ন হইবে"—কথাগুলি

এল তা নিশ্চয় হীরেনবাবু একদিন বলবেন। কারণ এই বিবৃতির কোনখানে আভাসেও বলা হয়নি সোভিয়েট ইউনিয়নে সংস্কৃতির কোন বিপদ আছে। শেষ কয়েকটি লাইনে এর যোগ দেখলে মনে হয় স্বাক্ষরকারীদের কারো কারো দাবীতে একাজ করা হয়েছে। এ ছাড়া এই বিবৃতিতে আর একটি ছোট ফাঁক রয়ে গেছে—যা না থাক্‌লে এই বিবৃতিকে একেবারে নির্ভুল বিবৃতি বলা যেত। ফাঁক হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিজমের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যোগাযোগ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকা। তবু এই বিবৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হচ্ছে এই যে, দত্ত-ব্রাডলে প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংস্কৃতি ফ্রণ্ট গঠন করা সম্ভব ছিল। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সাম্রাজ্য-বাদ প্রধান শত্রু বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে নতুন চেতনা সৃষ্টি করেন। মার্ক্সবাদীরা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন ফ্যাসিজমবিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের নতুন ধরণের বিপ্লব নয়—এটা ধনতন্ত্রের পয়দা, এর পুষ্টি সাধনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি।

"The ruling bourgeoisie more and more seeks salvation in fascism, with the object of taking exceptional predatory measures against the working people, preparing for an imperialist war of plunder, attacking Soviet Union, enslaving and partitioning China and by all these means preventing revolution.

The imperialist circles are trying to shift the whole burden of the crisis on to the shoulders of the working people. That is why they need fascism.

They are trying to solve the problem of markets by enslaving the weak nations, by intensifying colonial oppression and repartitioning the world anew by means of war. That is why they need fascism.

(Speech by Dimitrov, Seventh world Congress of the Communist International.)

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেও এই সব বিষয়ে যে প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়েছিল

(পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন সেইসব প্রস্তাবের রচয়িতা) তাতেও প্রায় এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসে শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসে পূর্বোক্ত ব্রুসেলস্ সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা জানিয়ে যে প্রস্তাব নেয় তাতে বলা হয়েছে ঃ

The National Congress will willingly associate itself with the organisation which the Peace Congress has established on this behalf. The Congress, however, wishes to emphasise that Imperialism itself is a continuing cause of war and its elimination is essential in the interest of the world peace.

স্পেন সম্পর্কে প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে বৃটিশ সরকারের "হস্তক্ষেপ না করার" নীতি কার্যত ফ্যাসিষ্টদের সাহায্য করছে। এর কিছুকাল পরে সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হতে থাকে ঃ এই ধরণের যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ নেই। ভারতের জনসাধারণের লোকবল বা অর্থ সাহায্য যাতে এ কাজে ব্যবহৃত না হয় তার জন্য কংগ্রেস সতর্কবাণী দেয় ; এবং ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ বাড়ছে দেখে ঃ

The Congress is fully concious of the necessity of facing this world menace in co-operation with the progressive nations and peoples of the world, and especially with those peoples who are dominated over or exploited by Imperialism or Fascism."

ভারতের সাধারণ জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমপরিনতি আমরা ফ্যাসিজমের জন্ম থেকে সোভিয়েট জার্মান যুদ্ধ পর্যন্ত যা দেখেছি অর্থাৎ ফ্যাসিজমকে সাম্রাজ্যবাদের একটি বিকাশ হিসাবে না জেনে তাকে পৃথক করে দেখা, সর্বহারা একনায়কত্বের সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরীর মিল খুঁজে বার করা অথবা দুটিকে এক ধরণের জিনিস বলে ভুল করা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সময় ইংরেজ-বিদ্বেষহেতু মনে মনে হিটলারকে সমর্থন করা ও সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সংগে তার সখ্যতাকে ভাল চোখে না দেখার যে স্তরগুলি আমরা দেখেছি, পূর্বোক্ত কংগ্রেস প্রস্তাবগুলিতে তার সামান্যই সূচনা মেলে। জাতীয়সংস্কারবাদী নেতৃত্বের প্রভাবান্বিত আন্দোলনে এর বেশী আশা করাও যায় না। তবু পরবর্তী বিকারের মূলে

স্থানীয় মার্ক্সবাদীদের প্রচারে এবং কাজের দোষ ত্রুটি যে রয়েছে তা মানতেই হবে। ভারতের মত সাম্রাজ্যে মার্কসবাদীরা যে পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শীর্ষস্থানে যেতে পারবে সেই পরিমাণে তার ফ্যাসিষ্টবিরোধী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হবে—একথা কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম অধিবেশনে ডিমিট্রভের বক্তৃতা থেকে বেশ বোঝা যায়।

যাইহোক, পূর্বোক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদীদের উদ্যোগে কোন গণ সংগঠন গড়তে হলে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য 'We have to take into account the realities of the class structure of the population under conditions of Imperialism'—এর পথ ধরতে হত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কায়দা সাহিত্যক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না জানি। কারণ ভারতের মত উপনিবেশে সাহিত্যিকরা বুর্জোয়া বা সামন্ত-তান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হলেও নিজেরা অধিকাংশই নিষ্পেষিত শ্রেণীর লোক। তবু এদের একাংশ অপেক্ষাকৃত ধনী এবং ইংরাজী শিক্ষার সুযোগে পশ্চিমের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে 'শিল্প শিল্পের জন্য' নীতি বা আঙ্গিক সর্বস্বতার প্রভাব সহজে কাটাতে পারেন না। এদের কাছে সাহিত্য সমাজসেবার অস্ত্র না হয়ে নিজেদের নৈসর্গিক প্রতিভা বিকাশের উপায় হিসাবে গ্রাহ্য হয়। কাজে কাজেই এ-হেন সাহিত্যিক সমাজের কাছে, শান্তির পক্ষে, যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রচার করার দরকার যেমন ছিল তেমনি দরকার ছিল ভারতের অবস্থার উপর জোর দিয়ে সেই অবস্থা প্রতিকারের কর্তব্যে তাদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার বনিয়াদ খাড়া করা। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শুরুতে এই কাজটি ঠিকমত হয়নি। বরং সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলগুলিকে ছোট করে দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আশু লড়াইএর কার্যক্রম স্থির করতে অস্বীকার করে, ফ্যাসিষ্টবিরোধী জনযুদ্ধের পর আপনা-আপনি স্বাধীনতা আসবে এই ধারণা প্রচার করা এবং ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ভার বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়ার যে মারাত্মক যোগীবাদী নীতি ১৯৪২-৪৭ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে চলেছিল—তার অঙ্কুর দেখতে পাই 'প্রগতি' সংকলনের মধ্যে। অথচ আশ্চর্য লাগবে শুনে যে এই হীরেনবাবু ও বিষ্ণুবাবু নাকি রবীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যিক মতামতের সমর্থক ছিলেন। অবশ্য শুনতে যাই হোক ঘটনাটা আসলে খুবই অর্থপূর্ণ।

'প্রগতি' সংকলনের সাধারণ চরিত্র

'প্রগতি' সংকলনের মুখবন্ধে হীরেনবাবুরা বলেছেন যে উক্ত সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজম বিরোধী। কিন্তু এই সংকলনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ প্রবন্ধ নেই। এই সংকলনের সাধারণ চরিত্র কেবল ফ্যাসি-বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী বা শান্তির পক্ষে নয়। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি সাহিত্যের সংকলন হিসাবে বার করা। যদিচ যুদ্ধ বা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোন কোন প্রবন্ধের মাঝে মাঝে কিছু কথা আছে। মোটের উপর প্রবন্ধগুলিতে নিশ্চয় বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু নতুন বক্তব্য আছে—কিন্তু কবিতার কিছু অংশ যে কেন এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তা বলা মুস্কিল। বিভা বসুর "তুই কবি," বিষ্ণু দের অনূদিত এলিয়টের "ফাঁপা মানুষ," বুদ্ধদেব বসুর "অনুরাধা" নাটকের প্রস্তাবনা, সজনীকান্ত দাসের "স্লেটের লেখা," সমর সেনের "একটি বেকার প্রেমিক" প্রভৃতি কবিতাগুলি কেন 'প্রগতি' সংকলনে যোগ করা হল তা বোঝা সত্যই কষ্টকর। এর কারণ এই যে সংকলনের মার্কস-বাদী সম্পাদকদ্বয় প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা, তার বিচারের মাপকাঠি এবং অন্যান্য সাহিত্যগোষ্ঠীর বাইরে প্রগতি সাহিত্যিকদের গোষ্ঠীগঠনের প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য বোঝাতে কোন প্রবন্ধ এই সংকলনে লেখেন নি। অন্যতম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী একটি কবিতা ছাড়াও "সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা" নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সম্পর্কে মূল্যবান কথা থাকলেও পূর্বোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। এবং তিনিও উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন: "একমাত্র ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বর্বর উপদ্রব বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।" হীরেনবাবু কার্ল মার্কসের "ভারতে ইংরাজী শাসন" সম্পর্কিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন, কিন্তু প্রগতি সাহিত্য ও তার সংগঠন সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং ভারতের জাতীয় কর্তব্যের সঙ্গে সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলিয়ে লেখার তাগিদ তিনিও বোধ করেন নি। কিন্তু সে দায়িত্ব তাঁরা দিয়েছিলেন তখনকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপর। সংকলনের ভূমিকায় প্রগতি সাহিত্য কাকে বলে এবং সঙ্ঘের লক্ষ্য কি—সেই সম্পর্কে নরেশ বাবু একটি প্রবন্ধ দিয়েছেন। নরেশবাবু জনপ্রিয় সাহিত্যিক, খ্যাতনামা আইন-বিদ্, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত এবং এককালে লেবার পার্টির সভাপতি ছিলেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার লেবার পার্টি সমেত কমিউনিষ্ট পার্টিতে আসার পর

বোধ হয় তাঁর সংগে লেবার পার্টির সংগঠনগত যোগ আর ছিল না। তবে তিনি যে একজন উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রী সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তো কম উদারনৈতিক ছিলেন না। "সবুজ পত্রের" প্রথম সংখ্যায় প্রমথ বাবুর লেখার সংগে নরেশবাবুর লেখার তুলনা করলে পাঠকরা আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উদারনৈতিক বুর্জোয়া ভাবধাবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গণতন্ত্র প্রচার করেও শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে পারে না—এই চেতনা হীরেনবাবুদের ছিল না—তা নরেশবাবুর লেখা উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেব। চেতনা থাকলে নিশ্চয় হীরেন-বাবুরা কেউ একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দিতে পারতেন এবং তাতে ঐক্য নষ্ট হত না। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে কয়েকটি ভাল কথা থাকলেও মূলত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেখানেও আসল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

সাহিত্যে প্রগতি নূতন কিছু নয়

নরেশবাবু লিখেছেন: "প্রগতি লেখক সংঘ, সাহিত্য ও সমাজে প্রগতি-কামী—যে অভীপ্সিত প্রগতি সাধনের পক্ষে সংঘের উপায় সাহিত্য, যে সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সংঘ কামনা করেন তাহা সাহিত্য হওয়া চাই—সাহিত্য-রস ভূয়িষ্ট হওয়া চাই। সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না।" এর পর কাব্যকুশলতাপূর্ণ গতানুগতিকতাকে সাহিত্য বলতে অস্বীকার করে তিনি বলছেন: "গতানুগতিকের বাঁধা খাত ছাড়িয়া যিনি কোনও নূতন পথ—রসের নূতন ধারা আবিষ্কার করিতে পারেন তাঁরই সাহিত্য-রচনা সার্থক হয়।" তবে কোন লোকোত্তর প্রতিভাশালী লেখকের আবিষ্কৃত পন্থা অনুকরণ করা চলবে না—কেন না নূতন যাহা, "যার ভিতর রসবস্তুর নূতন কোন বিকাশ থাকে, তাহাই চিরকাল স্থায়ী থাকে।"

সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল!

রস সাহিত্যের প্রগতিশীল না হয়ে উপায় নেই—এই উক্তি করে তিনি লিখেছেন যে কথা-সাহিত্য সম্পর্কে এই উক্তি নিশ্চয়তার সঙ্গে করা যায়। মানব-জীবন, সমাজ-জীবন চঞ্চল। "যাহা অতীত তাহার মধ্যে যাহা চিরন্তন, তাহা লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই অতীতের অভিজ্ঞতা, নিত্য সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে প্রতি মুহূর্তের নব সৃষ্টিতে, প্রতিদিন মানব-সমাজ নব জন্মলাভ করিতেছে…। যুগে যুগে সাহিত্য সেই রূপান্তরিত জীবনের নূতন রসমূর্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে।" এরপর তিনি বলেছেন যে সেক্সপীয়ার,

কালিদাস, ইউরিপিডিস, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কেউ গতানুগতিক ছিলেন না —জীবনের পরিচয় তারা পরের মুখে ঝাল খেয়ে পান নি—কিন্তু আজ তাঁদের অনুকরণ করলে চলবে না। "মানব জীবনের যে রসমূর্তি আজকের অভিজ্ঞতায় আমরা লাভ করিতে পারি তার পরিচয় যে সাহিত্যে না পাই তাহা সাহিত্য নয়।" বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রজ্ঞামূলক সাহিত্য যেমন নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা আপনাকে সজীব রাখে, সাহিত্যকে তেমনি নিত্য পরিবর্তনশীল মানবজীবনের ভিতর চোখ রেখে নিজেকে সজীব রাখতে হয়। "কাজেই সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল ; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।"

তবু প্রগতি নাম কেন নেওয়া হল ? "অধিকাংশ লোক গতানুগতিক, নূতন কিছু শুনলেই তারা বিপদ মনে করে। কিন্তু নতুন পথের সাহসী পথিকদের মধ্যে আবার পথ নিয়ে মতভেদ আছে। একজন যাকে প্রগতি ভাবে আর একজন হয়ত তাকে অধোগতি বলে মনে করে। তবু তাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ কি ? চলতি সংস্কার থেকে মুক্তি। কিন্তু এই সংস্কার-মুক্তি চোর ডাকাত খুনেদের সংস্কার মুক্তি নয়। 'প্রগতিকামী সংস্কার শুধু ভাঙ্গে নয়, সে তার স্থানে কিছু গড়িতে চায়। তার চক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে জীবন ও সমাজের একটা নূতন ও পূর্ণতর আদর্শ···প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সেই সাহিত্যের পুষ্টি ও অভ্যুদয় যাহা সমাজ ও জীবনের একটা বৃহত্তর, পূর্ণতর আদর্শের আলোকে বর্তমানকে ভাঙিয়া গড়িতে চায়।"

"সে আদর্শ সবার এক নয়—এখানেও একটি মাত্র সাধারণ লক্ষণ যা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আপনার বলে দাবী করে—তা'হল 'স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতম স্বাধীনতা। যাহা কিছু মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের অন্তরায় তাহা বিদূরিত করিয়া মানবত্বের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই স্বাধীনতা প্রগতি-সাহিত্য সঙ্ঘের লক্ষ্য।"

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার বিপদ কোথায় ?

কিন্তু কি এই স্বাধীনতা ? সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা নেই। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রবন্ধের শেষে বলেছেন যে আসলে সমাজ প্রগতিশীল—কিন্তু "অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ প্রভৃতি ধ্বংসের অনুচর সমাজের বাঁচিবার ও বাড়িবার নিয়ত প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য লড়াই করিতেছে।······ধনিকের অর্থলিপ্সার ফলে আজ কোটি কোটি মানবের কত না দুঃখ কত অকল্যানের হেতু হইয়াছে।······বিজ্ঞান ধ্বংসের সেবায় বদ্ধপরিকর।

সমাজ বাঁধিয়াছিল মানুষ জীবন পূর্ণতর ও অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্য। তাই সমাজের বন্ধন আজ কঠিন নিগড় হইয়া তার মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে।······দোর্দণ্ড প্রতাপ হিংস্র শক্তি আজ আন্দোলন করিয়া মানবের মানবত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভোগ ও বিলাসের ক্রীতদাস করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে।" কাজে কাজেই মানবত্বকে আশঙ্কিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্য সংহত চেষ্টার প্রয়োজনবোধে তিনি বলেছেন: "যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান —সকলের সমবেত চেষ্টার আজ প্রয়োজন মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যানের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার। সেই ব্রতের উদ্‌যাপনকল্পে প্রগতি লেখক সংঘ একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না······এ উদ্দেশ্য এ সংঘের নাই। সংঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সংঘ চাহেন না। কিন্তু যাহারা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি সাহিত্যের সম্যক প্রচার, আলোচনা ও গবেষণা করিয়া পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতিব অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও ব্রত।"

কোনটি বেশী প্রগতিশীল ?

'সবুজপত্রে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ১৩২১ সনে অর্থাৎ নরেশ বাবুর লেখার ২৩ বছর আগে যা লিখেছেন তার কোন কোন লাইন উদ্ধৃত করছি: "······দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারিনা, গড়তে পারি শুধু সাহিত্য সম্মেলন। (দল বলতে তিনি সমাজ এবং গতানুগতিকতা বুঝে বলছেন) যার সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থ টি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। মানব জীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা' সাহিত্য নয়। তা' শুধু বাকছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনন্দিন জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।······প্রাণের লক্ষন হচ্ছে······তার জাগ্রত ভাব অপর দিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদর। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি

বাঁচি।......সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রায় অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরুক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের সবুজপত্রমণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন—তাহলে আমরা বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় অভাব তা' কতকটা দূব করতে পারবো। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা তারই জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই।' (একে আত্মঘাতী জিনিস বলে তিনি বলছেন)... ...সাহিত্য জাতির খোবপোষেব ব্যবস্থা করতে পারে না কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা কবতে পারে। (......ইউরোপ আমাদের মনকে কিভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে সেই প্রসঙ্গে)......ইংবাজী সভ্যতার সম্পর্কে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক্ চলবার এবং অন্যকে চালাবাব জন্য আঁকুপাকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগুতে, কেউ পূর্বের দিকে পেছু হঠতে চান, কেউ আকাশের উপর দেবতার আত্মাব অনুসন্ধান কবছেন। কেউ মাটির নীচে দেবতার মুক্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায় আমরা উন্নতিশীল হই আর অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক গতিলাভ কবেছি অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ কবেছি।......

(ইউরোপেব কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার উদাহরণ)—ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনোনা কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে—টিনের টবে তোলা মাটিতে সে বীজ বপন কবা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই আমাদের ভারতবর্ষেব অতি বিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের নব ভাবের চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে।......(সাহিত্যে সৌখিনতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লেখেন) লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কাজও নয় খেলাও নয় শুধু অকাজ, কারণ খেলার ভিতরে যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, লেখায় তা নেই—অপব দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে তাও তাতে নেই। (আমরা সকলেই নিজেদের নৈসর্গিক প্রতিভার উত্তরাধিকার ভাবি —এই ধারনাকে উপহাস করে বলছেন) ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনি

হয়।……ইউরোপের ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছু প্রতিবিম্বিত হবে না।" ….(ইউরোপের শিক্ষার দোষ দেখিয়ে বলছেন) বর্তমান ইউরোপও অতীত ভারতবর্ষের এ উভয়ের দোটানায় পড়ে বাংলা প্রায় ভুলে গেছি……ইংরাজী শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলায় মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে মনে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, পরগাছা হচ্ছে।……আমাদের 'বাংলা ঘরের' খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুণ্ডের মধ্যে সাতসমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোন সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।"

বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের পর (১৯০৫ সালের পর) আবার যখন জড়তা দেখে গেছে—প্রথম যুদ্ধের গোড়ার দিকে যখন জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা চলেছে তখন সাহিত্য মন ভেজায়, নিদ্রায় অধিকার হরণ করে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, জাতিকে আত্মহত্যার থেকে রক্ষা করে প্রভৃতি বলে সাহিত্যের যে ভূমিকা প্রথমবাবু নির্দেশ করেছেন—তার সামান্য আভাসই নরেশবাবুর লেখায় মেলে। ইউরোপের ধাক্কা ও ইউরোপ থেকে জ্ঞান লাভ করার সম্পর্কে প্রথমবাবু যখন বলছেন যে ভাবের বীজ যে দেশ থেকে আনা হোক না কেন এদেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে……নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না—তখন তার জাতীয় কর্তব্যবোধ কত সুস্থ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে সৌখিনতা ও হাম-বড়া ভাবকে বিদ্রূপ করে তিনি সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, মননশীল, স্বচ্ছ ও যত্নবান হতে যে উপদেশ দিয়েছেন তা দীর্ঘকাল ধরে নবীন সাহিত্যিকদের পক্ষে অবধারিত নির্দেশ হয়ে থাকবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তা' ১৯১৪-১৫ সালে তাঁদের মত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদের পক্ষে প্রায় অনিবার্য ত্রুটি। তখনো এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও এই ধরনের দাবী কদাচিৎ শোনা গেছে।

অপরপক্ষে এর ২৩ বছর পর যখন ভারতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক এবং কৃষকদের দাবী স্বীকার করছে, যুক্তফ্রন্ট গঠন করছে, তখন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী মার্কসবাদী সম্পাদকদ্বয় লিখছেন

সাহিত্যিককে সমাজ সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার না হলেই এবং সামাজিক চৈতন্য সাহিত্যসৃষ্টির পরিপন্থী নয়—এই মানলেই চলবে। আর সেই যুক্তফ্রণ্টের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সভাপতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সাহিত্য বিচারের অতি পুরাতন সূত্র "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" ধরে বলেছেন: "প্রগতি সাহিত্য প্রধানত রস সাহিত্য ; নূতন রসে সাহিত্য সার্থক ও প্রগতিশীল হয়। রসের নূতনত্বের বিচারে সাহিত্যের স্থায়ীমূল্য নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন হচ্ছে—সাহিত্য সেই রূপান্তরিত জীবনের রসমূর্ত্তি প্রকাশ করে সার্থক হচ্ছে। কাজেই সাহিত্য মাত্রই প্রগতিশীল ; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।"

এর পরও যদি ঐক্য না হয় তো ঐক্য আর কিসে হবে! স্বভাবতই নরেশবাবু এই প্রবন্ধে সাহিত্যের ব্যাপারে সাহিত্যিককে দর্শক বা বড় জোর ঘটনা লিপিবদ্ধকারী করেছেন এবং সাহিত্যকে রূপসর্বস্বতার (formalism) ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। কারণ রসের হিসাবে সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড স্থির করার অর্থ হল—সামাজিক বাস্তবতার মানদণ্ড পরিত্যাগ করা। প্রমথবাবুর থেকে এটা পশ্চাদ্‌গতি। নরেশবাবুর অগ্রগতি হল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবী এবং ধনতন্ত্রবাদ এবং হিংস্র শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের দাবীর মধ্যে। নূতন সমাজ গড়ার যে লক্ষ্যের কথা তিনি বলেছেন—তাও এত অস্পষ্ট যে তার থেকে সাধারণভাবে কিছু বোঝা যায় না। নরেশবাবুর লেখা থেকে প্রশ্ন করা যায়—প্রগতির শত্রু কারা? উত্তরঃ—'অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ, ধনিকের অর্থ লিপ্সা, দোর্দণ্ড প্রতাপ হিংস্র শক্তি ইত্যাদি। হীরেনবাবুদের মুখবন্ধের পর নরেশবাবুর প্রবন্ধ পড়লে মনে হবে অতীতের সংস্কার, ধনতন্ত্র ও ফ্যাসিজম্ হল প্রগতি সাহিত্যের বিরুদ্ধপক্ষ। অবশ্য নরেশবাবু প্রকাশ্যভাবে কোথাও ফ্যাসিজম্ কথাটা উল্লেখ করেননি তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে। কাজে কাজেই দোর্দণ্ড প্রতাপ হিংস্র শক্তি, কথাটা সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ সব কিছুকেই বোঝাতে পারে। মোটের ওপর ভারতে বা বাংলাদেশে নানা ধরনের সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই নূতন গোষ্ঠীর জন্ম বা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সমসূত্রে গ্রথিত করার জন্য এই যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তার আদর্শগত বনিয়াদের, (রাজনৈতিক বা সাহিত্যগত) তত্ত্বের ও পথের কোন হদিস এই প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার পাওয়া যায় না। এই সাহিত্য সংগঠন কি কেবল যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বফ্রণ্টের একাংশ? না—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের

বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সাংস্কৃতিক বিভাগ? হয়তো দুটোই; অন্ততঃ হীরেনবাবুদের যতখানি জানি—তার থেকে এবং তখনকার রাজনৈতিক সংগঠনের কথা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিযুক্ত। তবু একথা মানতেই হবে যে 'প্রগতি' সংকলনের মার্কসবাদী সম্পাদকদ্বয় এবং সংঘের সভাপতির বক্তব্যের সুর প্রধানত ভারতের অবস্থার সঙ্গে না মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবে ফ্যাসিজম-বিরোধিতার সুর। দ্বিতীয়তঃ সগঠনগত প্রশ্নে এমন একটা গতানুগতিক ধারাব পক্ষে মত দেওয়া আছে—যাতে করে সমালোচনা বা আত্মসমালোচনার সুস্থ পরিবেশ প্রগতি লেখক সংঘে সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা দেখা যায় নি।

দল বেঁধে সাহিত্য রচনা হয় না—কথাটি প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ বলেছেন, নরেশবাবুও বলেছেন এবং ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসও বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় শরৎচন্দ্রকে যখন বলা হল যে দল বেঁধে সাহিত্য রচনা না করা গেলেও লেখক ও পাঠক রচনা নিয়ে আলাপ করলে সাহিত্যের উন্নতি হয়, তখন শরৎচন্দ্র তা মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসসাহিত্যসংঘ গঠন করার সময় সজনীবাবুও দলাদলিব আগ্রহে বোধ কবি নিজের উক্তি ভুলেই গিয়েছিলেন।

কিন্তু আসল সমস্যা প্রগতি সাহিত্য সংঘের কাছে কি ছিল? ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ মাসেব 'অগ্রণী'তে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: 'বিভিন্ন মতবাদেব দলাদলিতে বিভক্ত পৃথক পৃথক রাজনৈতিক শিবিরের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও একাধিক পৃথক পৃথক দল আছে লজ্জার সঙ্গে একথা স্বীকার করি। এক একখানি সাময়িক পত্র বা পত্রিকা কেন্দ্র করেই বিশেষভাবে এক একটি সাহিত্যিক দল বা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। তাঁরা সামনে বেশ হেসে কথা বলেন কিন্তু আড়ালে পরস্পরকে নিন্দা করেন। একে অন্যের যশ-খ্যাতির ঈর্ষা করেন। পরস্পরের গায়ে কাদা ছোড়েন ও পরস্পরকে দারুন অবজ্ঞা করেন। অথচ, একে অন্যের সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রশস্তিপত্রও রচনা করেন।'

নরেন্দ্রবাবুর এই কথা কেবল আজকালের জন্য নয় বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের অনেকদিনকার ইতিহাস। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদীরা নেতৃত্বের অংশে রয়েছেন এমন ধরনের সংগঠনে একদিকে যেমন যুক্তফ্রণ্টের মূলনীতিগুলি পরিষ্কার বলা দরকার ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে সেই ফ্রণ্টের বাস্তব বনিয়াদ গড়ার দিকে লক্ষ্য রাখা। তাহলে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির নৈসর্গিক প্রতিভার ভিত্তিতে

সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরীর পরিবর্তে সাহিত্য হিসাবে ভারতের জনসাধারণের সেবায় আদর্শের ভিত্তি বড হয়ে উঠতো—এবং বন্ধুবাৎসল্য, সৌখিনতা ও পরস্পরের পিছনে কাদা ছোড়ার বদলে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করত। কিন্তু তার বদলে যা করা হল—তাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে মেনশেভিকবাদ ও আত্মঅবলোপবাদ বলা যায়। ফলে ১৯৩৯-৪২ সালের সংকটময় দিনে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণের যুগে যখন 'প্রগতি' নামধারী বিভিন্ন বামপন্থী দল জাতীয় সংস্কারবাদী নেতাদের সংগ্রাম-বিরোধিতার সুরে সুর মিলিয়ে জাতীয় কর্তব্য থেকে সরে পডছে তখন প্রগতি লেখক সংঘের অস্তিত্বও প্রায় লোপ পেয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

'প্রগতি' সংকলনের অন্য প্রবন্ধগুলিতে কিন্তু তার অভিনবত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করেছে। সাহিত্যে প্রগতি কাকে বলে সে-সম্পর্কে যে একটি নূতন সামাজিক দৃষ্টিকোণ আছে এবং রস ছাডাও অন্যকিছু যে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি হতে পারে—সে-বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ নিশ্চিতভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির সামান্য আলোচনা আমি করতে চাই। কারণ সেই সময়ে যারা আমাদের দেশে সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন ধরনের চিন্তা করতে সুরু করছিলেন তাদের মনে ও যে কি ধরনের আত্মবিরোধ, যান্ত্রিকভাবে তত্ত্বপ্রয়োগ করার চেষ্টা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতের সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে আবছা ধারণা প্রচলিত ছিল—তার কিছু নমুনা এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এই চেষ্টার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত প্রবন্ধগুলির খ্যাতনামা লেখকদের অকারণে সমালোচনা করা নয়—আজ আমরা সেই প্রাথমিক যুগের স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিনা বা এখনো অনেকাংশে সেই অবস্থায় পড়ে আছি, কিংবা তার থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে নেমে গেছি কিনা—সেইটেই হৃদয়ঙ্গম করা।

প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রগতি কাকে বলে এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'প্রগতির অর্থ পরিবর্তন এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করছেন তাঁর মতানুযায়ী দিক পরিবর্তন।' এ উক্তি নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু সে-কথা স্বীকার না করেও তিনি যখন সাহিত্য, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছেন—তখন কিন্তু বাস্তববাদীর মত কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন: "পূর্বে খাওয়া-পরার সংস্থান, পরে ভাব-সম্পদ। অতএব পূর্বে সেই সংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তন ও তার ফলে ভাবসম্পদ

সৃষ্টির পরিবর্তন।' তথ্য, ঘটনা ও মূল্য প্রগতির তিনটি স্তর—এই বিভাগঃ দেখিয়ে তিনি তথ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক, ঘটনার সম্পর্কে organismic এবং মূল্যের বেলায় দার্শনিক মনোভাব নিতে বলেছেন। এরপর তিনি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: 'যতদূর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা এবং তারপর যেখানে চলছে না সেখানে সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাই প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্তব্য। যদি নেহাত অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভাল, অন্তত এমার্জেণ্ট-এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে—কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা ব্যাখ্যা দিয়ে পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেকস্থলে লক্ষ্য করেছি।' ধূর্জটিবাবু এই প্রবন্ধে কোথাও মার্কসবাদ বা ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি যে ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন—তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমি কেবল এই কথাই পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝাতে চাই যে, তাঁর দার্শনিক মতামত তখনো বিভ্রান্তির স্তর অতিক্রম করেনি। বর্তমান লেখক কিছুদিন আগে ধূর্জটিবাবুকে এই প্রবন্ধ দেখাতে তিনি বলেন যে, এতে অনেক ত্রুটিপূর্ণ উক্তি আছে। ধূর্জটিবাবু অবশ্য পুরোপুরি মার্কসবাদ মানেন না। তবু তাঁর এই কথাগুলি মূল্যবান: "প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে মনোভাব বর্তমান ও আগামীকালের বৈজ্ঞানিকের মনোভাবই হওয়া চাই। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধা সহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা।" তারপর ঘটনা সম্পর্কে প্রগতি সাহিত্যিকের কি বিবেচনা হবে—সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটিমাত্র সংকটময় মুহূর্তে।......এরই নাম গল্প বলার টেকনিক ইত্যাদি। এখন সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সংকট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে কবিতার মধ্যেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।" ইতিহাস কেবল পুনরাবৃত্তি করে এই ধারণাকে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন: "সমগ্র জীবনটাকে ঐ ভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন।......প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যাব বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাওয়ার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা পর্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধা ছাঁদা জৈব দেহের মতন,

অর্থাৎ তার ছক আছে। একটা ক্রাইসিস থেকে অন্য ক্রাইসিসে যাবার মধ্যে এই নক্সারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।' (ধূর্জটিবাবু আবার কি রকম যান্ত্রিক হয়ে উঠছেন এ তার নমুনা। শুধু তাই নয়—তাঁর স্ববিরোধিতা, খানিকদূর অগ্রসর হয়ে থেমে যাওয়ার আরো উদাহরণ দিচ্ছি।) বর্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নক্সাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে (ইন ডিফেন্স অব ডেকাডেন্সের পক্ষে কি এই যুক্তি বলশালী হয় না?—) "এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা।* সেইজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোমান্টিকের সাজে। যুক্তিতে বলে, যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হল যন্ত্রের উপর অধিকার বিভাগ। এক কথায় সমাজে অধিকার বৈষম্যের জন্যই জনসাধারনের জীবন অত একঘেয়ে।

প্রগতিশীল লেখকদের এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতে হবে" ....মূল্যজ্ঞান সনাতন নয়—এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি বলছেন—"পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বল্লেন যে, মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং বাকিটা মায়া। কোন মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ আছে। সাহিত্যে সনাতন তত্ত্বের ঐতিহ্যের নজীর দেখানোর মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখায়, কোন মুমূর্ষু মূল্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। শবের দৌরাত্ম প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না। অস্বীকার করাটা মস্ত কাজ, কিন্তু নতুন সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য। প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টি অসম্ভব।

এর পরে ধূর্জটিবাবু তখনকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন প্রবন্ধের শেষ প্যারায়ঃ "শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করেছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোন নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনো ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। (??সু.প্র) নতুন সাহিত্যিকের লেখার পরিবর্তন

* বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সহকর্মী দার্শনিক হোয়াইটহেডের "অ্যাডভেঞ্চার অব আইডিয়াস" বই-এর প্রভাব ধূর্জটিবাবুর উপর যে তখন ছিল—তা তিনি এই প্রবন্ধে লেখককে বলেছেন।

সম্বন্ধে সন্দেহের সাক্ষাত পাই, কিন্তু কেন হল কিভাবে হল এই জ্ঞানের কোন পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ সে নিজে বুঝতে পারছে না—মাত্র এইটুকুই কথা সাহিত্যে ফুটেছে। (যদি তাই হয় তো তাকে প্রগতি বলতে ধূর্জটিবাবুর আপত্তি কেন?) কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখছি কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে অর্থাৎ কবি নিজে ভালভাবে থাকতে পারছেন না। এঁরা যেন সকলে ভাল চাকরী খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড় চাকরীর দরখাস্ত লেখার সামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভাল, কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্য-জ্ঞানেব কোন তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটা মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক্, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।······অন্যদেশে তা' সৃষ্টি হচ্ছে জানি এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে আঙ্গিকের অনুকরণ হচ্ছে। তার বেশী কিছু হচ্ছে না আমার বিশ্বাস—তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। সমাজ জীবনের রূপ-পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে আমি ভুল কবতে রাজী নই।"

ধূর্জটিবাবুর এই উক্তির মধ্যে অনেক কিছুই অত্যন্ত মূল্যবান হলেও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। সমাজের রূপ পরিবর্তনের কারণ অর্থাৎ Historical Materialism না জানলে কোন সাহিত্যই প্রগতিশীল হবে না—এমন একটা আভাস ধূর্জটিবাবু দিয়েছেন। এই উক্তিটি ঠিক নয়। Historical Materialism না জেনেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে সাহিত্যে প্রগতি এনেছেন—তা নির্ভেজাল না হলেও তার বিচারের মাপকাঠি কেবল পূর্বোক্ত লেখকদের সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করছে না—একথা আজ ধূর্জটিবাবু হয়ত স্বীকার করবেন। এ যুগের প্রগতিশীল লেখকদের সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে যত জ্ঞান পাকা হয়—ততই তাঁদের ও আমাদের পক্ষে মঙ্গল—একথা বলে তিনি ভালই করেছেন। কিন্তু ভারতীয় বাস্তবতায় এই সমাজ জীবনের রূপ পরিবর্তনের রূপরেখা কি হতে পারে অর্থাৎ ভারতের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের মূল গতি কি তার আভাস যদি তিনি দিতেন—সেই আলোকে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বিচার করে প্রগতি

সাহিত্যের কর্তব্য নির্দেশ করতে পারতেন তা হলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হত। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে কেবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, এভাবে কথাটা পাড়া ধূর্জটিবাবুর মত সমাজবিজ্ঞানবিদ (এবং অনেকখানি পরিমাণে মার্ক্সবাদী) লেখকের মানসিক বিভ্রান্তিরই পরিচায়ক। কারণ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে উক্ত ধরনের বক্তব্য তাঁদেরকে প্রায় নস্যাৎ করারই সামিল হয়। তাদের কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য বা কোন্‌টি বর্জনীয়, তা প্রকাশ করে না। তবু ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধ প্রগতি লেখক আন্দোলনকে চিন্তাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"Bourgeois literary scholars have never really seriously posed the problem of the popular element in literature nor could they do so. Their fundamental error in treating of social and literary problems has always been the assumption that it is individual who plays decisive role in the historical process, in the development of culture and civilisation. It will be remembered that basic tenet of bourgeois humanism has always been the 'sovereign individual standing above the masses."

A Ivashchenko in Soviet Literature No. 10-1951 P. 110.

ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধের পর আঁদ্রে জিদের "ব্যষ্টি ও সমষ্টি" প্রবন্ধটি আছে। এই প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অধিবেশনে জিদের বক্তৃতা। যারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং পরে প্রগতি শিবির ছেড়ে চলে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঁদ্রে মালরো, অল্‌ডাস হাক্সলে, জন ষ্ট্রেচি এবং জিদ নিজে। অথচ জিদ এই প্রবন্ধে অনেক ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু জিদের মধ্যেকার বিরোধও এই প্রবন্ধে আছে। সেই হিসাবে জিদের এই প্রবন্ধ আজ মূল্যবান। জিদ প্রথমে বলছেন যে, তিনি প্রখরভাবে ফরাসী থেকেও আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং এইভাবে তিনি একান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। "প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজম আমার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সহায়ক। আমি সব সময় বলেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেই সমষ্টিকে প্রকৃষ্টভাবে সেবা করতে পারে।

এরই সঙ্গে আজ করোলারী হিসাবে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে যে, এক কমিউনিষ্ট সমাজেই ব্যক্তি ও তার বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ হতে পারে।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যা সত্য জাতি সম্বন্ধেও তাই—এই কথা বলে তিনি সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সোভিয়েট সরকারের শ্রদ্ধার বাস্তব পরিচয় আছে। এর পর ফরাসী ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের ক্রটি দেখাতে গিয়ে তিনি যথার্থই বলেছেন" এ সাহিত্যের গ্রন্থকার, দর্শক বা পাঠক এবং অভিনেতৃবর্গ (উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র) সকলেই অভাব থেকে দূরে থাকেন। সাহিত্যিকের কাজ এখানে অর্থবানদের কাহিনী রচনা করা : আর লেখক যদি অভাবগ্রস্ত হন তবে তাঁকে সেকথা চেপে রাখতে হবে।" ফরাসী সাহিত্য জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপ কৃত্রিম ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল—তার বিবরণ দিতে দিতে তিনি বলেন : "ছাচ এবং সম্ভবতঃ রূপের প্রতি অত্যধিক প্রীতির জন্যে ফরাসী সাহিত্য অনবরত কৃত্রিমতার রাজ্যে আকৃষ্ট হয়েছে। ক্লাসিক যুগের সাহিত্যের কৃত্রিমতা নষ্ট করার জন্যে রোমান্টিসিষ্ট আন্দোলন যে-চেষ্টা করেছিল তাতে আরো বেশী কৃত্রিম সাহিত্যেরই সৃষ্টি হয়েছিল।"

এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে—একথা বলতে গিয়ে জিদ কি রকম স্ববিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক উক্তি করেছেন—তা এখানে দেখতে পাবেন : 'কৃত্রিম আবেষ্টনিতে লালিত সংস্কৃতির দিন চলে গেছে ; যদি জাতীয়তাবাদীরা তাকে সমর্থন করেন তবে ভালই ; তাতে আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি যে, সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষকেরা আজ তাঁদের দিকে নেই, তারা বিপক্ষ শিবিরে রয়েছে। অবশ্য আমি বলতে চাই যে, এই সংস্কৃতিকে আক্রমণ করতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নই—তার দানের আমি প্রশংসা করি। অতীতকে অস্বীকার করা নিষ্ফল ও হাস্যকর। এমন কি একথাও আমি স্বীকার করব যে, সে সংস্কৃতির উপক্রমনিকারূপে একটা মিথ্যাচারী সংস্কৃতি প্রথমে নিশ্চয়ই আসবে (? ? সুপ্র) তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই হোক, আমাদের ঈপ্সিত কমিউনিজমে পৌছবার পথে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা আবশ্যকীয় পর্যায়। কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা এই অতীত সংস্কৃতির বিরোধিতা করেই শুধু বিকশিত হতে পারে। এই সংস্কৃতির জের টেনে আর সে বাড়তে পারে না।...আমার বিরোধিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়—তার ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে।"

এরপর তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে সংস্কৃতির শত্রু আজ ফাশিস্তরা, নাৎসীরা, তাঁদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা।

"যে সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"If I, a writer, an artist, a critic or a party worker do not count on being understood by my contemporaries for whom then do I live and work ?"—A. Zhdanov.

প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা জীবিতকালে বেশী পাঠক পান না—এর কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে কপট সমাজ জনসাধারণকে এমনভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলিত, এমন পশুবৎ ও অজ্ঞ করে রেখেছে যে জনগণ নিজেরাই জানে না, তারা আমাদের কাছে কি বলতে চায়, যদিও জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে পরিচয় হলে যে কোন উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিই লাভবান হতে পারে। সুতরাং জিদের মতে তাঁর মত যারা বুর্জোয়া সমাজ থেকে প্রগতিশীল লেখক হয়েছেন তাঁদের পক্ষে নিজের শ্রেণীর কাছে কথা বলা অসম্ভব—কারণ তাঁদের ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা করতে হবে। আর জনগণের কাছেও কথা বলা অসম্ভব। "যতদিন জনগণ আজকের মত অবস্থায় থাকবে, তারা যা হতে পারে, তাদের যা হওয়া উচিত এবং আমরা সাহায্য করলে তারা যা হবে তা যতদিন তারা না হয়, ততদিন তাদের কাছে কথা বলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে ভবিষ্যতের অজ্ঞাত পাঠকের জন্য লেখা।"

"এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেখা যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে একবার যদি আমরা মানব সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তবে আমাদের কথা তার কাছে পৌঁছুবেই!' (আমাদের দেশে একদল মার্কসবাদী লেখক ও সম্পাদক—অনেকেই এখনো জিদের স্বপক্ষে যুক্তি দেন—তাঁদের লেখার অবোধ্যতা সম্পর্কে পাঠকদের অভিযোগের উত্তরে সবিনয়ে পাঠকদের আরো লেখাপড়া শিখতে অনুরোধ করেছেন—সু.প্র)। মস্কোর লেখক সম্মেলনে শ্রমিকরা লেখকদের কাছে তাদের জীবনের কথা লিখতে অনুরোধ করায় পীড়া বোধ করে জিদ বলেছেন, দর্পণ হওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়—অন্তত সমগ্র উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য তিনি শুনে খুশী হয়েছেন যে বুখারিন বা গোর্কী ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। সোভিয়েটে পুশকিনের বই পুনর্মুদ্রণ ও শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করার জন্য তিনি তাদের সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিকতা দেখে খুশি। কিন্তু ঐ সব

রচনায় কি কি জিনিষের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত তার ওপর বেশী জোর দেওয়াতে তাঁর আপত্তি। কারণ "যে কোন রচনা শিক্ষা দেয় সম্পূর্ণ তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা।" জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখাকে জিদ যেমন আপত্তির কারণ বলে মনে করেন তেমনি তাকে শিক্ষা দেওয়াতে তাঁর আপত্তি। কারণ তিনি যে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য লিখছেন যারা তার সাহিত্যের সৌন্দর্য্যগুলোর মারফতে শিক্ষা পাবে। তা ছাড়া সোভিয়েট রাষ্ট্র ভাল হলে কি হবে শেষ পর্যন্ত সে যদি সরকারী শিক্ষার নামে আবার সংস্কৃতিকে শৃঙ্খলিত করে? কিন্তু জিদ এ পাপ চিন্তাকে মনে স্থান দিতে নারাজ? তাই পরের লাইনেই বলেছেন: "শুধু কমিউনিজমের শত্রুরাই কমিউনিজমের মধ্যেই সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার অভিপ্রায় দেখতে পায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে......প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।"

এই প্রবন্ধে জিদ সাহিত্যের সমস্যা থেকেও কমিউনিজমকে বোঝাবার চেষ্ট অনেক বেশী করেছেন। বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সাম্যবাদ তাঁদের পক্ষে প্রতিকূল নয়। সর্বহারা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে কস্‌মোপলিটানিজম, শ্রেণী সংঘর্ষের পরিবর্তে আবর্তনবাদ (মিথ্যাচারী সমাজের ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকতার পক্ষে যুক্তি) এবং বর্তমানে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বের পরিবর্তে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি নেতৃত্বের (সে নেতৃত্ব আবার তাদের জীবিত কালে জনসাধারণের বোধগম্য হবে না!) সাহায্যে কমিউনিজম বোঝাতে গেলে যে বিড়ম্বনা হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ আঁদ্রে জিদ স্বয়ং। তাঁর মহামূল্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রগতি শিবির থেকে সরে পড়তে হয়েছিল।

জিদের বক্তৃতার পর ই. এম. ফর্ষ্টারের বক্তৃতা আছে। ফর্ষ্টারের বক্তৃতার বিষয় ছিল ইংলণ্ডের স্বাধীনতা। ফর্ষ্টার কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন না হলেও প্রথমেই এমন একটি কথা বলেছেন—যা এক হিসাবে জিদের তুলনায় প্রগতি-শীল। তিনি প্রথমেই বলেছেন ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ইংরেজদের জন্য—তার সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়। জিদ ফরাসীদেশের সাহিত্যিক এবং সে দেশেরও অনেক সাম্রাজ্য আছে—যার শোষনের ভিত্তিতে ফরাসী দেশের অনেক "সুকুমার কলার" বিকাশ সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জিদ একবারও ঐ বক্তৃতায় সে কথায় উল্লেখ করেন নি। ফর্ষ্টার তারপর বলেছেন: ইংলণ্ডে স্বাধীনতা তারাই ভোগ করে যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে। আমাদের

লেখকদের আত্মপ্রকাশের স্বর্গাধিকার যত অমূল্য হোক, সরকারী মুষ্টিভিক্ষার উপর যার দিন-গুজরান, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো তার পোষায় না। এরপর ফর্স্টার অবশ্য নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিরন্ন ও নিরাশ্রয় যারা তারা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও বিচলিত নয়। একথা স্বীকার করতে না চাওয়া নিছক ভণ্ডামি। (ফর্স্টার যা স্বীকার করতে পারেন নি তা হল নিরন্নরা তাঁদের গিল্টি করা সংস্কৃতি সম্পর্কে তত উৎসাহী নয়)... ..."যুদ্ধের সম্ভাবনা বাদ দিলে ফ্যাশিজমকে ভয় করার কারণ তেমন নেই, আর যুদ্ধ একবার বাধলে যে-কোন অঘটন ঘটবে তা যুদ্ধের দেবতাই জানেন। আমদের শত্রুরা আসবে অন্য পথ দিয়ে, শান্তশিষ্ট ভালমানুষটি সেজে, আমি তাদের নাম দিয়েছি ফেবিও ফ্যাসিষ্ট। ফর্স্টার এই প্রসঙ্গে পরোক্ষে লেবার পার্টিকে বেশ এক হাত নিয়েছেন। কিন্তু শেষ পযন্ত তিনি বলেছেন যে ইংলণ্ডে "লেখকদের সৃজন শক্তি ব্যাহত হচ্ছে যৌন প্রসঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারছেন না বলে; আমি চাই একথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যে ঐ প্রসঙ্গটির গভীর বিশ্লেষণ ও লঘু বিবরণ দুইই আবশ্যক।" ফর্স্টারের বক্তৃতার শেষটি বিশেষভাবে করুণ। "আর একবার যুদ্ধ বাধলে মিঃ অলডুস হাক্সলে কিংবা আমার মতো ব্যক্তিবাদী ও উদারপন্থী লেখকদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়েছে এবং আগামী যুদ্ধও আসন্নপ্রায়।" যুদ্ধ অনিবার্য ঘোষণা করে তিনি বলেছেন: "অবস্থা বখন এইরূপ তখন আমার ও আমার সমানুভব ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যের কাজ। আমাদের মরচে পড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে টুকিটাকি এটা ওটা করে যেতে হবে যতদিন না সভ্যতার ইমারত শুদ্ধ ভেঙে পড়ে। ভেঙে যখন পড়বে, কিছুই আর কোন কাজে লাগবে না, তার পরে—যদি 'তারপরে' বলবার কিছু থাকে, সভ্যতার নব অভিযানে যারা এসে যোগ দেবে, তারা নতুনশিক্ষণ, নতুনমন্ত্র নিয়ে আসবে।" ফর্স্টারের এই উক্তির পর মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আজ মনে হয় ফর্স্টার নৈরাশ্যবাদী হলেও অনেক বেশী আন্তরিক—তখনকার দিনের ষ্টিফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতি বামপন্থী লেখকদের তুলনায়—যারা যুদ্ধ বাধলেই প্রগতিশিবির ত্যাগ করেছেন এবং এখন আমেরিকার পক্ষপুটে বিরাজ করছেন। এদেশে এর একমাত্র তুলনা মেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব

বসুর সঙ্গে। সুধীনবাবু প্রগতি সম্মেলনের সভাপতিবৃন্দের একজন হয়েও বলেছিলেন যে তিনি প্রগতি লেখক নন—এবং নিজের সম্পর্কে ঐ ধরনেব নৈরাশ্যবাদী উক্তি করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু ১৯৪২ পর্যন্ত প্রগতি-লেখক সংঘে নাম রেখেছিলেন, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েটের পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন—কিন্তু আজ তিনি ছোটেন ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের সঙ্গে বম্বের আমেরিকা আয়োজিত 'সংস্কৃতির স্বাধীনতা' সম্মেলনে।

ফর্ষ্টারের প্রবন্ধের পর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "সাহিত্যে প্রগতি" প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডঃ দত্তের লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করার পর আমার যা সামান্য বক্তব্য আছে তা বলব। প্রগতির অর্থ কি তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখছেন ঃ

"আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা সাধারণত সনাতনপন্থী; অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহাকেই সাহিত্যচর্চার পরম লক্ষ্য মনে করেন।" তারপর তিনি স্বীয় মাতৃভাষায় লিখিত যাবতীয় পুস্তককে সাহিত্যের অন্তর্গত করার দাবী করে বলেছেন ঃ "এদেশে সাধারণের নিকট এখনও সাহিত্যের অর্থ কাব্য, নাটক ও অলংকার।" বিদেশের সাহিত্যকে যে তিনটি স্তরে অর্থাৎ আইডিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম ও রিয়ালিজমের স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে তার উল্লেখ করে ডঃ দত্ত প্রগতিশীল লেখকদের জন্য, উপরন্তু প্রাচীন যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ, বুর্জোয়া যুগ ও প্রলেটারিয়ান যুগের সীমানা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ডঃ দত্ত সাহিত্য কাকে বলে এবং তাব ভাব প্রচারের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ভারতীয় সাহিত্যের উপর শেষোক্ত বিভাগ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক আলোচনা করেছেন। ঋগ্‌বেদ থেকে কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকাদি উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'এই যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া আজও আমরা গৌরব বোধ করি, তাহার স্বরূপ কি? বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই নিরূপিত হইবে ঃ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য, কুল ও বংশের মহিমা, স্বামীধর্ম, সামন্ত-রাজাদের অস্তিত্ব, বাজারে শিক্ষিতা গণিকার প্রাদুর্ভাব, গোলামশ্রেণীর অস্তিত্ব, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা, স্ত্রীলোক আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিতা (যদিচ বৈদিক যুগের পর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন)। এই সব পুস্তকে সামন্ততান্ত্রিক যুগ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। সেইজন্য তাহাতে জনের ও গণের সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। কেবল রাজা-রাণী, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা ও রাজকন্যার প্রনয়িনী। এই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক

যুগের ইতিহাসে একটা ঘটনা দ্রষ্টব্য যে, ভাস হইতে হর্ষবর্দ্ধন পর্যন্ত সকলেই এক ছাঁচে নিজেদের নাটক রচনা করিয়াছেন। গল্পের বেশী বাহুল্য নাই। যাহা আছে ঐতিহাসিকরা বলেন তাহা সকলেই গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "বৃহৎকথা" হইতে Plagiarise করিয়া লিখিয়াছেন। এইসব পুস্তক একটি শ্রেণীর বিষয় ক্রমাগত বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া সব পুস্তকই এক ছাঁচে ঢালা।"

ব্রাহ্মণাধিপত্য ও বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্যের যে সময় প্রচার চলছিল সেই সময় "নাগরকগণ" লোকায়তবাদ, নাস্তিকতা, বাস্তবিকতা ও সুখভোগবাদ প্রচার করে। প্রাচীন হিন্দুর সুখ-সমৃদ্ধির কালে যখন নানা সমুদ্র বহন করে হিন্দুর অর্নবপোতগুলি নানাদেশ থেকে সুক্তার বদলে মুক্তা, জিরার বদলে হীরা আনত তখন সেই সব অর্নবপোতদের মালিকদের মধ্যে 'নাগরিক শ্রেণী' উদ্ভূত হয়। বাৎসায়ন বলেন, এই নাগরকগণ লোকায়তধর্মের অনুরাগী হয়। ডঃ দত্ত এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন: আসল কথা, দেশে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সামন্ততন্ত্রী আভিজাত্যের পাশে একটা বুর্জোয়াশ্রেণী বিবর্তিত হয়। এই শ্রেণীর নাগরিকগণ পাশ্চাত্য দেশের হালফ্যাশানের ধনকুবেবগণের ন্যায় জীবন যাপন করিত।" ডঃ দত্ত ঐ শ্রেণীকে প্যারীর বুলেভার্ডিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন:—

"ভাস ও মৃচ্ছকটিক নাটকের চারু দত্ত তাহারই একজন প্রতীক, যদিচ ধনহীন।" পুরাতন সাহিত্যে গণে'র সন্ধান ডঃ দত্তেব মতে প্রধানত বৌদ্ধ অবদান ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায়। গণে'রা সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়। এরপব তিনি তান্ত্রিক মতের সম্পর্কে বলেছেন যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম সামাজিক হিসাবে বর্ণাশ্রমের বিপক্ষে যায় নি। এই সম্পর্কে তিনি রাজশেখরের "বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা" ও ভবভূতির "মালতীমাধব" নাটকের উল্লেখ করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্রাহ্মণদের National chauvinist & Imperialist রূপের বর্ণনা শেষ করেছেন। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক হাজার বছরেব ইতিহাস সংক্ষেপে বলার সময় তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে দাসজীবি গোপালের প্রতিষ্ঠিত পালবংশের রাজত্বেব কথা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ নেই—এক ছড়া বা গীতিতে ছাড়া। ব্রাহ্মণেরা মুছে দিয়েছে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত"—এর স্থলে শিবের গীত হয়ে গেছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে বাংলায় বৌদ্ধকৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন ব্রাহ্মণেরা ধ্বংস করেছে, না হয় রূপান্তরিত করেছে। এবং এই হল

ধর্মের আবরণে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম। ডঃ দত্ত বলেছেন যে এই সময় গণশ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায় কেবল 'সূর্যের পাঁচালী', 'শূন্য পুরাণ' ও 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' প্রভৃতির মধ্যে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'ধর্মমঙ্গল'কে বাংলার এপিক বলে গণ্য করা উচিত। এই পুস্তকে জানা যায় যে সম্রাট ধর্ম্মপালের সেনাপতি লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন কালু ডোম, ডোম ইন্দ্রমেটে গৌড়ের শহর কোটাল। এর পর তিনি মনসার ভাসানের থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দেখান, উচ্চ শ্রেণীর শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে গণশ্রেণীর ধর্ম্মের কি ধরণের সংঘর্ষ হচ্ছিল। ডঃ দত্ত আরো বলেছেন যে মুসলমান রাজারা বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং মোগল শাসনের প্রচলনের সঙ্গে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে যায়। এই যুগের কবি কঙ্কণের চণ্ডীকে তৎকালীন বাংলার অত্যন্ত বাস্তববাদী ছবি বলে অভিহিত করে ডঃ দত্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে সামন্ততন্ত্রের অবসান হল—কিন্তু কবি-কঙ্কন সংস্কৃত সাহিত্যের খাত পরিত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি ভারত-চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" মধ্যেও সেই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ছাপ দেখতে পেয়েছেন এবং জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Oswald Spenglar এর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন গ্রীক ও হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীনেরা space এবং time অগ্রাহ্য করেছেন।

ডঃ দত্ত ইংরেজ শাসনের যুগে এসে বলছেন, 'ইংরেজ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী করেছে—তারা সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরাও নাকি সামন্ত-তান্ত্রিক মোহ কাটাতে পারে নি। তিনি বঙ্কিম সাহিত্যকে পরোক্ষে কটাক্ষ করে বলেছেন: এই যুগের লেখকরা ভুলে যান যে বর্তমান কালের বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বা মোগল আমলের ভূস্বামীর স্থানে আর কেউ নেই, আর আজকালকার জমিদারেরা ইংরাজের জন্য প্রজার কাছে খাজনা আদায়কারী এজেণ্ট মাত্র।'

বাংলা সাহিত্যে কাল ব্যতিক্রমের উল্লেখ করে ডঃ দত্ত বলেছেন যে, যদিও ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত,—কিন্তু ইংরেজ শাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হয়েছে এবং যারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দী তাদের বা শ্রমিক-কৃষকদের অস্তিত্বের চিহ্ন সাহিত্যে কই? এই প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'কে তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং বাংলায় একটা বুর্জোয়া সাহিত্য গড়ে উঠছে না কেন তার কারণ স্বরূপ বলেছেন বাংলার সমাজ এখনো সম্পূর্ণভাবে

'বুর্জোয়াত্ব' প্রাপ্ত হয় নি। বুর্জোয়ারা প্রাচীন আইন, সামন্ততান্ত্রিক বাধা নিষেধ, সমাজ-বন্ধন ছেদ করে সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়তে চায়। কিন্তু ডঃ দত্ত বলছেন 'পনরক্ষা', 'হালদার গোষ্ঠী', 'চোখের বালি' প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে যে এসব পুস্তকেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিধ্বনি রয়েছে। এর পর ডঃ দত্ত 'কল্লোল যুগের' কথা পরোক্ষে এনে প্রত্যক্ষভাবে 'শেষ প্রশ্নের' কথা তুলে বলেছেন: 'তবে হালে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে, তাহা একটি বুর্জোয়া সাহিত্যের অভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা কেবল 'ইডিপাস কম্‌প্লেক্স' অনুসরণ করিয়াই পরিশ্রান্ত। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন আদর্শই দিতে পারিতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—গণের তো নয়ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন সম্বন্ধের কাহিনী।...শুধু যৌন সম্বন্ধের বিচার করিলেই পুরুষ ও নারীর শেষ প্রশ্নের সমাধা হয় না। আবার নারীর ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্তন করাই তাহার সামাজিক "শেষ প্রশ্ন" নয়। ইহা কোন্ সমাজের আদর্শ তাহা জানি না। অন্তত সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজে তাহা নয়—ইহা নিশ্চিতভাবে জানি। এই জন্য এই সাহিত্যকে পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। খুব সম্প্রতি আসিয়াছে একটি নূতন ধরণের সাহিত্য ও তাহা গণশ্রেণীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করে।...পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণসাহিত্য হয় না। গণশ্রেণীর দুঃখ, দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার World View নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণ-সাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থনৈতিক কারণে একটি গণ আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটি সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না—ইহাও একটি কাল ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে লোক সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেই দিন একটি জীবন্ত গণসাহিত্য উদ্ভূত হইবে।...মোটের উপর দেখি আমাদের সাহিত্য একদিকে সনাতনী খাতে প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুতভাবে বৈদেশিক ভাব আসিতেছে। আমার মতে উভয়েই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে realism-এর অভাব অত্যন্ত রহিয়াছে। আমরা space time-কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন লেখক প্রয়োজন যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও পরিবেশন করিবেন, যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কাল ব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

সাহিত্যে প্রগতি আনিতে হইলে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সমাজ যথার্থই অগ্রগতিশীল হয়—তাহাই প্রগতি লেখকদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।”

“প্রগতির” সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দত্তের প্রবন্ধকে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত তার অনেকখানি উদ্ধৃত করেছি দুটি কারণে। প্রথমত সে যুগে এ ধরণের লেখা আর কারো কলম দিয়ে বার হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ডঃ দত্ত ‘প্রগতির’ অন্য সব লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র—তাঁর বিচিত্র রাজনৈতিক ও পণ্ডিতি জীবনের জন্য। ডঃ দত্ত অগ্নিযুগের নেতাদের মধ্যে বোধহয় সর্বপ্রথম যিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হন—এবং কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ না দিয়েও বাংলা দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের ওপর নানা প্রভাব সৃষ্টি করেন। আবার তিনি পণ্ডিতরূপেও পরিচিত। এই লেখার বেশ কিছুকাল পরে তিনি “সাহিত্যে প্রগতি” বলে একটি বইও লিখেছেন। আপাতত সে বই সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে আমার মন্তব্য কেবল এই প্রবন্ধের ওপর রাখবো। পূর্বেই বলেছি যে “প্রগতি” সংকলনের মধ্যে এই প্রবন্ধ সব থেকে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক আলোচনায় তিনি “প্রগতি” সাহিত্য কি তা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা ’.রছেন, সাহিত্য বিচারের সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অর্থ-নৈতিক বিকাশের সম্পর্ক অন্য প্রবন্ধের তুলনায় অনেক পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন এবং সমাজের অগ্রগতি যে প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য সে বিষয়ে দৃঢ় ঘোষণা জানিয়েছেন। ডঃ সেনগুপ্তের রসবিচার বা অধ্যাপক ধূর্জটি মুখো-পাধ্যায়ের ডায়ালেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজমের বদলে মেকানিষ্টিক মেটিরিয়ালিজমের বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশের তুলনায় অনেক বেশী বাংলা সাহিত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন যা যে-কোন সাহিত্য-রসিককে নতুন পথে চিন্তা করার সূত্র ধরিয়ে দেবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি মন্তব্য গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন ব্রাহ্মণের অত্যাচার বলে একটা যুগের সমস্ত সাহিত্যকে যেভাবে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন তা মার্কসবাদী সম্মত নয় বলে আমার ধারণা। কারণ যে আবশ্যকীয় সামাজিক শ্রম বিভাগের ফলে (Division of labour) ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তাকে শুরুতেই ব্রাহ্মণের সাম্রাজ্যবাদ বলে নস্যাৎ করা ডঃ দত্তের মত মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে উচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ শ্রম-বিভাগ ম্যানুফ্যাকচারিং যুগে এবং ধনতান্ত্রিক যুগেই

প্রধানত জনগণের অজ্ঞতা সৃষ্টির কারণ হয়েছে। ব্রাহ্মণের আধিপত্য যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক অবস্থায় সামাজিক অগ্রগতির পথ রোধ করেছিল একথা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থার কোন পরিচয় না দিয়ে কেবল শেষের দিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে সে যুগের গোটা সাহিত্যকে নস্যাৎ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। দ্বিতীয়ত ফ্যাসিষ্ট দার্শনিক স্পেঙলারের মত উল্লেখ করে তিনি হিন্দু ও গ্রীকদের Space-time বোধের অভাবের যে উল্লেখ করেছেন তাও মার্ক্সবাদী-সম্মত নয়। তিনি নিজে এই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন মোগল শাসনের প্রচলনের সংগে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে যায়, আবার প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনো সামন্ত-তান্ত্রিক। ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে স্থির বিচার না করে তিনি সাহিত্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাল-ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছে। এবং কেন এদেশের সাহিত্যে ইউরোপের বুর্জোয়ার দেখা মেলেনা তার জন্ত অবাক হয়েছেন। "To study the connection between intellectual and material production, it is necessary above all to deal with the latter not as a general category but in a definite historical form. Thus for example, the kind of intellectual production corresponding to capitalist methods of production is different from that corresponding to medieval methods of production. If material production is not grasped in its specific historical form it is impossible to understand the concrete nature of the intellectual production corresponding to it and the interplay of both factors. If this is not done—the result is an absurdity."

"Furthermore, some definite form of material production there results, first, a definite structure of society and secondly, definite relationship of men to nature. Their state forms and intellectual outlook are determined by both. So is the nature of their intellectual production.

(K. Marx—'Literature and Art.' p. 27)

গ্রীস এবং তার আইন সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেল্সের আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঙ্গেল্স বলছেন :

It was slavery that first made possible division of labour between agriculture and industry on a considerable scale ; —Without slavery no Greek art and science. "It is clear that so long as human labour was still so little productive that it proved but a small surplus over and above the necessary means of subsistence, any increase of the productive forces, extenison of trade, development of the state or beginning of art and science was only possible by means of greater division of labour and the few privilaged persons directing labour……and at a later stage, occupying themselves with art and science…In the historical conditions of the ancient world, and particularly of Greece, the advance to a society based on class antagonism could be accomplished in the form of slavery.

গ্রীক ও হিন্দু সাহিত্যে কালব্যতিক্রম সম্পর্কে ডঃ দত্ত যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং ঋগ্‌বেদপ্রমুখ পুরাতন সাহিত্যে দানস্তুতি, দশরাজার যুদ্ধ, ইন্দ্রের সম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের ক্রিয়াকলাপ যে ভাবে আলোচনা করেছেন—সে সম্পর্কে মার্কসের আর একটি বক্তব্য বলে আমি ডঃ দত্তের উপর আলোচনা শেষ করতে চাই। মার্কস্ বলেছেন—

" It is well known that certain periods of highest development of art stand in no direct connection with the general development of society, nor with material basis and the skeleton structure of its organisation. Witness the example of the Greeks as compared with the modern nations or even Shakespeare. As regards of certain forms of art, as, e.g., the epics it is admitted that they can never be produced in the world-epoch making form as soon as art as such comes into existence; in other words that in the domain of art

certain important forms of it are only possible at a low stage of its development···It is a well known fact that Greek mythology was not only the arsenal of Greek art, but also the very ground from which it sprang, Greek art presupposes the existence of Greek mythologyt, i.e., that nature and even the form of society are wrought up in popular fancy in an unconciously artistic fashion. ”

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ দত্ত যে রকমভাবে হিসাব করেছেন তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায় না—বরং যান্ত্রিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডঃ দত্ত ভারতে সামন্ততন্ত্র, বুর্জোয়াতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা কাল ও সামাজিক অবস্থাব হিসাবে ঠিকমত বিচার করেন নি বলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপযুক্ত সমালোচনা করতে অক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের লেখার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্বল জায়গাগুলি তুলে ধরে তাঁদের সম্পর্কে যথাযথ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের দ্বারা তাঁদের জনপ্রিয়তার কারণ দেখানো সম্পর্কে নীরব রইলেন। ডঃ দত্তের পক্ষে এ মারাত্মক ত্রুটি। কারণ তাঁর স্থান অন্য সকলের উপরে। ডঃ দত্ত গত সংখ্যার "অগ্রণী"তে মার্কসের ভুল ধরতে গিয়ে আমেরিকার পণ্ডিত বুর্জোয়া লোই-এর যুক্তি উল্লেখ করেছেন। আমরা যারা ডঃ দত্তকে নানা কারণে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাদের কাছে ডঃ দত্ত কর্তৃক মার্কসের সমর্থনে Bloomfield ও Oswald Spengler-এর উল্লেখ যেমন বিভ্রান্তিকর তেমনি আশ্চর্যজনক মার্কসের ভুল ধরার কাজে মার্কিনী পণ্ডিতের উল্লেগ। কারণ ডঃ দত্ত নিশ্চয় জানেন এই মার্কিন ভদ্রলোককে বুর্জোয়া পণ্ডিতরাও মানেন না।

এর পর আর দুটি প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আছে। একটি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং অপরটি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর। বিজয়লালবাবুর প্রবন্ধ "প্রগতি সাহিত্যের রূপ" বাহ্যতঃ খুবই প্রগতিশীল কিন্তু অত্যন্ত অগভীর। যেমন বলা আছে যে প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তবের উপর। বাস্তবের নিষ্ফলতার মধ্যে প্রগতি সাহিত্যের পূজারীর আনন্দ নেই! প্রগতি সাহিত্য বাস্তবকে ভেঙে তাকে নতুন রূপ দিতে চায়, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সর্বনেশে বিচ্ছেদ আর্টকে প্রাণহীন করেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার অভিযানে সাহিত্যিককে অগ্রসর হতে হবে। কি হবে আর্টের কল্পলোকে বিচরণ করে যদি কোটি কোটি মানুষের জীবনের উপর

দুঃসহ দুঃখ জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকে ? সে আর্টের মূল্য কি, যা পুরাতন বুর্জোরা সমাজকে চূর্ণ করেতে সাহায্য না করে ? প্রগতি সাহিত্যকে নূতন যোদ্ধার রূপ নিতে হবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের শ্মশান-ভস্মের উপরে শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে……ইত্যাদি। বিজয়লালের প্রবন্ধ প্রায় সবই প্রগতির ফেনা—তাই তা না থিতিয়েছে আমাদের জন্য, না তাঁর জন্য। প্রগতি সম্পর্কে বাগাডম্বর যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়—তার পরিনতি বিজয়লাল স্বয়ং। "সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা" প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ অবাস্তব এবং সমস্যা সমাধানের পক্ষে অপারগ কল্পনার বিকারকে টেকনিক বা আংগিক আখ্যা দিয়ে সাহিত্যের নামে চালাবার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য, বুদ্ধি ও কল্পনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির যাত্রাপথে মানুষের মিছিলের সঙ্গে চলবে এই আশা তিনি পোষণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত যুক্তির সাহায্যে সুস্থ কল্পনার স্থান নির্দেশ করেছেন।

এছাড়া 'প্রগতি' সংকলনে যে সব গল্প আছে তার বিস্তৃত আলোচনা আজ করে লাভ নেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "সই", বিধায়কের "ঠুন্‌কি' (একটি মুরগীর গল্প), প্রেমেন্দ্র মিত্রের "কল্পনা"য় গল্পগুলিতে গরীব লোকের দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা দেখিয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে। "ঠুন্‌কি" প্রায় "মহেশের" মত কিন্তু 'মহেশ' ভাগচাষী বা ক্ষেত মজুরের যে পরিবেশ এবং সামাজিক অবস্থা বোঝা যায়, এতে তা নেই। প্রেমেনবাবু "কল্পনায়" একটি খালাসীর জীবন দেখিয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে ফেলে জাহাজে ফিরে দেশ ছেড়ে যেতে হবে বলে সে আত্মহত্যা করল। এই ঘটনা সৃষ্টির সুযোগ নেওয়া ছাড়া "খালাসী" নাম দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রকৃতি" গল্পটি প্রকৃত-পক্ষে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। এই সব লেখকরা এতদিন মধ্যবিত্তকেই সর্বগুণের আধার বলে মেনে এসেছেন। মানিক বাবু এই গল্পে প্রমাণ করেছেন যে টাকা থাকা যেমন খারাপ, না থাকাটাও তেমনি খারাপ। তবে টাকাওয়ালা লোকদের ঘৃণা করেও তাদের সঙ্গে বসে ভদ্র ব্যবহার কবার অভিনয় করা সম্ভব। কিন্তু গরীবের সঙ্গে সেটুকুও সম্ভব নয়। কারণ দারিদ্র্য যে তাদের বহিরাবরণকে পর্যন্ত নোংরা করে ফেলেছে। আর এই নাকি মানুষের প্রকৃতি !

গল্পগুলির মধ্যে প্রবোধ সান্যালের "আগ্নেয়গিরি" সে যুগে কেন আজকের যুগেও প্রগতিশীল বলে গণ্য হবে। একটি সংবাদপত্র, তার স্বদেশী মালিক,

প্রগতিশীল সম্পাদক আর সেখানকার কর্মচারীদের অবস্থা নিয়ে লেখা এই গল্প। স্বদেশী ম্যানেজিং ডিরেক্টার কিভাবে চাপ দিয়ে ধর্ম্মঘটে উদ্যত কর্মীদের মাইনের হার কমিয়ে দিলেন এবং যে সম্পাদক ওদের মাইনে যাতে না কমে তার জন্য চেষ্টা করছিলেন তাকে বুঝিয়ে দিলেন: মিথ্যে গরীবদের জন্য চেষ্টা করা—বিপদ দেখলে তারা কেটে পড়বে। কর্মচারীদের এই দুর্বলতায় সম্পাদক চাকুরী ছেড়ে দিলে এই আশায় যে, "এরা একদিন দাঁড়িয়ে উঠবে, .একদিন আনবে প্রচণ্ড বিপ্লব; এদের সকলের উন্মত্ত অসন্তোষ ঝড় তুলবে ওদের প্রাসাদে প্রাসাদে, কঙ্কালসার নিরন্ন দুর্বলের বুকের আগুন চল্‌তি সমাজকে ছারখার করে দেবে।" সংক্ষেপে এই হ'ল বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুক্তফ্রণ্টের সৃষ্টিশীল ক্রিয়া কর্মের পরিচয়।

"প্রগতি" সংকলনের পর যে সব কাগজপত্র যোগাড করতে পেরেছি—তা তা হল কলকাতা প্রগতি লেখক সম্মেলন সম্পর্কে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত "নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার"-এর প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকা থেকে বাংলা ও ভারতীয় প্রগতি লেখক আন্দোলনের কয়েকজন মুখপত্রের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ শুরু করার আগে আমি আর একটি প্রবন্ধের আলোচনা করব—যার লেখকের সম্পর্কে আমাকে ১৯৪৩-৪৮ সনের ইতিহাস বার বার উল্লেখ করতে হবে।

প্রবন্ধটির নাম "ভবিষ্যতের শিল্প ও সাহিত্য"। লেখক হচ্ছেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এবং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসের 'পরিচয়ে'। আমি পাঁচুবাবুর কাছ থেকে শুনেছি এই প্রবন্ধ লেখা হয় বক্সা বন্দী নিবাসে আরো কয়েক মাস আগে। অর্থাৎ 'প্রগতি' সংকলন প্রকাশের প্রায় বছর দেড়েক আগে।—কেন পাঁচুবাবুর প্রসঙ্গ আমি আলোচনা করছি তার কারণ বলছি।

পাঁচুবাবু এবারের নির্বাচনে শ্রীরামপুর থেকে কমিউনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সভ্য এবং এক সময়ে সম্পাদকও ছিলেন। বৃটিশ আমলে তিনি একবার হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে পালান। ১৯৩০ সালে যখন মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহী মেয়েদের ওপর পুলিসের অকথ্য অত্যাচার হচ্ছিল তখন তিনি গান্ধীজীর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের" নীতির মধ্যে থেকে দিনের পর দিন যেভাবে নিজের শরীর দিয়ে এই অত্যাচারকে থামাবার চেষ্টা করেছিলেন—তাতে শত্রু-মিত্র সকলের বিস্ময় অর্জ্জন করেছিল।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন। এবং নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘে যখন মাসিক ভাতা দিয়ে সর্বক্ষণের শিল্পীদল গঠন করা হ'ল তার শুরু থেকেই পাঁচুবাবু গণনাট্য আন্দোলনের কমিউনিষ্ট কর্মীদলের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কাজ করেছেন এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে এই দায়িত্ব বহন করেছেন। গণনাট্য সংঘের উন্নতির ইতিহাসের যুগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 'পিপ্‌লস রিলিফ কমিটির'ও তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং এই সব কারণে বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের (কলিকাতাবাসী) কাছে থেকে সেই সময়কার বাংলার দুর্গত জনসাধারণের অবস্থা জানাবার জন্য তিনি কয়েকবার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের ৭৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট (বর্তমানে লেনিন সরণী—লেখক) অফিসে লেখকদের বৈঠকে আসেন ও লেখার মাল-মশলা সরবরাহ করেন। প্রগতি লেখক সংঘের কমিউনিষ্ট কর্মীদেব বৈঠকে তিনি না এলেও তাঁর প্রভাব ওখানকার প্রধান সংগঠকদের উপর ছিল। কাজেই তাঁর রাজনৈতিক মতামত ছাড়াও সাহিত্যিক মতামত নিশ্চয় আলোচনাযোগ্য। তা ছাড়া প্রগতি লেখক সংঘের কয়েকজন পুরাতন কর্মীদের খুব কম লোকই জানতেন যে পাঁচুবাবু সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে অত্যন্ত গভীব ভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর ১০।১২ বছর আগেকার অনেক সিদ্ধান্ত আজো বহুলাংশে নির্ভুল, যদিচ তখনকার গণনাট্য সংঘের অনেক হাতুড়ে আর্ট-স্পেশালিষ্ট তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা এবং আর্টের ক্ষেত্রে 'অবাঞ্ছিত' হস্তক্ষেপকারী বলেই মনে করতেন।

আর্টের বাস্তববাদী সংজ্ঞা

আপাতত এইটুকু ভূমিকা করে পাঁচুবাবুর প্রবন্ধে আসা যাক। পাঠকরা মনে রাখবেন যে, এই প্রবন্ধ আজ থেকে ১৬ বছর আগে লেখা এবং জেলের মধ্যে বসে লেখা, যেখান থেকে প্রয়োজন মত পুঁথিপত্র যোগাড় করা খুবই দুঃসাধ্য। পাঁচুবাবু প্রথমে আর্ট কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"অনুভূতি যখন সমষ্টিবোধ্য রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তখন সেই প্রকাশকে বলা হয় আর্ট...। আর একটা সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। যেমন লিও টলষ্টয় বলেছিলেন, 'Art is a means of emotionaly infecting men,' অর্থাৎ আর্ট অপরের অনুভূতি জাগাবার উপায় বিশেষ।" এই সংজ্ঞাকে

বুঝবার জন্য তিনি দুই দিক থেকে বিচার করতে বলেছেন: এক হ'ল— সীমা এবং আর একটি হ'ল অনুভূতির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্ত্তন। অর্থাৎ সমাজ-গত মানব জীবনের প্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু তার আগেই জানা দরকার অনুভূতির প্রকাশ মাত্রই কি আর্ট? তিনি উদাহরণ স্বরূপ বক্তার বক্তৃতা ও বিকলাঙ্গ ভিখারীর করুণ আবেদনের উল্লেখ করে বলেছেন যে, একে সুকুমার কলা বলা যায় না। তবে কাকে আর্ট বলব? যারা বলেন: 'যে প্রকাশ সত্যই কলাসঙ্গত সে নিজের সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য্যের পরিচয় লিপি নিয়েই আসবে; আমার অর্থাৎ সমঝদারের কাজ তাকে তখন চিনে নেওয়া এবং আসল জিনিসকে চিনতে পারার ভিতরই ত আমার সমঝদারীর পরীক্ষা! তাদের উত্তরে পাঁচুবাবু লিখেছেন; "আমি এবং আমার মত আরো যারা সাহিত্য-রসের আস্বাদ পেল, তাদের মধ্যে মিল কোথায় ও কেন, এবং আমাদের সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টারই বা যোগ কতখানি, আমি তাও জানাতে চাই। রসের স্বর্গলোকে কমলাকান্তের মত শুধু মসগুল হয়ে থেকেই আমি সন্তুষ্ট নই। আমার চরিতার্থতা এবং অপরের চরিতার্থতার হিসাব করতে গেলেই ব্যক্তিগত সীমা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। বেরিয়ে আসি রসলোকে যেখানে পরিবর্তনশীল সমাজের পরি-প্রেক্ষিতে নিত্য নূতন অনুভূতি জাগাচ্ছে এবং স্রষ্টার কারিগরীর ভেতর দিয়ে কলাসঙ্গত রূপ পাচ্ছে। আর্টিষ্ট ও সমঝদারের যোগ কোথায় এবং কেন—তার পরিচয় পেতে গিয়ে আমাকে হতে হবে বৈজ্ঞানিক।"

আর্টের উৎপত্তির বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস

এইভাবে কলাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান, কাল ও সাম্প্রদায়িকতার কথা আসে। সাম্প্রদায়িকতা বলতে তিনি কমিউনিটি ও পরে শ্রেণীর কথা ভেবেছেন। আর্টের সার্বজনীন আবেদন বিচার করতে গেলে প্রত্যেক সমালোচককে যে এই স্থান, কাল ও শ্রেণীর দিকটা ভাবতে হবে—এ উক্তি করে তিনি নৃত্য গীত প্রভৃতির আদিম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। নৃত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "আদিম নৃত্য ছিল তখনকার গোষ্ঠীর সরল জীবন প্রণালীর প্রতিচ্ছবি, বন্য পশু শিকারের বা কৃষি কার্যের সময়কার পরস্পর সহযোগের প্রতীক স্বরূপ। তখনও ব্যষ্টিনৃত্য আসে নি—নৃত্য ছিল সমষ্টিগত গোষ্ঠীর সমাজ জীবন থেকেই আরব্ধ। ছন্দের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে তার কারণ মানুষের শরীর গঠনের ভিতর পাই। ইতর জীবের ভিতরও ছন্দ পাই—ঘোড়া কদমে চলে, ভারবাহী উট তালে তালে পা ফেলে। এখানে ছন্দোবদ্ধতার ভিতর আছে সাচ্ছন্দ্য, শক্তির স্বল্পতম

ব্যবহারের মধ্যে জীবদেহের সুস্থতার ইঙ্গিত। মানুষের সমষ্টিগত জীবনে ছন্দের আর একটি দিক আছে, সেটি হচ্ছে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সমষ্টিগত কার্যের সুবিধা।...উৎপাদন এবং মানসিক উৎকর্ষ দুদিক দিয়েই অতি নিম্নস্তরে থাকলেও আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম (Intellectual and Physical labour) দ্বিধাবিভক্ত হয় নি। তাই তখন সমগ্র গোষ্ঠীই ছিল নৃত্যের স্রষ্টা ও বোদ্ধা এবং নৃত্য সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি।" ঠিক এইভাবে সঙ্গীত সম্পর্কেও উক্তি করে তিনি বলেছেন: "সমাজের পরিবর্তনে মানুষের সংগ্রাম নূতন নূতন রূপ নিয়েছে; নূতন সমস্যা, নূতন সংগ্রাম, নূতন পরিণতির ভিতর দিয়ে অবচেতন মনের সমৃদ্ধিতে পুরাতনের সঙ্গে যোগ হয়েছে নূতনের—যাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ও সংযোগ বিয়োগের বহুরূপ সংমিশ্রণে আর্ট জটিল হতে জটিলতর হয়েছে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে এবং সমাজে সাম্প্রদায়িক ভাগের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকতর রূপ নিয়েছে।"

জনসাধারণের সঙ্গে আর্টের বিচ্ছেদ

আর্ট যেমন নূতনতর এবং জটিলতর হয়েছে, তেমনি সমাজের মানুষ যারা প্রথমে সকলেই ছিল প্রাথমিক আর্টের সমষ্টিগত স্রষ্টা, তারা আজ সকলে স্রষ্টা তো নয়ই এমন কি বোদ্ধাও নয়। সমাজ তার সরল সহযোগিতা থেকে স্বার্থ বিভক্ত, দ্বন্দ্ব কুটিল রূপ নেয়ার পর অনেক মানুষই রয়ে গেল জীবনযাত্রার প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ......জীবন রক্ষার কার্য তাদের হয়ে উঠল দিন যাপনের গ্লানি। ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তির মধ্যে আদিম জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য তাদের আর রইল না। আর্টের নূতনতম আত্মপ্রকাশগুলোও তাদের কাছে ধরা দিল না, তাদের অবসরহীন জীবনের মধ্যে স্থূল অনুভূতিগুলোই রয়ে গেল।...সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আশ্রয় নিল তাদের কাছে যারা জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার অবসরের মধ্যে অন্তরের সুকুমার বৃত্তি গুলোকে লালন করতে পারল।"

এরপর তিনি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "শব্দ তথা ভাষার জন্ম আদিম মানবগোষ্ঠীর Praxis-এর (ব্যবহারিক জীবনের) ভিতর। জীবন সংগ্রামের কার্য-প্রণালীর মধ্যে শব্দের উৎপত্তি; শব্দগুলো প্রথম ছিল ক্রিয়াবাচক...পরে অন্য শব্দের সৃষ্টি হয়।...জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রণালী থেকে উদ্ভূত হয়ে ভাষা, ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো।...তারপর লক্ষ লক্ষ

বছরের পরিবর্তনের ফলে আজ আর কাজ ও ভাবের সেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। ভাবকে মানুষের সমগ্র অতীতের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যখন তাকে স্বতন্ত্র সত্তা দেওয়া হয়, তার ভাষাকে মাত্র তার বাহন বলা হয়, তখন মাত্র এইটুকু ভুলে যাওয়া হয় যে সামাজিক মানুষের কার্যের ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষা যমজ সহোদর এবং শব্দ বা ভাষাই হচ্ছে ভাবের প্রতীক।"

সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার উৎস

সফোক্লিস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক বিষয়ে ঐক্য পাচ্ছি কি করে? এই প্রশ্ন নিজেই তুলে জবাবে পাঁচুবাবু লিখেছেন ;—"দেশ ও কালের অনেকখানি ব্যবধান অতিক্রম করে অনেকের দৃষ্টি আমাদের মনকে অনুভতির বিচিত্র লীলাছন্দে ও গীত সম্পদে সচল ও মুখর করে তোলে কি করে?...আজ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের এক জায়গায় ঐক্য আছে। জৈব পদার্থে এভল্যুশনের ভিতর দিয়ে চেতনশীল মানুষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে সকল জৈব পদার্থের ঐক্য আছে, সেটি হচ্ছে জীবন সংগ্রাম। মানুষের বেলায় জীবন সংগ্রামের রূপ আত্মপ্রকাশ করছে দুটি পরস্পর সংযুক্ত প্রণালীর মধ্য দিয়ে,—প্রথমে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষা—যার থেকে আসছে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যও স্বীকার এবং সামঞ্জস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতগুলি ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে যৌন প্রণালী, যার থেকে আসছে সাহচর্য ও সন্তানসৃষ্টি। প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি প্রণালীই সাধারণভাবে আর্ট ও বিশেষ ভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।"

এর পব বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্র নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন ;—"আর্টের পদ্ধতি হচ্ছে অন্তরাশ্রয়ী পদার্থকে বহিরাশ্রয়ী করা। অনুভূতিকে বস্তু রূপ দেওয়া, যদিও সেই বস্তুরূপ বাইরের বস্তু থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়ে যায়, অনেকটা মানবীয় সত্তা পায়,—তাই সাগর হয় মহান, আকাশ হয়েছে উদার, নির্ঝর হয়েছে গীতি-মুখর, বৈশাখের মধ্যাহ্ন পেয়েছে রুদ্রের ভ্রূকুটি।"

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্টের বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ;—"চার্চ সংগীত ও ফিউডাল ব্যারণের ক্যাস্‌ল-এ কাব্য-গল্প রচনা যখন আরম্ভ হল —তখন আর আর্ট জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত নয়। জীবনযাত্রার সংগ্রামের সঙ্গে যাদের রইল যোগ,—প্রকৃতির আলো, হাওয়া ও গন্ধের মধ্যে যারা মাটির বুকে সম্পদ সৃষ্টি করত, তাদের লাঙলটানা বলদ ও ঘোড়ার গাড়ীর প্রতি পায়ের ক্ষেপে তারা সৃষ্টি করেছে গান ; যে জেলের দল ঝড়, জল, রৌদ্র বাতাসে এবং কালো আঁধারে নৌকায় পাড়ি দিত তারাও প্রকৃতির কল্যান ও রুদ্ররূপের

সম্মুখীন হয়ে গাথারূপী গান ও গাথা সৃষ্টি করেছে; সংসারের দুঃখে দুঃখী যে মায়ের দল, ছেলের কান্নাকে স্নেহের সুরে চাপা দিতে চেয়েছে তাদের কথাগুলো সারি বেঁধে হয়েছে ছড়া; গ্রামের অভ্যন্তরে পুরুষের পর পুরুষ যে জীবন চলে এসেছে সেখানকার সেই সাধারণ সুখও দুঃখ, ভালবাসা ও বিচ্ছেদের লক্ষ্য কাহিনী গ্রাম্য কথিকা ও গীতিকার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। ধনীর ক্যাসেলে রচিত কাব্যের অলঙ্কার এতে নেই, চার্চ সংগীতের গাম্ভীর্যও এতে নেই, এতে আছে বয়ে যাওয়া জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, এর ভিতর মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। আকাশের আলোর দিকে চেয়ে যেখানে মানুষের চেষ্টায় শতকোটি অঙ্কুর পৃথিবীর বুকে গজিয়ে উঠেছে, এরা তাদের সন্ধান দেয়।"

অপর দিকে দৈহিক শ্রমের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যাদের অস্পষ্ট ও আবৃত হ'ল তাদের জীবনের আকাশ কুসুমের নেশাও সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করল। ক্লাসিক্যাল যুগের রণনায়করা জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে খুব দূরে আসে নি, তাদের বীরত্ব গাথার মধ্যেও স্বাস্থ্য ছিল কিন্তু মধ্য যুগের ক্যাসেলের মধ্যেই স্বাস্থ্য নেই, বীরত্ব সেখানে দাসত্ব বরণ করেছে—তার সবচেয়ে বড সফলতা হচ্ছে নারীর সৌন্দর্যের স্থূলতম প্রকাশের কাছে আত্মবিলোপ।

আর্টে বিজ্ঞানের ভিত্তি

ধনিক যুগের প্রথম দিকটায় তার যে প্রগতিকামী অভিযান ছিল – তার বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন ;—"অভ্যুদয়শীল ধনিকের আত্মপ্রকাশের সে গতি আর নেই, যেমন ব্যবহারিক জীবনে তেমনি মনোজগতে তার প্রচণ্ড দুঃসাহসের জায়গায় এসেছে দুঃস্থ নৈরাশ্য।" সমাজের মধ্যে আবার কিভাবে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তনবিরোধী শ্রেণী হয়েছে সে কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, আর্টিষ্টের চেতনা তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী দ্বারা নির্ধারিত; সমাজের মধ্যে আবার সকলে তার চেতনাকে সমান ভাবে উদ্দীপিত করে না। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত তার থেকে আসে তার চেতনার বেশীর ভাগ এবং তার থেকেই স্থির হয় তার মনোভাব···তাই আর্টিষ্ট সাম্প্র-দায়িকতা মুক্ত হতে পারে না। বর্তমান সমাজের অভিজাত মধ্যস্বত্বোপভোগীর দল অবসর-প্রমোদের আবিলতার মধ্যে নিমজ্জিত,—তাদের মনবৃত্তির একদিকে ফুটে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপর দিকে নৈরাশ্য—যার থেকে আসছে অতীন্দ্রিয়বাদ, যোগসমাধি ও অলস কল্পনা।"

শিল্পীকে বিপ্লবী হতে হবে

আর্টিষ্টকে কি সমাজ-সংস্কারক বা বিপ্লবী হতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন যে শিল্পীসমাজ থেকে পৃথক নন এবং প্রতিদিন নানাভাবে সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া,—"যেমন বিপ্লবীর চোখে আর্টিষ্টের চোখেও যদি বর্তমান সমাজ তেমনি জরাগ্রস্ত, আপনার ভারে ন্যুব্জ-কুব্জ বলে ধরা পড়ে তাহলে সে বর্তমান সংঘাতের মধ্যে সন্ধান পাবে নূতন সমাজের জন্মবেদনার,—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত নূতন সমাজের প্রস্তুতি হিসাবে বর্তমান সমাজকে দেখতে পারলেই আর্টিষ্টের ব্যক্তি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ধারণা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হবে······তা না হয়ে যদি আর্টিষ্ট আভিজাত্যের দূষিত কল্পনার খোরাক যোগাতে থাকে, তাহলে বর্তমানে জরাগ্রস্ত কঙ্কালের রূপকে যত অলঙ্কার দিয়ে সাজাবার চেষ্টা হোক না কেন বৈরাগ্য ও স্থূলতার মধ্যে সেই জরা আত্মপ্রকাশ করবেই! বর্তমান বূর্জোয়াকালচারের "Heart-break House"-এ যে উতরোল কান্নাররোল শোনা যাচ্ছে, মাত্র Snobbery-র আবরণ দিয়ে তাকে কে ঢাক্‌বে?"

জনরুচির সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক

বর্জনীয় আর্টকে বর্জন করার জন্য কি পুলিশের লাঠি নিয়োগ করা সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যৎ সমাজের জনরুচিই হবে বর্জনবিলাসিতা বর্জন করার কর্তা, সেই জনরুচির বিরুদ্ধাচরণ করে কোনও আর্টবস্তু চলতে পারবে বলে মনে হয় না এবং যেহেতু আর্টের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের মত ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয় সেইজন্য অতীত ও বর্তমানের আদর পাওয়া অনেক কলাবিদও হয়ত পুরাতত্ত্বের মিউজিয়ামে স্থান পাবে। পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে জনরুচিও পরিবর্তনশীল। তাই অনেক সময় জনরুচি পরিবর্তিত হবার আগেই প্রতিভাশালী দ্রষ্টা সেই পরিবর্তনের আভাস পেয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তিত জনরুচি তাঁকে মর্যাদা দেয়। আর্টিষ্টকে জনরুচির ক্রীতদাস হতে বলা নিশ্চয় অনুচিত, তাঁকে এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, যে বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে জনরুচির পরিবর্তনের কারণ রয়েছে সেই বাস্তব-জীবনের গতি ও পরিণতি সম্পর্কে তিনি সচেতন হন। আর নিপীড়িত জন-সাধারণের দিক থেকে আর্ট বর্জন করবার কথা যদি কখন শোনা যায়

তার কারণ বোধহয় এই যে, সর্বপ্রকার বিলাসিতার মত আর্টও ধনীর একচেটে।"

"Writer must not exist and write in order to make a living."—Marx. পাচুবাবুর এ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে মার্ক্সের এই উক্তিটি আমি যোগ করে দিতে চাই। বস্তুত তিনি এই ধরণের কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে আর্টিষ্টকে অস্বাস্থ্যকর বিকার থেকে মুক্ত হবার জন্য সাবধানে থাকা দরকার ও যেহেতু শিক্ষার সুবিধা বর্তমানে শ্রেণীগত, আর্টেরও সমজদার তাই বেশী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে থাকা সম্ভব। অথচ এই শ্রেণীর মধ্যে অবসরভোগী সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট আর্টে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক, গ্লানিপূর্ণ মনোবৃত্তি এবং জীবন যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কহীন মানসিক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর শিল্পীকে সেই রুচি মেটাতে গিয়ে নিজের রুচির বিকার ঘটে। তাই পাচুবাবু রঁলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছেন;—"আর্ট জীবন যাত্রার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলুক. জীবনসংগ্রামের সঙ্গে আর্টেরও প্রত্যক্ষ সংযোগ হোক, আর্ট-এর সাধনায় তপস্যা থাকুক বেঁচে, পেশাদারী নষ্ট হোক্।"

আমি যতদূর জানি সতেরো বছর আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে লেখা এই ধরণের মার্কসবাদ সম্মত প্রবন্ধ আর কেউ লেখেন নি। এবং আমি আগেই বলেছি প্রবন্ধটি জেল থেকে লেখা এবং জেলে সব রকমের পুঁথিপত্র পাওয়া মুস্কিল। পাচুবাবুর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যিক পুঁজি জানবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি নির্বাচনের কাজে এত ব্যস্ত যে আমি সময় করে তাঁর সুবিধামত সময়ে দেখা করতে পারিনি। তাই তাঁর প্রবন্ধের যে অংশে আমার খটকা লেগেছে সেই অংশ উদ্ধৃত করে এবং সে সম্পর্কে আমার আপত্তির বিষয় জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

অনুভূতি ও অবচেতনের ধাঁধাঁ

মানুষের অনুভূতির উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "মানুষের মন সম্বন্ধে মনে হয় বুঝি তাকে দুভাগ করা চলে। একটির নাম দেওয়া যায় চেতন, অপরটি অবচেতন। বাইরের সবকিছু স্পন্দন, ঘটনার বৈচিত্র্য ও বহুলতা এই অবচেতন মনে ছাপ দেয়; মনের অবচেতন অংশ থেকে সচেতন অংশে যখন বাইরের ছবিগুলি দেখা দেয় তখন হয় চেতনা, চেতনা মানে বাইরের ঘটনা বৈচিত্র্য

ও বহুলতার চেতনা। অবচেতন মন হচ্ছে একটা ভাণ্ডার বিশেষ, সেখানে সজ্জিত আছে লক্ষ দীপ। বাইরের একটা ইঙ্গিতে হয়ত এক সারি দীপ জলে ওঠে, অবচেতন মন চেতনার পর্দায় ফেলে ছবি, সেই ছবিগুলি অনেক সময় সচল, কখনও বা মুখর। কখনও বা তাদের নৃত্য-ছন্দে ও গীতি-কল্লোলে আমাদের মনে হয় যে যা দেখলাম, যা শুনলাম তা বুঝি সনাতন শাশ্বতের ইঙ্গিত, ভাবলোকে অনন্ত অস্তিত্বের ক্ষণিক আত্মপ্রকাশ করে ক্ষণিকত্বকে ছাপিয়ে উঠছে তার ব্যঞ্জনা এবং যার ভিতর তার অমরত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছে। বস্তুত জীবনের অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব বস্তু ও শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যত কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—আঘাতের ভিতর দিয়ে এবং বশ্যতার ভিতর দিয়ে—তাদেরই সাতরঙা ছবি, তাদেরই ছন্দবদ্ধতা, স্বরগ্রাম ও সুসমঞ্জস সৌকুমার্যে এবং তাদের অসামঞ্জস্য, বিকার ও বীভৎসতা মনের অবচেতন অংশে বাসা বেঁধেছে। যাকে শাশ্বত মনে হয় তা ক্ষণিকেরই আদর্শ রূপ। সামাজিক মানুষের জীবন সংগ্রামে আঘাতের ও প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য ও বহুলতা অবচেতনের ভাণ্ডার বেশী করে পুষ্ট করে। এমন আর্ট তাকেই বলতে পারব যা চেতনার দিবালোকে সুস্পষ্ট নয়, যে প্রকাশ তার আবেদন, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে অবচেতনাকে চেতনার স্তরে টেনে আনে তাকেই বলব আর্ট, আর সমঝদার তাকেই বলব যার অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলাশিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি আছে। সেইজন্য যে-সে আসল সমঝদার হতে পারে না, সমঝদারের চাই শিক্ষা এবং এইজন্যই কলাবিজ্ঞানের খাঁটি সমালোচক একাধারে সমঝদার ও সমালোচক দুই-ই।"

পাভলভ তত্ত্ব না ফ্রয়েড তত্ত্ব

এই উক্তির মধ্যে প্রথম খটকা লাগছে চেতনার সংজ্ঞা নিয়ে। যেমন পাঁচুবাবু বলেছেন: চেতনা মানে বাইরের ঘটনাবৈচিত্র্য ও বহুলতার চেতনা। আবার বলছেন: "মনের অবচেতন অংশ থেকে চেতন অংশে আসা কোন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না।" দ্বিতীয়ত এই অবচেতন অংশ নিয়ে পাঁচুবাবুর আলোচনা খানিকটা ফ্রয়েডগন্ধী। অবচেতন ভাণ্ডারে লক্ষ দীপ আছে যা বাইরের আঘাতে জ্বলে উঠবে বা অবচেতন ভাণ্ডারে ছবির সঙ্গে বাইরের ছবি মিশানো হবে—প্রভৃতি কথা পাভলভ সম্মত বিজ্ঞানের কথা নয়। পাঁচুবাবু যে সময় এই প্রবন্ধ লিখেছেন তার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কথা উঠেছিল, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরেই এই কথা ওঠে যে ফ্রয়েড ও

পাভলভের বক্তব্যের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৫০ সালে একাডেমি অব সায়েন্সের অধিবেশনে এই কথা বলা হয়ঃ "At one time the opinion was expressed that attempt had been made here in the Soviet Union to combine Freudism with Pavlov's theory of the conditioned reflexes into a single system of "Reflexological Freudism." It must be said to the honour of our Soviet Physiology that there have been practically no attempts to create a "Reflexological Freudism". (Scientific session on the Physiological Teachings of Academician Pavlov. P. 68)

বাইরের ঘটনা মনের উপর ছবি তৈরী করে এবং তাই জমিয়ে অবচেতনার' ভাণ্ডার বড় হয়—কথাটা এইভাবে পেড়ে পাচুবাবু মনকে প্রায় যন্ত্র করে ফেলেছেন, মন যে বাইরের এবং ভিতরের সংগ্রামের অংশীদার—সে পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তিত হয়—তার অবচেতনের ভাণ্ডারের ছবিরও পরিবর্তন ঘটে, এই কথাটি পাচুবাবুর লেখায় বোঝা যায় না। যেমন তিনি বলেছেনঃ "বস্তুত কিন্তু জীবনের অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে প্রকৃতির যে সব বস্তু ও শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যত কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—আঘাতের ভিতর দিয়ে এবং বশ্যতার ভিতর দিয়ে—তাদেরই সাতরঙা ছবি·· বিকার বিভৎসতা মনের অবচেতন অংশে বাসা বেঁধেছে।" এই ধরণের কথায় ফ্রয়েডীয় অবচেতনের (যা ১৯৩০—'৩৬ সালে প্রগতিশীল চিন্তাধারার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল) গন্ধ পাওয়া যায়। পাভলভের—"a specific equlibrium between external environment and the internal process is established, organised by the cerebral cortex" এই ধারণার সঙ্গে মেলে না। এই গেল শরীরতত্ত্বের কথা।

তারপর পাচুবাবু বলেছেনঃ "আর্ট তাকেই বলতে পারবো যা চেতনার দিবালোকে সুস্পষ্ট নয়, যে প্রকাশ তার আবেদন, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে অবচেতনকে চেতনার স্তরে টেনে আনে তাকেই বলব আর্ট, আর সমঝদার তাকেই বলব যার অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলা শিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি আছে। সেইজন্য যে-সে আসল সমঝদার হতে পারে না, সমঝদারের চাই শিক্ষা

এবং এই জন্যই কলা বিজ্ঞানের খাঁটি সমালোচক একাধারে সমঝদারও সমালোচক দুই-ই।" এই 'অবচেতনকে চেতনার দিবালোকে আনা' এবং সমঝদারের অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলা শিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবির অস্তিত্ব থাকার মতবাদও বিতর্কমূলক। রাল্‌ক্‌ফক্সের এই বক্তব্যটি সে যুগে অনেক পরিষ্কার ছিল :

"Art is one of the means by which the writer grapples with and assimilates reality. On the forge of his own inner consciousness the writer takes the white hot metal of reality and hammers it out, refashions it to his own purpose, hits it out madly by the violences of thought." (The Novel and the people)

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা

সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে মার্কস্‌ যে কথা বলেছেন তার সঙ্গেও পাচুবাবুর উক্তি মেলে না। মার্কস্‌ বলছেন :

"Only through the objectively unfolding richness of the human being is the richness of subjective human conciousness, such as musical ear, an eye for the beauty of form, in short, senses capable of human enjoyment and which prove to be essentially human powers, partly developed and partly created. For not only the five senses but also the so called intellectual and practical senses (will, love etc.), in a word human senses and the humanity of senses, come to being as a result of the existence of man's object, as a result of humanised nature. The formation of the five senses is the work of the entire history of the world upto now. Senses limited by crudely practical needs have only a narrow meaning." এই প্রসঙ্গে মার্কস্‌ বলছেন মানুষ যাকে অখাদ্য বলে উপোসী মানুষের কাছে তাও খাদ্য হতে পারে। চিন্তাকাতর দরিদ্র মানুষ উৎকৃষ্ট নাটকের রস গ্রহণ করতে অক্ষম হতে পারে। তাই তিনি বলেছেন :

Hence the objectivization of human existence, both in a theoretical and practical way, means making man's senses human as well as creating human senses corresponding to the vast richness of human and natural life."

অবশ্য পাঁচুবাবু যে অবচেতনের কথা বলেছেন সে অবচেতন ফ্রয়েড প্রদর্শিত রোগগ্রস্ত কামনার কারাগার নয়, বরং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রামলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সে অবচেতন। কিন্তু তবু কথাগুলি এমন ভাবে বলা আছে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তিনি খাঁটি সমঝদারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে সাধারণ মানুষেয় ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যায় এবং যে সব শিল্পবিলাসী শিল্পে দুর্বোধ্যতার পক্ষে সাফাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে আগে পণ্ডিত হয়ে পরে শিল্পকলা বুঝতে নির্দেশ দেন তাদের যুক্তি সবল হবে। অবশ্য পাঁচুবাবুর সমস্ত প্রবন্ধ পড়লে সে রকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়ত পাঁচুবাবুর এই ত্রুটিগুলি ১৯৩৫-'৩৬ সালের বহু বিপ্লবী শিল্প-রসিকদের ত্রুটি বলে আজ আলোচনা চলছে। কডওয়েল নিয়ে সম্প্রতি মডার্ণ কোয়ার্টার্লিতে যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার থেকে আমি এই উক্তি করছি। বৃটেনের বহু নামজাদা মার্কসবাদী আজ কডয়েলের মধ্যে ভাববাদী বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন।

মডার্ণ কোয়ার্টার্লিতে কডওয়েলের উপর যে আলোচনা চলছে তাতে যোগদান করেছেন মরিস্ কর্ণফোর্থ, জর্জ্ টমসন, জে. ডি. বার্ণাল প্রভৃতি বৃটেনের বড় বড় মার্কসবাদী পণ্ডিতরা। কর্ণফোর্থ ও বার্ণাল, কডওয়েলের নীতি কতকাংশে ভাববাদী বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন—তার ২।৪টি উক্তি তুলে দিই। কারণ কডওয়েলের প্রভাব শুধু বাংলার পাঁচুবাবুর উপর নয়, পৃথিবীর আরো অনেকের উপর (আমাদের সকলেরই উপর) প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বার্ণালের ভাষায় "কডওয়েল শত শত লোককে মার্কসবাদী নীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটান।" তবু বার্ণাল বলছেন:

"There is only too ample evidence of truth of Cornforth's thesis that their (works of Caudwell) formulations are those of contemporary bourgeois-scientific philosophy, Einsteinian-Morganist-Freudian and not those of Marxism.

বার্ণাল আরো বলেছেন যে কডওয়েল তাঁর Illusion and Reality বইতে genotype and its unconscious drives-কে মূল চালকশক্তি করেই ভুল করেছেন। কর্ণফোর্থ বলেছেন: Closely connected with Caudwell's Freudism is his conception of "two worlds" of the inner as contrasted with the outer world and of "inner energy." এই ধারণার ফলে গানের সম্পর্কে Phycho-analytic theory of latent and manifest content এসেছে এবং কবিতা সম্পর্কে Depth psychology-র কথা উঠেছে। আপাতত কডওয়েল প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাক। বিনয় ঘোষের "শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ" বইখানি আলোচনা প্রসঙ্গে আবার কডওয়েল নিয়ে বিতর্কের কথা পাড়তে হবে. বিলেতে এই নিয়ে মার্কসবাদী সংস্কৃতি মহল বেশ গরম কিন্তু আমাদের দেশে তার ধাক্কা কেন লাগলো না বুঝি না। রোগ চাপা চাপা দিয়ে রাখা আমাদের অভ্যাস বলে কি?

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র

এবারে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার'-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে এবং এই সংখ্যায় যে সমস্ত রচনা আছে তার মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত মুল্‌করাজ আনন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। এছাড়া প্রেমচন্দের 'কাফন' গল্প, আব্দুল আলিমের লেখা 'হিন্দুস্থানী'র সমস্যা, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার সামাজিক পটভূমি" এবং বিভিন্ন পুস্তক সমালোচনার মধ্যে সমালোচনা করেছেন পণ্ডিত নেহেরু; আলি সর্দার জাফ্‌রী, লিওনার্ড শিফ্‌ জ্ঞানচাঁদ, সাজ্জাদ জহীর, মুল্‌করাজ আনন্দ প্রমুখ। তারপর নিখিল ভারত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ও সংঘের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা প্রভৃতি আছে। এই পত্রিকার আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সে সংখ্যা আমার কাছে নেই। তাই এই সংখ্যার প্রবন্ধের সাহায্যে নিখিল ভারত সম্মেলন পর্ব শেষ করার আগে সর্দার জাফরী এবং সাজ্জাদ জহীরের মত খ্যাতনামা কমিউনিষ্ট নেতাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় এই পত্রিকা মারফৎ পেয়েছি—তা আমাদের পাঠকদের জানাতে চাই। কারণ উক্ত সম্মেলনের আলোচনা শেষ করার পর আর নিখিল ভারতীয় নেতাদের প্রসঙ্গে আসা যাবে না।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাজ্জাদ জহীর

প্রথমে সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধ নিয়ে শুরু করা যাক। উর্দু কবি মজাজ, আম্‌বালভি ও সৈয়দ মুত্তাল্‌বীর কবিতা-গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে এঁরা স্বাধীনতাকামী ও বিপ্লবপন্থী কবি এবং এঁরা মানেন যে শ্রমিক ও কৃষক আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী হবে। এঁরা মানেন যে ধনতন্ত্র সকল বিপত্তির কারণ। তাই কবিতার মারফৎ কঠিন ধাক্কা দিয়ে এঁরা জনসাধারণকে জাগাতে চান। শত্রুর বিরুদ্ধে এঁরা এত কঠোর হতে চান যে মাঝে মাঝে এঁরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সমগ্রভাবে দেখলে এঁদের বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা বড় বেশী সরল এবং অসম্পূর্ণ। এঁদের যুদ্ধ ঘোষণা এবং গালাগালির বহর অনেক সময় উল্টো ফল ফলাতে পারে।

এ সবের কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা বিপ্লবী আন্দোলনে আসে —নিজেরা নিষ্পেষিত বলে এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে এঁদের জ্ঞান কম বলে এঁরা বিপ্লবে 'ঝাঁপ' দিতে চান এবং ঝাঁপ দিতে গেলেও যে কিছুকাল দৌড়াতে হয় এ বোধ তাঁদের নেই। এঁদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক নেই বলে—এঁরা সব জিনিস রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেন এবং রচনায় ভাবালুতার বন্যা বহান। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য এবং রাজ-নীতিতে সন্ত্রাসবাদ স্বষ্টির সহায়ক। কবি বা লেখক যদি সামাজিক অবস্থা সচেতনভাবে বুঝে বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর না হন—তাহলে তার শিল্প সকল মহৎ শিল্পের ভিত্তি বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। তাই লেখকদের গণ-আন্দোলনের অংশীদার হওয়া দরকার—কেবল তা হলেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মাবে এবং চিত্র বাস্তব হবে। কেবল মাত্র এই পথে লেখক বাস্তবধর্মী হতে পারেন। সুখের বিষয় যে পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে কেউ কেউ এই সব বুঝতে পারছেন। বর্তমানে তাঁদের রচনায় যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল কেবল তাঁদের গভীর মানবপ্রীতি এবং পলায়নীবৃত্তির বিরোধিতা। এঁরা যতই সমাজ পরি-বর্তন ও বৈপ্লবিক কাজে-কর্মে অভিজ্ঞ হবেন ততই শিল্পের মূলনীতিগুলিই এঁদের করায়ত্ব হবে।

সাজ্জাদ জহীরের এই প্রবন্ধ ছোট এবং আমি প্রায় সবই সংক্ষেপ করে দিয়েছি। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য দরকার আছে বলে মনে করি না। অল্প কথায় তিনি লেখকদের যে পরিমাণ প্রশংসা করেছেন—তার থেকে অনেক

বেশী গঠন মূলক সমালোচনা করেছেন—এবং সেখানে কোনরূপ গোঁজামিলের প্রশ্রয় দেন নি।

ইকবালের ফ্যাসিজম প্রীতি

আলি সর্দার জাফরী কবি ইকবাল সম্পর্কে কয়েকখানি বই-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে ইক্‌বালের কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ফ্যাসিজমপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধ আমার আলোচনার পক্ষে বিশেষ জরুরী নয়—কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলনে যাঁরা নবাগত—এমন কি যাঁরা ১৯৪২ সালের পরে ইক্‌বালের জাতীয়তা-বাদ সম্পর্কে নানা মনোমুগ্ধকর প্রবন্ধ কমিউনিষ্ট কাগজপত্রে পড়েছিলেন—তাঁরা এই প্রবন্ধ পড়লে অবাক হবেন আর ভাববেন যে জাফরীর মত বিপ্লবী ও মার্কসবাদী মুসলমানকে ইক্‌বালের জাতীয়তাবাদ মানাতে এবং লীগকে তুষ্ট করার জন্য মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার স্বীকার করাতে পি.সি. জোশীকে কত বেগ পেতে হয়েছিল। আমার প্রবন্ধের অকমিউনিষ্ট পাঠক-দের এই প্রসঙ্গে একটা খবর জানিয়ে দিতে পারি যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য লীগকে রাজী করানোর কাজে জোশীবাদী নেতৃত্ব যখন লীগের মধ্যকার দেশপ্রেমিকতাকে বড় করে তুলতে লাগেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মানতে শুরু করলেন—তখন তার বিরুদ্ধে সব থেকে প্রথম প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির মুসলিম সভ্যরা। যাক সে প্রসঙ্গ। আপাতত জাফরীর প্রবন্ধে ফিরে আসা যাক। সর্দার জাফরী বলেছেন যে মুসলমানদের স্তিমিত গৌরবের মধ্যে ইক্‌বালের উত্থান। ভারত, আফগানিস্তান, ইরাণ এবং তুরস্কে খিলাফতের পতন ইক্‌বালকে প্রবুদ্ধ করে। ইসলামের সংস্কৃতির নবজাগরণের জন্য তিনি ইসলামের গৌরব প্রচার করতে থাকেন। এর জন্য তিনি হিংসা প্রচার করতে থাকেন। অবশ্য তার প্রতীক হচ্ছে ঈগল। তাঁর জীবনের প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদ প্যান-ইসলামবাদে পরিণত হয়। তিনি ধনতন্ত্রবাদের যে সমালোচনা করেছেন তা ঐ ইসলামের আদর্শের সঙ্গে তুলনা ক'রে। তিনি নিট্‌সে, সরেল এবং বের্গস-এর দর্শন থেকে নিজের মতবাদ পুষ্ট করতে থাকেন। মুসোলিনীর মত ইকবালের কাছেও যুদ্ধ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। বস্তুত মুসোলিনীর রোম অভিযানের পর ইকবাল তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্দার জাফরী মুসোলিনী

জাপানের প্রধান মন্ত্রী ও হিটলারের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখান ফ্যাশিষ্ট শক্তি কিভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে সাম্যবাদ রোখার প্রাচীর বানাতে চাইছে। সর্দার জাফরী আরো জানান যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নাজী মতবাদ প্রচারের একটি আড্ডা হয়েছিল। ইকবাল মুসোলিনীকে প্রশংসা-সূচক একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন এবং লাহোরের "ইকবাল দিবসে" ইতালির কন্‌সাল মারফৎ অনুরূপ একটি বাণী মুসোলিনীর কাছ থেকে আসে। সর্দার জাফরী বলছেন যে ইকবালের এবং তাঁর কবিতা আলোচনা করতে গেলে এই সব বিষয় মনে রাখা দরকার। তিনি আরো বলেছেন যে ভারতে অবশ্য ফ্যাসি-জমের অর্থনৈতিক মূল নেই তবু ইউরোপে তাদের সাফল্যের ফলে বিভিন্ন দেশের অসন্তুষ্ট লোকেরা ডিক্টেটরদের পক্ষে যাচ্ছে, এটা লক্ষ্য করা দরকার।

সর্দার জাফরীর এই শেষ লাইনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধ বাধার পর এবং জার্মান, ইতালি ও জাপানের কাছে ইংরাজ প্রভৃতিদের পরাজয়ে প্রথম দিকটা হিটলার-প্রীতি এদেশে কি পরিমানে বেড়েছিল তা সকলের মনে আছে।

১৯৩৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ পাঠান। তাতে তিনি কামাল পাশার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং জানান যে কামালের সাফল্য সমগ্র এশিয়ার জয়ের সূচনা। প্রাচ্য সংস্কৃতির অবনতির কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন যে অতীতের প্রতি মোহ আমাদের সীমাহীন দুঃখ ও অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে এবং কালক্রমে পাশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে, আমাদের যে সংস্কৃতি দূর-দূরান্তের গ্রামে বিস্তার লাভ করেছিল তার মূলোচ্ছেদ করেছে। বিদেশী শিক্ষকদের পদতলে বসে আমাদের ক্রমেই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা জন্মগত, এবং মূর্খতার শিকল গলায় পরাই আমাদের কপালের লিখন।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হিসাবে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি ভাষণে বলেন যে প্রগতি বলতে তিনি স্বাধীনতা সম্ভোগের ব্যাপক অধিকার মনে করেন। সভ্যতার ইতিহাস স্বাধীনতা বৃদ্ধির ইতিহাস। এই স্বাধীনতা ফ্যাসিজমের হাতে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে সে কথা বলে তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মানবতার সমস্ত শক্তি সমাবেশ করতে বলেন।

সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত সুদর্শন ছিলেন।

সম্মেলনের বক্তৃতা, বিশেষ করে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যদের বক্তৃতা আলোচনা করার আগে সম্মেলনে প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। সম্মেলনের প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা কালীন ভারতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। যেহেতু বৃটিশ শোষণের জন্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত দমন নীতি এবং অবহেলার জন্য ভারতের জনসাধারণের বিরাট অংশের নিরক্ষরতা, শিল্পকলায় অবনতি, অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুন্নত অবস্থা, সেহেতু এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে যারা সংস্কৃতিকে ভালবাসেন তাঁদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে যে সব শক্তি এই দেশের জাতীয় মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে তাদের পক্ষ গ্রহণ করা এবং সাহিত্যের মারফতে, নৈতিক ও বাস্তব সাহায্যের দ্বারা ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুষ্ট করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে দুনিয়ার অন্যত্র যেসব শিল্পী ও লেখক প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, বিশেষত জার্মানী, স্পেন ও চীনদেশের যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন এই সংগ্রামে দুঃখ ভোগ করছে তাদের এই সম্মেলন অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সম্মেলনের মতে সাহিত্য ও শিল্প সমস্ত মানবতার সম্পত্তি এবং একে সম্প্রদায়, জাতি বা ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত করা যায় না। সমতা, স্বাধীনতা ও শান্তির ভিত্তিতে যারা দুনিয়াব্যাপী নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার চেষ্টা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও করছে, ভারতের প্রগতিশীল লেখকরা তাদের দলে—এবং সংস্কৃতির শত্রু ফ্যাসিজম ও জঙ্গীবাদের বিপক্ষে। এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার শক্তিকে সাহায্য করবে এবং যে সকল জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার সাফল্য এই শক্তির পক্ষে অনুকূল তাদের সমর্থন করবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রসারের চেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে কোন কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে বক্তৃতার স্বাধীনতা নেই এবং ভারত সরকার নানারকম বিধিনিষেধ দিয়ে বিদেশ থেকে প্রগতিসাহিত্য আসার পথ রুদ্ধ করছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা

হয় যে সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অবহিত থাকতে বলা হয়। স্কুল ও কলেজে প্রগতিশীল পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে সরকারকে বলা হয়। সারা ভারতের সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যোগ্য কমিটি গঠনের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসকে অনুরোধ জানানো হয়।

এই সম্মেলনে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "সংস্কৃতির সংকট" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ফ্যাসিজমের দ্বারা সংস্কৃতি কিভাবে বিপন্ন হচ্ছে—তিনি তার বর্ণনা করে বলেন যে সকল শিল্পী ও লেখক, শ্রমিক ও কৃষকের পক্ষে—তারা অনিবার্য সংগ্রামে তাদের শিল্পকলাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। পাঞ্জাবের নরেন্দ্রনাথ "সাহিত্য ও মার্ক্‌স-বাদ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বলরাজ সাহনী (তখন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন), আলি সর্দার জাফরী (লক্ষ্ণৌ থেকে) এবং অক্ষেব সুন্দর শর্মা বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন। তৃতীয় অধিবেশনে বুদ্ধদেব বসু "আধুনিক বাংলা সাহিত্য", সাজ্জাদ জহীর "সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক উর্দু কবিতা", ডঃ আবদুল আলিম "হিন্দুস্থানীর সমস্যা", আমেদ আলি "গ্রামের কবি ও ভারতীয় বিপ্লব" এবং সমর সেন "ক্ষয়িষ্ণুদের স্বপক্ষে" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের বক্তৃতা এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির যতগুলি যোগাড় করতে পেরেছি—তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। কারণ যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিতণ্ডা হয় নি বা উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি। কিন্তু এই সম্মেলনের মারফৎ বাংলাদেশে এক ধরনের সাহিত্যিক মতাদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল—তা শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই নানাধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। প্রশ্নগুলির গুরুত্ব বেশী করে দেখা দেয় এই কারণে যে ওয়াকিবহাল মহল জানতে পারছিল যে এ যাবৎ যত সাহিত্য সম্মেলন হয়েছে—তার সঙ্গে এই সম্মেলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য হচ্ছে এই যে এই সম্মেলন এবং সম্মেলনের

উদ্যোক্তারা প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সব কিছুর উপরে স্থাপন করেছে এবং সেই আন্দোলনকে সাহায্য করা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পবিত্র কর্তব্য বলে ঘোষণা করছে। এদেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা, শিল্পকলার ধ্বংস, সাহিত্যের অনুন্নত অবস্থা প্রভৃতির জন্য মূলত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে এই সম্মেলন বাংলায় সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাহিত্যের উন্নতি বৃদ্ধি বিচারের নূতন মানদণ্ড স্থাপন করেছে; সাহিত্যের উন্নতির জন্য "সৃজনশীল একক প্রতিভার আকস্মিক অভ্যুদয়ের" উপর নির্ভর না করে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার উপর জোর দিয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে সাহিত্যিকরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে—তারও একটা নির্দেশ দিয়েছে। শিল্পরস এবং শিল্প রসিকদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে নিজ দেশের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং এই সব অবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘটনার যোগাযোগ ও প্রভাব বিচার করে সাহিত্যিক ও শিল্পকলাকে জীবনের এমন একটা ব্যাপক ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যার সঙ্গে আগেকার কোন চেষ্টার তুলনা মেলে না।

অবশ্য অবস্থা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের আগ্রহে চঞ্চল। এই সম্মেলন ঐতিহাসিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের চার মাস আগে হয়। এ দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিবর্তে ফেডারেশন চাপাবার প্রস্তাব করছে এবং বিদেশে মিউনিক প্যাক্ট মারফৎ হিটলারকে দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার ও সোভিয়েত আক্রমণের পথ পরিষ্কার করছে। যুদ্ধ আসন্ন এবং এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে হিটলারের পথ প্রশস্ত করছে দেখে ভারতের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দাবী করছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশন গ্রহণে ভিতরে ভিতরে রাজী থাকলেও জনমতের অভিব্যক্তি দেখে (পরে গান্ধীজী সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পুনঃ নির্বাচনে) এই সময় থেকেই নিজেদের অভিসন্ধি গোপন রাখার জন্য নানারূপ ছলচাতুরী গ্রহণ করতে থাকে। কাজেই এই সময়ে কোন সাহিত্য সম্মেলনে পূর্বোক্ত ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা সময়োপযোগী এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল। কারণ এর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ ছিল—জাতীয়অভিব্যক্তির ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া! 'ষ্টেট্সম্যান' অবশ্য প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিল—কিন্তু তখনকার দিনে কোন

সম্মেলনে কমিউনিষ্টরা আছে বলে গালাগালি দেওয়াতে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ব্যর্থতাই প্রকাশ পেয়েছিল—কারণ সাম্রাজ্যবাদী ও দক্ষিণপন্থীদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় আন্দোলন সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল। তাই এই সম্মেলনের প্রতি যাদের যথেষ্ঠ উৎসাহ জাগ্রত হয়নি বা যারা মনে মনে বিরূপ ছিলেন—তারা এই সম্মেলনে সাহিত্যের, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে কি ধরনের আলোচনা হয় তার উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা এই সম্মেলনের আগের মাসের সংখ্যায় ঠিক এই ধরণের মন্তব্য করে। অমৃতবাজার পত্রিকা এই সম্মেলন প্রসঙ্গে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক—কাজেই আনন্দবাজার পত্রিকা এই সম্মেলনের পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করে।

কাজেই এই সম্মেলনে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে যে সকল বিশেষ আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনায় যে সকল অংশ আমি যোগাড় করতে পেরেছি তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করব। প্রথমেই সভাপতিপরিষদের অন্যতম সদস্য ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্ম, উন্নতি বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেন। তিনি জানান যে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লণ্ডনের ডেনমার্ক ষ্ট্রীটের নানকিং রেস্তোঁরায় প্রথম ইস্তাহার পড়া হয়। এর পিছনে ছিল ১৯৩১ সালের ধনতান্ত্রিক সংকট এবং ভারতে আমাদের অশেষ দুঃখভোগ এবং নানা ধরনের হতাশা। দেশে ও বিদেশে এই ধরনের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনেকে বোধ করছিলেন। ফলে লণ্ডনের ছোট ছোট বৈঠকে গৃহীত ঘোষণা পত্র ১৯৩৬ সালের লক্ষ্মৌ সম্মেলনে ভারতের নাম করা লেখকদের একত্র করতে পেরেছে এবং দুনিয়াব্যাপী সংস্কৃতি রক্ষার ফ্রণ্টে ভারতের বাহিনী সংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহৎ দল।

তিনি বলেছেন যে অনেকে মনে করেন: এই সংঘ এমন একটি নতুন দল বা গোষ্ঠী যারা সাহিত্যকে বাঁধাধরা নিয়মে বাঁধতে চাইছেন বা গোষ্ঠী আধিপত্য সৃষ্টি করতে চাইছেন। বস্তুত গোড়াতে আমরা লেখক ও পাঠকদের একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিলাম যেখানে আমাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব নিয়েও আমরা সমআদর্শে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছি। সংঘের পাঠক সভ্যরা

অবশ্য প্রশ্ন করেন "প্রগতি সাহিত্য কাকে বলে?" এই প্রসঙ্গে তিনি ইংলণ্ডের বার্নার্ড শ, ওয়েলস্ এবং গলসওয়ার্দ্দির উদারনৈতিক প্রভাবের ফল ইংলণ্ডের সমাজে যে কিভাবে ফলেছে তার উল্লেখ করে বলেন ভারতে বুদ্ধিজীবিরা ছাড়াও বহুলোক এই ধরনের সংগঠন—ইউনাইটেড কালচার'ল ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন বলে সংগঠন এত দ্রুত তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং প্রানবন্ত হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে গত পঁচিশ বছরের ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা যার মধ্যে থেকে একদল শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধি-জীবি বার হয়েছেন যারা সংস্কৃতি সংকটের রূপ দেখে মনে করেছেন—সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অংশীদার হওয়া দরকার। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্দেশ্য কি বোঝাবার জন্য একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং এখনো পর্যন্ত সেই ইস্তাহারই এই সংঘের পক্ষে সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি।

গত দুই বছর সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে এই ইস্তাহারের সারমর্ম সাহিত্যিকরা কতখানি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ আনন্দ বাংলা ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু খবর দেন। বাংলা সাহিত্যে নতুন আদর্শ ও শিল্পকৌশল সম্পর্কে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলা সৃজনশীল সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বহন করছে কাজেই বাংলাতে প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা উচ্চস্তরে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান যে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের যে বিবৃতি পাঠানো হয় তাতে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি শুরু থেকেই প্রগতি লেখক আন্দোলনকে পরামর্শ, শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সাহায্য দিয়ে এসেছেন। এর পর তিনি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেখা "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা" প্রবন্ধটির জনপ্রিয়তা এবং "প্রগতি" প্রকাশের উল্লেখ করেন।

কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্যে এবং সমাজে মত ও পথের বাস্তব ঐক্যসাধন ঘটাতে এখনো দেরী আছে—এই মন্তব্য করে তিনি অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়ের একটি বই-এর উল্লেখ করে বলেন বাংলা দেশের কৃষক ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে অন্তত আঠারো জন মধ্যস্বত্বভোগী থাকার ফলে কসমোপলিট-

নিজমে (বিশ্বজনীনতা) দীক্ষিত বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তার প্রমাণ। তবু বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর দাবী বাঙালী লেখককে এমনি গণ্ডীবদ্ধ রেখেছে যে উত্তর ভারতে যেখানে ইকবাল বা হাফিজ জলন্ধরীর কবিতার বই প্রথম সংস্করণের বিশ হাজার বিক্রি হয়—সেখানে বাংলা কবিতার বই দু'শ থেকে পাঁচশ এক বছরেও বিক্রী হয় না।

অবশ্য মুল্‌করাজ এই সমস্যা তুলে যে উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তার থেকে প্রগতি লেখকরা বিশেষ কোন উপকার পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি বলছেন,

"The difficulties of communication between the samc class and between one class and another could be removed by an understanding of the simple fact that writing is not only great when it is proletarian or bourgeoise, but when it is as intense enough realisation of experience to thaose creative forces, the exact nature of which has not yet been defined by psychological science ; that it is invidious to make a virtue of one's own limitations and resort to personal choice in the assessment of works of art as it is absurd to impose a formula to determine qualities of classic. At best one can only attempt to trace the possible sources of art in the differentiations of time and space, in the social forces that dominate the history of an epoch, fix one's gaze in the hypnotic trance the aesthetic vision of an illuminated moment and increase one's understanding and enjoyment of life.

বাংলা সম্পর্কে ডঃ আনন্দ আবার অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের মত উল্লেখ করে বলেন যে সামাজিক অবস্থার জন্য বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যক্তিভিত্তিক অ্যানার্কিজম্ (বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ) এসেছে। কাজেই বাংলার সমাজ পরিবর্তনে ও সংগঠনে বাংলা সাহিত্যের দায়িত্ব বা সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে সামাজিক অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার।

মুল্‌করাজ হিন্দি ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেন, কথা দিয়ে কথা মেলানোর যুগ অতিক্রম করে এই সাহিত্য বিষয়বস্তু ও ছন্দে বৈপ্লবিক রীতি অনুসরণ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি হাফিজ জলন্ধরী, জোশ মলিহাবাদী, মজাজ, তসীর ও ফয়েজ আহমদের নাম উল্লেখ করেন। এলাহাবাদে হিন্দুস্থানী সম্মেলনে সৈয়দ মুত্তালবী উত্তর ভারতের কৃষকদের রচিত গানে বৈপ্লবিক ভাবধারা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং মিঃ ত্রিপাঠি হিন্দি লোকসংগীতের যে বিরাট সঞ্চয়ন প্রকাশ করেন শ্রীযুক্ত আনন্দ তার উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে ১৯৩৮ সালে দিল্লীর নিকটস্থ ফরিদাবাদে গ্রাম্য কবিদের সম্মেলন হয়েছিল এবং বোম্বাই ও কানপুরে মজুর কবিদের মুশায়েরা হয়। এই সব উদাহরণ থেকে তিনি আশা করেন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কবিতা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। এই সব গ্রাম্যকবি ও মজুরকবি সম্মেলন থেকে মধ্যবিত্ত লেখকরা জনগণের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা পাবেন এবং গ্রাম্য কবি ও মজুর কবিদিগকে কবিতার জটিল কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন—এই আশাও তিনি প্রকাশ করেন। হিন্দুস্থানী গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে তিনি আমেদ আলি, সাজ্জাদ জহীর, আলি সর্দার জাফ্‌রী, হায়াৎউল্লা আনসারী, রসিদ জাহান, বেণীপুবী, যুগোল কিশোর প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে বলেন যে এঁদের রচনাগুণের চুলচেরা বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে এঁরা নতুন সাহিত্যের জন্মগ্রহণে সাহায্য করছেন।

ভারতের লেখকদের গুরুদায়িত্ব ও বাধাবিপত্তির কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেছেন :

"A great literature will be born among us as our struggle advances, as we master aesthetic forms, as we attain sincerity through which alone it is possible to move the artist's talent and achieve works which approximate to the demands of the subject-matter."

এর অর্থ এই নয় যে, সৃজনশীল প্রতিভার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কোন সমালোচনা চলবে না। এর অর্থ এই যে ভাববাদী, ব্যক্তিভিত্তিক বুর্জোয়া ধারনার বশবর্তী বা ব্যক্তির ভাল লাগা না লাগার মানদণ্ডের পরিবর্তে সামাজিক বাস্তবতার মানদণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ আনন্দ, মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তি,—"জীবনধারণের বাস্তব উপকরণগুলির উৎপাদন পদ্ধতি সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানস জীবনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে—" উদ্ধৃত করে

বলেছেন যে এই যুক্তি আজকাল অনেকেই মানেন কিন্তু কিছু কিছু সমাজ-তাত্ত্বিক এই যুক্তিকে এমন যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করেন যার ফলে প্রতিক্রিয়ার সুবিধা হয়—কাজেই আমাদের সরল সমীকরণও উত্তেজনাবাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।

এর পর তিনি সাহিত্যের সামাজিক বিশ্লেষণ কাকে বলে তা' মার্ক্সের পূর্বোক্ত উক্তির সাহায্যে সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং বাল্‌জাক ও টলষ্টয় সম্পর্কে মার্কস্‌ ও লেলিনের উক্তির উল্লেখ করেন। যে সব নিস্পৃহ বুদ্ধিজীবী ও সৌখিন সমালোচকরা মনে করেন যে এই ধরণের সমালোচনার দ্বারা সাময়িক-সামাজিক প্রয়োজনের কাছে সত্য, শিব ও সুন্দরের মানদণ্ড বর্জিত হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ করে শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেন যে প্রকৃতপক্ষে চিরাচরিত মূল্যগুলিকে ফ্যাশিজমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগঠিত বামপন্থী দলগুলিই আজ চেষ্টা করছে। তাই বেন্দা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উদারনৈতিকরা আজ সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেন চিরাচরিত মূল্য আমাদের হাতে নষ্ট হতে পারে এই ধারণার উৎস হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী ও অহংবাদী যারা সমাজবহির্ভূত লোক। এই প্রসঙ্গে তিনি গর্কির 'একজন বুদ্ধিজীবীর প্রশ্নের জবাব' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "If we prefer to reinterpret the old values, the cardinal values, so that they may come to be regarded not surely as abstract virtues or ends in themselves but related to the requirements of the changing society to which we belong and which we seek further to transform, that does not mean that we have no morals." আমাদের প্রগতি লেখক সংঘ হবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য এমন একটা সংগঠন যেখানে নানাবিধ দার্শনিক, ধর্মনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস নিয়েও লেখাকে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষা এবং অতীতের উপযুক্ত সমালোচনার দ্বারা নূতন সংস্কৃতি গড়ার কাজে একত্র হতে পারবেন। এই সংঘে পণ্ডিত, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার এবং সাধারণ পাঠক ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণ-তান্ত্রিক আদর্শ ও ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার জন্য লড়বেন। অত্যাচারিত দেশের লেখক আমরা এই যুদ্ধে ধনতন্ত্রের ধ্বংস দেখেছি। দীর্ঘকাল আমাদের দেশ দখলকারীর হাতে থাকার ফলে যুদ্ধ ও পরাধীনতার মর্ম আমরা বুঝেছি, নতুন সমাজ গঠনের তাগিদ আমরা বোধ করেছি, কাজেই

আমাদের সব কিছু বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করতে হবে এবং তার জন্যই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাও বেশী। মেকলের শিক্ষায় আমরা জেনেছিলাম যে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়ার বস্তু এবং এখন আমাদের সরকারী সূত্রে বলা হচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃতি এত বড় যে বাইরের ধাক্কা তাকে কিছুই করতে সাহস পারবে না।

চীন ও স্পেনের অবস্থা দৃষ্টান্তে এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের উপর দেড়শ বছর ধরে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত এসে দাসত্বের স্থায়িত্ব বাড়াচ্ছে বলে আজ সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্য অত্যাবশ্যক। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সাংস্কৃতিক শক্তির সমাবেশ প্রাথমিক প্রয়োজন। কেবল দেশের ঘটনাবলী নয় বিদেশের ঘটনাবলী ও আমাদের উপর এই ধরণের দাবী জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্যারিসস্থ আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ এবং তার শাখা হিসাবে আমেরিকা ও চীনের লেখক সংঘ গঠনের কথা উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্যারিস, লণ্ডন ও মাদ্রিদ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে লণ্ডন কংগ্রেসে বিশ্বসংস্কৃতির উপর যে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করার কথা হয়েছিল, স্পেনে ফ্যাশিজমের আক্রমণে সে ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায় এবং সংগঠন স্পেনের পক্ষে গণতান্ত্রিক শক্তি সমবেত করতে চেষ্টা করেন। ফলে বহু লেখকের অনেক কিছু সংস্কার ভেঙ্গে যায়, বহু লেখক স্পেনের রণক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য পণ্ডিত নেহেরু গণতান্ত্রিক স্পেনের রণক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। জার্মানী থেকে টমাসম্যান, আইনস্টাইন ও ফ্রয়েডের নির্বাসন, পুথিপত্র আগুনে নিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা লেখকদের ইটালী, জার্মানী ও জাপান সম্পর্কে অনেক মোহ দূর করে। অবশ্য ভারতীয় লেখকদের কাছে এসব অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্যবাদ অনেকদিন থেকেই দিয়ে এসেছে। তবু দুনিয়ায় বর্তমান অবস্থায় আমাদের ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণে করতে হলে আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রথম হচ্ছে : ঠিক সাধারণ রাজনৈতিক লোকের মত দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে অগ্রণী অংশের সহভাগী হতে হবে। এর জন্য শক্তিশালী সাংবাদিকতার মারফতে লেখকের দক্ষতা কাজে লাগবে। এতে কেবল লেখকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তাই নয় লেখক বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবেন, সংক্ষেপে ও শক্তিশালী ভাষায় বলবার শিক্ষা পাবেন এবং কুহেলিকাপূর্ণ চিন্তাধারার পরিবর্তে জনসাধারণের প্রকৃত

জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের জরুরী দাবীর সামনে লেখককে বারবার উপস্থিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত আমাদের অতীত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সাম্রাজ্যবাদী কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অপব্যবহারে বাধা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সামন্ততন্ত্র বজায় আছে বলে এই দেশীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, পুরাতনকে বাঁচিয়ে তোলা, পৌরহিত্যবাদ, ও গোঁড়ামীর মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রগতি লেখককে এই সকল অবস্থা বুঝে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তৃতীয়ত, শিল্পকলাকে জনপ্রিয় করার সমস্যা ভারতীয় লেখকদের সমাধান করতেই হবে। এ দেশের শাসকরা ইচ্ছে করে দেশের বিরাট অংশকে অজ্ঞ করে রেখেছে। কাজেই লেখককে নজর রাখতে হবে সেই সব উপায়ের উপর যার দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত করা যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দ এর জন্য মফস্বলে লাইব্রেরী, বইয়ের দোকান, কংগ্রেস ও ছাত্র আন্দোলন মারফৎ শিক্ষার প্রচার এবং হিন্দুস্থানী রোমান অক্ষরে প্রবর্তন করার উপায় নির্দেশ করেন।

তিনি অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার উল্লেখ করে গুজরাটি, বাংলা, তামিল, মারাঠি, পাঞ্জাবী ও পুস্তু ভাষার উন্নতির উপর জোর দেন। এ ছাড়া ডকুমেণ্টারী ফিল্‌ম, ব্যবসায়ী পরিচালিত ফিল্‌ম, বেতার এবং সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা (জাকির হোসেন ব্যবস্থা) মারফৎ শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে লেখককে যোগ দেবার কথা বলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ শেষ প্যারায় বলেন : The task of building up a national culture on the debris of the past so that it takes root in the realities of the present, is the only way by which we will take our place among these writers of the world who are facing with us the bitterest struggle in history, the struggle of the peoples of the world against imperialism, it twin brother fascism, its old aunt feudalism and all other aunts who refuse to let the new shoots of life from bursting into future."

শ্রীযুক্ত আনন্দ এই বক্তৃতায় কয়েকটি জায়গায় অস্পষ্ট কথা বল্লেও মোটামুটি ভারতীয় প্রগতি লেখকসংঘ সম্পর্কে এবং ভারতীয় লেখকদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক কথাই বলেছেন। ' কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কি কর্মপদ্ধতি নিয়ে কাল-চারাল ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়তে হবে সে সম্পর্কে তিনি কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি

হওয়ার সুযোগ দেন নি। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে ভালরকম ওয়াকিবহাল না হয়েও (অনেক সময় ভুল খবর রেখেও) সাধারণভাবে ভারতের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং নতুনভাবে সেগুলি সমাধান করার জন্য সাহিত্যিক ও পাঠকদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন। আমরা পরে দেখতে পাব যে এই সম্মেলন সম্পর্কে যারা নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন—তারা শ্রীআনন্দের বক্তৃতার প্রকাশ্য সমালোচনা করতে সাহস পাননি। কারণ শ্রীআনন্দের আবেদনের মধ্যে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কাছে সমগ্র জাতির সংগ্রামশীল চেতনার দাবী ছিল—যার বিপক্ষে সোজাসুজি দাঁড়ানো সে যুগে প্রত্যক্ষ বৃটিশ ভক্ত ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই এই সম্মেলনকে আক্রমণ করার জন্য প্রথমে এর দুর্ব্বল অংশের উপর আক্রমণ করে পরে মুল্‌করাজের মূল বক্তব্যকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ করা হয়।

১৩৪৫ (১৯৩৯) সালের মাঘ মাসের, 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্তের দল প্রচলিত সমালোচনার সুরে মৌলিক প্রশ্ন তোলেন;—" কিন্তু মূলেই গলদ। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, সেক্সপীয়র, নিউটন, কীট্‌স্‌, ডিকেন্স, ডষ্টয়ভস্কি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জানি—প্রগতি সাহিত্য কি ? মানব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যাহার গতিপরিণতি, সেই সাহিত্যের স্বতন্ত্র বিশেষণ কেন ? এমন কোন সাহিত্য কি আছে, যাহার গতি বিপরীত দিকে ? শোনা যায়, পৃথিবীর বহু সাহিত্যিক সময়ের অগ্রগামী ছিলেন এবং হয়ত এখনো আছেন, কিন্তু পশ্চাদগামী সাহিত্যের কথা তো শুনি নাই। সাহিত্যের এমন মাপকাঠি কি সৃষ্টি হইয়াছে, যদ্দারা প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনকে এক নিঃশ্বাসে মাপা যায় ? গোস্বামী-মজুমদারের (সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) নেতৃত্ব দৃষ্টে মনে হয় আপ্রাণ পরিস্থিতির স্বার্থেই যেন প্রগতি সাহিত্যের যোগ। অথবা প্রগতি সাহিত্য কুলি-মজুর ক্ষেপাইবার সাহিত্য ? সাহিত্য নিভৃত সাধনা এবং নিশ্চিন্ত অবসর বিনোদনের সঙ্গী। ইহার গতি আছে প্রগতি নাই। দল বাঁধিয়া পতাকা উড়াইয়া ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ মন্ত্রে সাহিত্যকে বাঁধা যায় না, অন্তত এতদিন যায় নাই।"

ঐ একই সংখ্যায় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখলেন :—" সম্প্রতি একটি আধুনিক সাহিত্যিক সভায় তাহার পাঞ্জাবী সভাপতি (ডঃ আনন্দ) বলিয়াছেন যে, আধুনিক লেখকের কাজ হইতেছে

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত নূতন সভ্যতার বানীরূপেই আধুনিক সাহিত্যকে বর্তমানের বাস্তব পারিপার্শিকতার মধ্যেই শিকড় গাড়িয়া সাজাইয়া তোলা। এই আদর্শের সহিত আমাদের বিরোধ নাই। আপত্তি শুধু তথাকথিত আধুনিক লেখকদের এই আদর্শের মৌলিকত্বে হস্তারোপ করায় এবং তাহাদের অধিকাংশের অক্ষম প্রচেষ্টার জোর গলায় মাহাত্ম্য প্রচার ......সাধারণ মানুষকে কাল্পনিক বিচিত্রায় সাজাইয়া যাহারা আধুনিকতা প্রচার করেন—তাহারা উপকথার লেখক অপেক্ষা চিন্তারক্ষেত্রে উচ্চস্থান পাইতে পারেন না... ...নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রোপাগাণ্ডার আসরে সে সাহিত্যের আদর হইতে পারে—কিন্তু সত্য, ভাব ও রসের আসরে, স্থান কোথায় ?”

এছাড়া বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা এদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। বুদ্ধদেব বাবু তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্রযুগ অতীত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যদিও তাঁদের লেখা বাংলাদেশ গ্রহণ করছে না—কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁদের পক্ষে।

“পূর্বাশা” কাগজ ঐ সালে পৌষ সংখ্যায় লেখে প্রগতি লেখক সম্মেলনের বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বাবু তাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্পর্কে অন্ধ থেকে এই আক্ষেপ করেন যে তাদের সাহিত্য বহুল প্রসারলাভ করছে না...বুদ্ধদেব বাবু প্রগতি আন্দোলনকে আপন সাহিত্য প্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেই নিরস্ত নন। তাঁর “কবিতা” কাগজের একদল বন্ধুকে সঙ্গে নিতে চান। সময়ের মাপকাঠি হাতে নিয়ে যদি বুদ্ধদেববাবু ‘রবীন্দ্রসৃষ্ঠ যুগ অতীত হয়েছে’ বলে থাকেন তবে তাঁর সেই শিশু সুলভ যথার্থবাদিতা উপহাসেরও অযোগ্য।”

কিন্তু “শনিবারের চিঠি” আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধদেবের বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি দিল : “The moment of desire ! The moment of desire ! the virgin who pines for the man, shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.” এর মন্তব্যে “শনিবারের চিঠি” লেখে : “যে ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কালের প্রবহমানতাকেই কার্যতঃ ইহারা অস্বীকার করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর কি মানুষের সার্বজনীন মনুষ্যত্ব ও বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে ?...অতএব দল গড়িলেই কোন কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা স্থানে শাখা-

প্রশাখা স্থাপন করিয়া একটা 'নিখিল' উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। যাহারা অন্তরে ধর্মহীন, আধুনিক যুগের অহম-মদমত্ততায় যাহারা প্রাণের স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে এবং সর্বশেষে যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারাই এই প্রগতির ধূয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে।"

হীরেনবাবুদের চেষ্টায় মার্কসবাদী সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ার প্রথম যুগে এমনিভাবে মতাদর্শের সংগ্রাম শুরু হয়। আমি আগেই বলেছি যে ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এবং গোটা মার্কসবাদী আন্দোলনে সংস্কৃতি বিষয়ক ক্রিয়াকর্মে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ঘোষণা ও সংগঠনে নানা দুর্বলতা প্রবেশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে যে ভাঙন সৃষ্টি হয় তার প্রতিক্রিয়া প্রগতি লেখক সংঘের উপরও পড়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক সংঘের কাজ প্রায় বন্ধ হলেও বাংলায় তরুণ মার্কসবাদী গোষ্ঠী "অগ্রণী" ও পরে "অরণি" কাগজের মাধ্যমে বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মার্কসবাদী দৃষ্টি কোণ থেকে আক্রমণ সুরু করে, যার পুরোভাগে ছিলেন বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ চৌধুরী ও সরোজ দত্ত। অধ্যাপক গোপাল হালদারও আমাদের পক্ষে ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁদের সম্পাদিত 'নব পর্যায় ভারতে' আমি প্রথমে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং তারপর সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষ 'অগ্রণী', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতিতে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বিনয় বাবুর প্রবন্ধগুলি দুটি বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়। 'অগ্রণী' কাগজে সমর সেনের In defence of decadence (ক্ষয়িষ্ণুতার স্বপক্ষে) প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা সরোজ দত্ত করেন। গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসুর 'শিল্প সর্বস্বতা'র মুখোস খুলে দেন। তাছাড়া সুবোধ ঘোষকে নিয়ে তরুণ গ্রুপের উৎসাহ বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর ভালো লাগেনি। ফলে হীরেন বাবুরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তরুণদলের উগ্রতা দেখে। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের একটা আপোষরফা হল ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ভিতর দিয়ে যখন সুবোধ ঘোষ চলে গেলেন এবং সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষের চেষ্টায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। তরুণ মার্কসবাদীরা যে একেবারেই নির্ভুল ছিলেন তা আমি বলছি না।

অগ্রণী [জ্যৈষ্ঠ—কার্তিক]—১৩৪৮ সাল।

কৃষক সমস্যা ও রামমোহন রায়

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং জমির স্বত্ব নিয়ে আজকাল বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা চলছে। চীনের ভূমিসমস্যা সমাধানের সাফল্যে এদেশেও নূতন করে এই সমস্যা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তাই সকলে বোধ করছেন। বস্তুতঃ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা এদেশের চিন্তানায়করা অনেক দিন ধরেই করেছেন এবং আজ যে সমাধানের কথা বলা হচ্ছে তার আশে পাশে তারা অনেকদিন ধরেই ঘুরেছেন ; কিন্তু এদেশের বাস্তব অবস্থার জন্য এবং সেই অবস্থার সঙ্গে তাদের নিজেদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি ও চিন্তাধারা জড়িত থাকায় তাবা ঠিক আজকের সমাধানের সঙ্গত কারণেই পৌছাতে পারেন নি।

জাতীয়তাবাদী মহলে রাজা রামমোহন রায়কে বর্তমান ভারতের জনক বলা হয়। মার্ক্সবাদী মহলে তাঁকে বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। বস্তুতঃ আজকে ভারত যে ধরণের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস মার্কা স্বাধীনতা পেয়েছে ১২০ বছর আগে রামমোহন ঠিক তাই দাবী করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, ইংরেজের সাহায্যে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান চেষ্টা প্রভৃতি আজ যে সব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশের সামান্য লক্ষণ এদেশে দেখা যায় তার সব কিছুরই দাবী তিনি করেন। কাজেই তিনি ভারতের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলে গেছেন—তা' আজ বিবেচনার যোগ্য।

রামমোহন ইজারাদারদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালেকটরীতে প্রায় ১৩ বছর দেওয়ানী করেন। এই দেওয়ানী কাজে রামমোহনকে বিভিন্ন জেলার সমস্ত জমি জরিপ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করে দিতে হ'ত। ১৩ বছরের কাজে তিনি লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করেন এবং তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন যে তিনি ঘুষ না নিলেও 'ন্যায্য উপরি' নিয়ে এই অর্থ সঞ্চয় করেছেন। সে যাইহোক রামমোহনের অধিকাংশ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশের তৈরী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট-জমিদার। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, তেলেনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

তৎকালীন ভারতের অবস্থা

রামমোহনকে বিচার করতে হলে তার সমসাময়িক দেশের অবস্থা ভেবে দেখতে হবে। মুসলমান রাজত্ব পতনের যুগে তিনি জন্মেছিলেন। একদিকে সেই শাসনের চরম দুরবস্থা যেমন তিনি দেখেছিলেন—তেমনি দেখেছিলেন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া লুণ্ঠন এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতি বৃটিশদের প্রবল প্রতিরোধ। বস্তুতঃ রামমোহনের পরিণত বয়সে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ীরা জয়ী হয়। রামমোহন জানতেন যে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় যে ধরণের ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন, লর্ড কর্ণওয়ালিশ সেই ব্যবস্থাই সামান্য রদ বদল করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সৃষ্টি করেন। তিনি এও জানতেন যে কোম্পানী প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা অস্থায়ী জমিদারী প্রথার মারফৎ এদেশের সমস্ত অর্থ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবসার মূলধন সঞ্চয়ের তাগিদে। ফলে এদেশে বারবার দুর্ভিক্ষ হচ্ছে ও দেশের লোকের ব্যবসা ধ্বংস হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বৃটেনেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের জিনিষ ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে লাভ ক'রত। কিন্তু ভারত লুণ্ঠনের ফলে যে প্রাথমিক পুঁজি বিলাতে সঞ্চিত হয়েছিল এবং তার ফলে বৃটেনে যে শিল্পকারখানাজাত পুঁজি সৃষ্টি হয়, ভারত সম্পর্কে সেই পুঁজির মালিকদের শোষণ নীতি ভিন্ন রকমের ছিল। তারা চেয়েছিল ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহ-কারী এবং বিলাতে তৈরী মাল বিক্রয়ের বাজার হিসাবে। তাই তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রথাব অবসান চায়। এই যুগে লর্ড কর্ণওয়ালিস আসেন ও ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন।

অবশ্য বাংলায় যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হ'ল—তা অন্যত্র হয় নি; যুক্ত-প্রদেশে অস্থায়ী জমিদারী এবং দক্ষিণ ভারতে রায়তোয়ারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর কারণ প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছিল। অর্থাৎ মুসলমান শাসনের সুনিশ্চিত অবসান ঘটানো এবং সেই শাসন যেন কোন ভিত্তি না পায় —তার ব্যবস্থা করা ও প্রত্যক্ষ ভাবে লুণ্ঠন করা। এছাড়া বৃটেনে কোম্পানী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরস্পর বিরোধিতা ভারতে সর্বত্র একই ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তবে দুইটি বিষয়ে ইংরাজ মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম হ'ল—বিজয়ী হিসাবে কোম্পানী মূলতঃ সমস্ত জমির মালিকানা

লাভ করে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল—ফসলের কথা বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণে খাজনা আদায় করা।

তা'ছাড়া জমিদারী, সাময়িক জমিদারী (ইজারাদারী), রায়তোয়ারী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে খাসমহল, মৌরসী, মেয়াদী পাট্টা প্রভৃতি আইনগত ব্যবস্থা বজায় রাখার ফলে কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল জমিদার ইজারাদার রইল না, তৈরী হল অসংখ্য মধ্যস্বত্ব ভোগী যারা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বৃদ্ধি না করতে পেরে কেবল জমির উপর নির্ভর করবে এবং মূলত কৃষককে শোষণ করতে বাধ্য হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রচয়িতা লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিজেই তার স্মারক লিপিতে বলেন, 'তিনি এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে এমন শ্রেণী এই ব্যবস্থা জন্ম দেবে যার সঙ্গে আগেকার জমিদারদের কোন সম্পর্ক নেই। আগেকার জমিদার বলতে তিনি তাদেরই বুঝিয়েছিলেন যারা মুসলমান রাজত্বে রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে প্রজার উন্নতির কথা ভাবতেন, জল নিষ্কাষণ, বীজ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করতেন। বলা বাহুল্য এই ধরণের পুরানো জমিদাররা যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে মারা পড়েন তা সর্বজন বিদিত। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হিসাবে ১৮২৯ সালে বলেন: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে সত্য, তবু এর দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণকর্তৃত্বশীল বড় একদল ধনী ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে—যারা নিজেদের স্বার্থে বিস্তৃত গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকবে।

পূর্বেই বলেছি যে ভারতের সব জায়গার হিসাব নিলে দেখা যাবে তৎকালীন শাসকবর্গের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খুব প্রিয় ছিল না। বাংলা, বিহার ও উত্তর মাদ্রাজের কিছু অংশে অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের ১৯ ভাগে এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সাময়িক জমিদারীর ব্যবস্থা ছিল যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলার কিছু অংশ অর্থাৎ ভারতের ৩০ ভাগ জমিতে। রায়তোয়ারী প্রথা চালানো হল বোম্বাই, বেরার, সিন্ধু, আসাম ও মাদ্রাজের অধিকাংশ জায়গায়—। অর্থাৎ ৫১ ভাগ জমিতে। এই সমস্ত প্রথার সুফল ও কুফল অল্পদিনের মধ্যে যা দেখা দিয়েছিল তা রামমোহন জানতেন। তিনি

একথাও জানতেন এবং নিজে বিলাতে গিয়ে বলেছেন যে মোগলদের তুলনায় বৃটিশরা অনেক বেশী রাজস্ব আদায় করছে ভারতবাসীর কাছ থেকে।

রামমোহন কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন

তবু রামমোহন কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক হয়েছিলেন তা তাঁর বিবৃতি থেকে আন্দাজ করা যায়। তিনি আশা করেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপর বারম্বার বে-পরোয়া লুঠ বন্ধ হবে এবং নতুন জমিদারদের হাতে ক্রমান্বয়ে এমন মূলধন সঞ্চিত হবে যার ফলে দেশী ব্যবসা-বানিজ্যের সুবিধা হবে। রামমোহন ১৮৩১ সালে বিলাতে থাকার সময় হাউস অব কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটির সামনে যে সাক্ষ্য দেন তার থেকে তাঁর এই মতামতের আভাষ পাওয়া যায়। রামমোহন সেখানে পরিস্কার জানান যে প্রাচীন ভারতে রাজা জমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। জমি ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা গ্রামের সম্পত্তি ছিল। জমি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাজা উৎপন্ন ফসলে $\frac{1}{6}$ অংশ বা $\frac{1}{8}$ অংশ পেতেন। পতিত জমি বা জঙ্গল প্রভৃতি যার কোন নির্দ্দিষ্ট মালিক ছিলনা সেগুলি রাজার মালিকানায় ছিল। বিজয়ী মুসলমান রাজারাই প্রথমে জমির উপর স্বত্ব কায়েম করেন। তবু মোগলদের সময় জমির উপর কৃষক, জমিদার ও রাজা তিন জনের স্বত্ব ছিল। ইংরাজেরা প্রধানতঃ এই ব্যবস্থার সামান্য রদবদল করে কাজ সুরু করেছে। রামমোহন নিজের মত হিসাবে বলেন যে রাজার অধিকার স্বীকার করার পর একমাত্র প্রজার স্বত্বই মানা উচিত। বিশেষতঃ খোদকস্ত রায়তদের স্বত্ব স্বীকার করা একান্ত ন্যায়সঙ্গত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কাদের বেশী সুবিধা

সিলেক্ট কমিটি যখন প্রশ্ন করলো—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অবস্থা উন্নত হয়েছে কিনা—তখন তিনি জবাবে বলেন, 'নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উন্নতি করলেও খাজনা বৃদ্ধি হয় না বলে তারা পতিত জমি চাষ করিয়ে এবং কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধি করে নিজেদের আয় ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।' এর ফলে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে সরকার কোন রকম ক্ষতি স্বীকার করেন নি। কারণ জমির উপর যে

পরিমাণ রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ধার্য্য করা হ'ল—সেই পরিমাণ রাজস্ব মুসলমান বা বৃটিশ আমলের সুরুতে কখনো আদায় করা হয় নি।

বাংলা দেশে মোগল অনুচরদের শাসনের শেষ বছরে ১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে প্রথম তা' বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে এই আদায়ের পরিমাণ হ'ল ৩০ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড। সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার জন্য ওকালতি করেন। কারণস্বরূপ তিনি এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর জমির আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির নজির দেন। তিনি বলেন ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে আমদানী-রপ্তানীশুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারেরও আয় বেড়েছে।

জমির আয় বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে তিনি মাদ্রাজের রায়তোয়ারী প্রথায় আদায়ীকৃত কম রাজস্বের সঙ্গে বাংলায় চিরস্থায়ী প্রথায় আদায়ীকৃত বেশী রাজস্বের তুলনা করেন।

রামমোহন জানতেন যে সব অঞ্চলে অস্থায়ী জমিদার ছিল, তারা কি ভাবে ধ্বংস হচ্ছে এবং রায়তোয়ারী প্রথাতেও কৃষকরা দেশী ও বিদেশী আমলাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। কাজেই তিনি একটা মধ্যপন্থা হিসাবে বাংলার আদর্শে সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইছিলেন—এ ভাবা অযৌক্তিক নয়। ইংরাজের নিজের লোকেদের দ্বারা তৈরী মাদ্রাজের রাজস্ববোর্ড ১৮১৮ সালের ৫ই জানুয়ারীর স্মারকলিপিতে মাদ্রাজে প্রবর্তিত রায়তোয়ারী প্রথার বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে তা' উল্লেখযোগ্য:

"...নব প্রবর্তিত যে ব্যবস্থা হ'ল তাতে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম বা এষ্টেট হিসাবে খাজনা ধার্য হল না, বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের প্রতি খণ্ড জমি হিসাবে খাজনা ধার্য করাই হ'ল নতুন ব্যবস্থার বিরাট অপকীর্তি! শাসকদের এই তথা-কথিত "উন্নত" ব্যবস্থা অনুসরণ করার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ভারতের সাধারণতন্ত্র মূলক গ্রামগুলির পুরাতন বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে; যে জমি অনাদিকাল ধরে গোটা গ্রামের সম্পত্তি ছিল, তাকে আলাদা করে নতুন কায়দায় বিলি-ব্যবস্থা করছে; "নির্দিষ্ট হারে" খাজনা ধার্য করব বলে এত বেশী করধার্য করেছে যা কখন ও আদায় হতে পারে না। নিজেদের খুশীমত রায়তের উপর খাজনা ধার্য করছে, পূর্বগামী মুসলমান শাসকদের

মত রায়তকে জোর করে লাঙ্গলে বেঁধে রাখছে, অতিরিক্ত খাজনার জমিতে তাদের চাষ করতে বাধ্য করছে। যদি সে জমি ছেড়ে পালায় তা হলে তাকে ধরে এনে আবার জমিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর যতদিন ফসল না হবে ততদিন চুপ করে থেকে ফসল হলেই যতটা পারে আদায় করে নিয়ে চাষীকে শুধুমাত্র তার বলদ ও বীজশস্য রেহাই দিচ্ছে। অনেক সময় সে সম্বলও চাষীর থাকে না; সে ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে সরকার নিজের লাভের জন্য,—চাষীর জন্য নয়—চাষীকে উক্ত উপকরণগুলো যোগান দিয়েও চাষীর এই প্রানান্তকর চাষবাসের কাজ চালু রাখছে।"

রায়তদের পক্ষে রামমোহন

রামমোহন সরকারী লাভালাভের বিবেচনায় রায়তোয়ারীর নিন্দা করেন এবং জমিদারী প্রথাতেও যে রায়তরা ভাল নেই সে কথাও বলেছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলার রায়তদের সরলতা ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন: 'শহর থেকে যতদূরে কৃষকরা আছে, ততই তারা সরল, নির্দোষ, নেশা ভাঙ করে না এবং নৈতিক চরিত্রশালী। অন্য কোন দেশের মানুষের তুলনায় তারা কোনক্রমে ছোট নয়। বরং শহরে যে সব মানুষ বিদেশীর সম্পর্কে এসেছে অথবা জমিদার বা এটর্নীদের কাছে যারা অল্প মাইনায় কাজ করে বলে উৎকোচ নিতে শিখেছে—তারাই ভ্রষ্টচরিত্রের লোক হয়েছে। (বাংলার অধিকাংশ কৃষক জনসাধারণ সম্পর্কে একথা আজও কত সত্য!) রামমোহনকে যখন প্রশ্ন করা হল: "বাংলার জমিদারী এবং মাদ্রাজের রায়তোয়ারী প্রথায় চাষীদের অবস্থা কেমন?"—তিনি জবাব দেন: "দুই প্রথাতেই চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক; একটি প্রথায় তারা জমিদারের অতিলোভ ও যে কোন প্রকারে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছের খোরাক, অন্যত্র তারা কানুনগো, সরকারী আমিন ও পেয়াদার শঠতা ও জবরদস্তি শোষণের খোরাক। আমি এই দুই প্রকার চাষীর জন্য গভীর দুঃখবোধ করি। বাংলা দেশে কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, জমিদারের প্রতি সরকার অনুগ্রহ করেছেন রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দিয়ে, কিন্তু সে অনুগ্রহটুকু থেকে গরীব চাষীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফসল যে সময় বেশী হয় ও দাম কম থাকে, তখন জমিদারের প্রাপ্য শোধ করতে চাষীকে ফসলের প্রায় সবই বেচে দিতে হয়। বীজধান, কৃষিমজুর পোষার বা নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় খোরাকীও সে রাখতে পারে না।" ক্ষেত মজুরদের প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন যে.

তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলতে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। ক্ষেত মজুররা কোন দিন স্বচ্ছল জীবন যাপন করেন এ কথা তিনি কোন দিন শোনেন নি বা জানেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ সালে বাংলায় মজুরীর হার খোরাকী সহ ছয় পয়সা ছিল বলে জানতে পেরেছেন এবং এই সময় চাউলের দর ছিল টাকায় ৩০ সের। তখনকার তুলনায় আজ এই সমস্যা কেবল তীব্রতর হয়নি ব্যাপকতর হয়েছে। কারণ আজ ক্ষেতমজুরের সংখ্যা অনেক বেশী। তারপর রামমোহনকে প্রশ্ন করা হয়, কৃষকেরা খাজনা বাকি রাখলে আদায় করা হয় কি ভাবে? তিনি প্রথমে জবাব দেন যে জমির মালিক নিজের চেষ্টায় অথবা আদালতের আশ্রয়ে আদায় করে। কিন্তু প্রশ্নটিকে যখন আর পরিষ্কার ভাবে করা হয়, তখন তিনি বলেন: "সরাসরি পুলিসকে জানিয়ে তার সাহায্যে অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হয় এবং আদালতের সাহায্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং চাষীকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

চিরকালের জন্য চাষীর খাজনা বেঁধে দাও

কৃষক এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য তার নিজের কোন সুপারিশ আছে কিনা, এই প্রশ্নে বলেন "৪০ বছর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে জমিদাররা নিজেদের খুশীমত জমির পরিমাণ হিসেব করে যতদূর সম্ভব খাজনা বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। কাজেই আমার সর্বনিম্ন প্রস্তাব এবং সরকারের সর্বনিম্ন কর্তব্য হচ্ছে কোন অছিলায় যাতে চাষীর খাজনা আর বৃদ্ধি না পায় তার জন্য চাষীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ যেমন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা জমিদারদের সাথে করা হয়েছে, তেমনি চাষীদের খাজনাও চিরদিনের মত স্থির করে দিতে তিনি বলেন। রামমোহনের ধারণা ছিল যে, সরকার চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তে রায়তোয়ারী ব্যবস্থা বেশী পছন্দ করেন। বস্তুত বৃটিশ ভারতের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জমিতে রায়তোয়ারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দেখেই রামমোহনের এই ধারণা হয়। বৃটিশ শাসকেরা যে চিরস্থায়ী জমিদার প্রথার ভক্ত নয়, তা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ দেখলেই বোঝা যায়। এই কমিশন সুপারিশ করেছিল যে সরাসরি সরকারের অধীনে রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। ১৫০ বছর ধরে জমিদাররা যে পরিমাণ লাভ করেছে তার উপর সরকার ভাগ বসাতে না পারার জন্যই এমন ধরণের সুপারিশ এসেছিল। কৃষকদের উপকার করাব কোন সুমতলবে তারা এ কাজ করে নি।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি-সংস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা

ইংরাজ শাসন কয়েকটি বিষয়ে মুসলমানদের শাসন অপেক্ষা উন্নততর বলে রামমোহন মনে করতেন। কাজেই দেশের অন্যান্য সমস্যার মত ভূমি সমস্যাতেও এমনি কতকগুলি ব্যবস্থা চাইছিলেন যা ইংরাজ শাসনের মধ্যেও দেশের লোকদের অবস্থা উন্নত করতে পারে। জমির উপর স্বত্ব ঠিক থাকলে এবং তার খাজনা বৃদ্ধি না হলে কৃষকদের অবস্থা কতকটা ভাল থাকতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি "লাঙ্গল যার জমি তার" এই আওয়াজ তোলেন এবং বৃটিশ সরকারকে বলেন যে বৃটিশ সরকার এ কাজ করলে দেশরক্ষা বিভাগে বেশী ভাড়াটে সৈন্য রাখার প্রয়োজন হবে না। চাষীরা নিজ নিজ জমি রক্ষার জন্য সৈন্যদের থেকে অনেক বেশী জান প্রাণ দিয়ে লড়তে পারবে। তেমনি জমিদারী প্রথার সপক্ষে বলার সময় তার মনে ছিল যে রায়তোয়ারী প্রথায় সরকার অনেক অর্থ আদায় করবে এবং তা সোজা ব্রিটেনের কোষাগারে যাবে। তাই তার স্থলে দেশের লোকের হাতে যদি কিছু জমে, তাহলে তারা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। তিনি এমন প্রস্তাবও করেছিলেন যে ব্রিটেনের সম্ভ্রান্তঘরের লোকেরা এ দেশে এসে বসবাস করুক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। তাহলে তখন যেমন বিরাট সম্পদ ব্রিটেনে রপ্তানী হচ্ছিল সেটা বন্ধ হবে, এ দেশের টাকা এদেশেই থাকবে। তিনি বলেছিলেন যে, বৃটিশ শাসনের প্রধান দোষ হচ্ছে যে, মুসলমানেরা যেমন রাজকার্যে উচ্চপদে দেশীয় লোকদের নিযুক্ত করতো এবং এদেশে থেকে আয় করে এ দেশেই ব্যয় করতো, বৃটেন তা করে না। রামমোহন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের একটা রূপ যে দেখতে পেয়েছিলেন তা' এ সব থেকে বোঝা যায়। কিন্তু তিনি সে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মোলায়েম প্রতিবাদ করা ছাড়া, অন্য কোন পথ দেখতে পান নি। ফলে তার প্রতিবাদের মধ্যে প্রজাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছিল, কিন্তু লুণ্ঠনকারীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছিল না। মোগল-শাসনের সাথে তুলনা করেই তাঁর প্রথম বয়েসের ইংরাজ-বিদ্বেষ এমনি প্রশমিত হয়েছিল।

সেকালের সংবাদপত্রে রামমোহনের বিরুদ্ধে সমালোচনা

তাঁর চিন্তাধারার এই দুর্বলতা তার সমসাময়িক কালের লোকেরাও বুঝতে পেরেছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলির মধ্যে এর চমৎকার প্রকাশ আছে। বিলাতে গিয়ে

রামমোহন প্রজাদের পক্ষে যথেষ্ট কেন বলেননি—এই অভিযোগ করে 'বেঙ্গল হরকরা' যা' লেখে, তার মর্মার্থ আমি দিচ্ছি। প্রথমত জানা দরকার যে জমিদারী প্রথা উঠে যাক—এমন কথা 'বেঙ্গল হরকরা'ও খোলাখুলি বলে নি। তাদের বক্তব্য ছিল যে, প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা, খাজনার হার বৃদ্ধি করা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা এবং কৃষককে বে-আইনী গ্রেপ্তার প্রভৃতি করে রাখার যে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ঘটছে—রামমোহন সেই কথা খুলে বলার সুযোগ পেয়েও বলেন নি। ১৭৯৯ সালের আইনের ৭ম ধারার বলে জমিদাররা এবং সরকারী কর্মচারীরা এই সুযোগ পেয়েছে—এই কথা রামমোহন কেন যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেন নি, এর জন্য 'বেঙ্গল হরকরা' তীব্র অভিযোগ করে। রামমোহন অবশ্য রেভেন্যু অফিসারদের কর্ণওয়ালিস প্রদত্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে বলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জমিদাররা যে সব অভিযোগ এনেছেন, তার তদন্তও করতে বলেন। 'বেঙ্গল হরকরা' লেখে: "রামমোহনের সাক্ষ্য সমগ্র ভারতবাসীর মনে গভীর বেদনা সৃষ্টি করবে; কারণ তার সাক্ষ্যে দুধে জলই বেশী। তিনি কৃষকদের পক্ষ না নিয়ে জমিদারদের পক্ষ নিয়েছেন। যে আদর্শ নিয়ে তিনি লড়বেন আশা করা গিয়েছিল, সেই আদর্শের প্রতি তিনি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জমির মূল্যবৃদ্ধি কেন হচ্ছে এর জবাবে তিনি যখন বলছেন যে, পতিত জমি উদ্ধার এবং কৃষির আয় বৃদ্ধি এর কারণ, তখন তিনি এমন একটি ঘটনা চেপে যাচ্ছেন যা' তিনি বা বাংলার যে-কোন জমিদার ও ইজারাদাররা জানেন। ১৭৯৯ সালের ৭ম ধারা অনুযায়ী আইন সঙ্গত খাজনার উপর শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা যায় বলেই আজ জমির মূল্য বাড়ছে। রামমোহনের থেকে কে এ কথা আর বেশী করে জানতেন? কাজেই তাঁর মহান এবং অবধার্য কর্তব্য ছিল, শাসনব্যবস্থার এই চরম অন্যায়ের মুখোস খুলে ধরা এবং বৃটেনের বেনিয়া ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকারকে বলা—জমির প্রকৃত মালিককে শোষণের চাকার নিচে ফেলে দেওয়ার ফলে শোষিত কৃষক পরিশ্রম করবার সমস্ত প্রেরণা হারিয়েছে। "He has been so left, bent, bowed, and crushed beneath this Juggernath of extortion till, forgetting that all human motives to exertion are blank to him, we taunt him with his apathy and his indolence and his want of spirit to make improvements which would expose him to new extortion."

(দিনের পর দিন শোষিত কৃষক কেন নিজের বা পরের জমিতে পরিশ্রম করতে চায় না—১২০ বছর আগে তা' কত তীব্রতার সঙ্গে বলা হয়েছে !) জমিদারের অত্যাচারের কথা তিনি সাধারণ ভাবে বলেছেন, কিন্তু এটা যে দৈনন্দিন ব্যাপার এবং জমিদাররা কলিকাতার ৫০ মাইলের মধ্যে থেকেও সুপ্রীম কোর্টের আদেশকে অবহেলা করছেন, তা' তিনি বলেননি। লক্ষ-লক্ষ কৃষকের ধ্বংসের কথা এবং ক্ষেত মজুরদের কথা বলতে তিনি কাতর হয়ে ছিলেন। কিন্তু তার কারণ বলতে তিনি ইতস্ততঃ করেছেন। ক্ষেত-মজুরদের কথা তিনি নিজে না বলে বিশপ হেবারের কথায় বলতে পারতেন—তারা অজন্মার দিনে গাছ গাছড়া খায়—হাতীর নাদের মধ্যে খুঁটে খাবার যোগাড় করে। তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন আর্ত ভারতের কণ্ঠস্বর হিসাবে ভারতমাতার সন্তানদের অধিকার দাবী করতে, কিন্তু সেখানে আমরা তাকে দেখলাম জমিদার হিসাবে।'

জমিদার পক্ষের সমালোচনা

জমিদারদের পক্ষে রামমোহনের উক্তির ভিন্ন সমালোচনা হয় "সমাচার চন্দ্রিকায়"। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের উন্নতি হচ্ছে—এই উক্তির সমালোচনা করে "চন্দ্রিকা" লেখে যে,—এই উক্তি বিলাতের প্রশ্নকর্তারাও বিশ্বাস করেন নি। নতুবা তারা আবার রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন—রাজস্ব বাকীর জন্য জমিদারী বারবার বিক্রী বা হস্তান্তর হচ্ছে কি কারণে ? রাম-মোহন রায় জমিদারদের পুরানো অভ্যাস, ধর্মকার্য ও বিয়ে শ্রাদ্ধে ব্যয় ইত্যাদির উপর দোষ চাপিয়েছেন। রামমোহন হিন্দুদের এই সব কাজ পছন্দ করেন না বলে দোষারোপ করেছেন। আসল কারণ হল : পতিত জমি উদ্ধার হলেই সরকার তা দখল করে। নদী-নালা অনেক জমি ডুবিয়ে দেয়—সেগুলি ভেসে উঠলে সরকার তা নিজের করে নেয়। বন্যা বা অজন্মা হলে কৃষকরা খাজনা দেয় না—কিন্তু জমিদারকে দেনা করে রাজস্ব দিতে হয়, এমন কি কৃষককে খোরাকি ও বীজধান দিতে হয়। ৭ আইনে সরকার যে ভাবে জমি-দারকে কাবু করে—জমিদার সে ভাবে কৃষককে কাবু করতে পারে না। মামলা করার অবসরে কৃষক সম্পত্তি সব সরিয়ে ফেলে। জেলায় জেলায় জমিদারী থাকার ফলে জমিদারদের অনেক পেয়াদা ও নায়েব প্রভৃতি রাখতে হয়।

"সমাচার দর্পণ" নামে রামমোহনের পক্ষীয় একটি কাগজে একজন "গ্রামবাসীর পত্রে" এই উক্তি গুলি ভুল বলে প্রমাণ করা হয় এবং বলা হয়

—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতই যদি ক্ষতিকারক, তাহলে একজন জমিদারও তো তা' স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে রাজী নয়। 'জনবুল' কাগজ রামমোহনের পক্ষে লেখে। কিন্তু 'রিফর্মার' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেট' লেখে যে ইদানীংকালে বেশী ধর্ম-চর্চা নিয়ে থাকতেন বলে অন্যান্য সমস্যার খুঁটিনাটির কথা তিনি ভুলে গেছেন। 'সমাচার দর্পণ' ১৮৩২ সালের ২১ জুলাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে: 'বেঙ্গল-হরকরা' বলছে রামমোহন জমিদারদের পক্ষে এবং 'চন্দ্রিকা' বলছে তিনি জমিদারদের বিপক্ষে। আসল সত্য তাহলে এই দুই উক্তির মাঝখানে আছে। তবে রামমোহন বিলাতে যাওয়াতে দেশের উপকারই যে হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে।'

এই আলোচনা শেষ করার আগে 'বেঙ্গল হরকরা' কাগজটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এই কাগজটি বৃটেনের স্যামুয়েল স্মিথ কোম্পানীর কাগজ। সে কালে কাগজের সম্পাদকের নাম কাগজে ছাপা হত না—কাজেই সম্পাদকের নাম দিতে পারলাম না। কিন্তু এ কাগজ যে বৃটেনের 'স্বাধীন ব্যবসায়ী'দের মুখপত্র এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে লড়ছে তা এই কাগজের রামমোহন প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই কাগজ বেনিয়া ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে নিন্দা করেছে, কোম্পানী যে রাজ্য শাসনের যোগ্য নয় তাও বলেছে এবং রামমোহনের কয়েকটি যুক্তিকে 'শ্রীমতী কোম্পানী দেবীর' শেখানো বুলি বলে অভিযুক্ত করেছে। 'হরকরা' এমন কথাও বলেছে যে রামমোহনের যুক্তিগুলি যেন কোম্পানীর দেওয়ান হিসাবে, কোম্পানীর কৃপাপ্রার্থী হিসাবে করা হয়েছে। কোম্পানী সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা' লিখেছে যে কোম্পানী তার অংশীদারদের ডিভিডেণ্ট বেশী করে দেওয়ার জন্য প্রকৃত জমির মালিক ও প্রকৃত করদাতাদের অধিকারচ্যুত করে কর আদায়-কারীদের মালিক করে দিল।

'হরকরা' কিন্তু এদেশে ইংরেজ আসার বিরুদ্ধে ছিল না। সে সুন্দরবনে সাহেব জমিদারদের গুণের কথা বলেছে এবং রামমোহনের যুক্তি খণ্ডণ করে লিখেছে যে এদেশের উত্তরপ্রদেশে, বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চলের শীত-প্রধান দেশে সাহেবরা এসে বাস করলে দেশের উপকারই হবে। ইউরোপীয় প্লাণ্টারদের পক্ষে 'হরকরা' প্রচার চালিয়েছে।

'মুখপত্র'—১৩৫৯ সাল।

তারাশঙ্করের কমিউনিষ্ট-বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে

খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বছর ধরে সাম্যবাদ, সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে নানারকম নিন্দাবাদ করে আসছেন। প্রায় দু'বছর আগে "প্রাচী প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত "পরাভূত দেবতা"র ভূমিকায় এবং গতবছরের "শনিবারের চিঠি"র কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "সাহিত্য জীবন"-এ তিনি লিখিতভাবে এই কুৎসা প্রচারে নেমেছেন।

"পরাভূত দেবতা"র ভূমিকায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি নিজ অভিজ্ঞতার যে আভাষ দিয়েছিলেন "সাহিত্য জীবন"-এ তারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

কাজেই মনে করা যেতে পারে তাঁর বক্তব্য তিনি মোটামুটি বলেছেন এবং কারো যদি কিছু বলার থাকে তা হলে এখন বলা যেতে পারে।

যেহেতু "শনিবারের চিঠি"তে তিনি আমার নামও টেনে এনেছেন এবং তিনি যখন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে ছিলেন তখন আমি কিছুকাল তার সংগঠনে কর্মকর্তা হিসাবে ছিলাম, সেহেতু আমি সামান্য কিছু বলার অধিকারী। অবশ্য একথা আগেই বলে রাখা ভাল যে কমিউনিষ্ট পার্টি'র প্রতিনিধি হিসাবে এ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে না।

প্রথমেই আমি "পরাভূত দেবতা"র ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই কারণ তারাশঙ্করবাবুর এই দুটি রচনার মধ্যে এমন যোগাযোগ আছে যা তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন প্রচার দপ্তরের হাত

"পরাভূত দেবতা" 'God that failed' বইটির অনুবাদ। সোভিয়েত রুশিয়া ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রচার বিভাগ যে কয়টি ভাড়া করা লেখক যোগাড় করতে পেরেছে তাদের প্রবন্ধের সমষ্টি হল এই বই। এ বই ইউরোপে ও আমেরিকায় পাত্তা পায় নি। কারণ উক্ত বইয়ের লেখকদের স্বদেশের বুদ্ধিজীবীরা জানে এই সব লেখকের নৈতিক দুর্বলতার এবং নগদ মূল্যে

আমেরিকার প্রচার বিভাগের কাছে নিজেদের বিক্রী করে দেবার খবর। সেই সব দেশের অকমিউনিষ্ট সংবাদপত্র ও রচনা থেকে তা প্রমাণ করে দেওয়া যায়। কিন্তু উক্ত লেখকদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গে আমি বর্তমান প্রবন্ধে যেতে চাই না। আমি শুধু জানাতে চাই যে, "পরাভূত দেবতা"র এদেশীয় প্রকাশকরা হচ্ছেন Society for the Defence of Freedom in Asia নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। এদের পক্ষে প্রকাশিত ইস্তাহার এবং এদের লেখক সীতারাম গোয়েল ও রামস্বরূপের রচনা থেকে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী জানেন যে সোভিয়েত রুশিয়া, সাম্যবাদ ও চীনা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করাই এদের একমাত্র কাজ। মার্কিন প্রচার বিভাগের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল মাত্রই জানেন।

"পরাভূত দেবতা"র যে ভূমিকা তারাশঙ্কর বাবু লিখেছেন তা খ্যাতনামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দিয়ে লেখাবার জন্য এই প্রকাশকরা চেষ্টা করেছিলেন এবং সহস্রাধিক মুদ্রা দক্ষিণার লোভও দেখিয়েছিলেন,—একথা সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে বলেন। তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তারাশঙ্কর বাবু বিনামূল্যে এই ভূমিকা লিখেছেন কিনা জানি না—কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, 'শনিবারের চিঠি'র রচনাগুলিও উক্ত মার্কিন দরদী প্রতিষ্ঠানের হিন্দী পত্রিকা "প্রাচীতে" নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

"পরাভূত দেবতা" প্রায় ২৪ ফর্মার বই। এই বই মাত্র এক টাকায় বিক্রয় করা যে অত্যন্ত লোকসানের ব্যাপার তা তারাশঙ্কর বাবু লেখক হিসাবে নিশ্চয় জানেন। সুতরাং এই ধরণের পুস্তক রচনায় ও প্রকাশে মুনাফার দিকে লক্ষ্য না রেখে যে টাকার খেলা চলছে তা অস্বীকার করা দুষ্কর। তা ছাড়া এই বই বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে প্রতি লাইব্রেরীতে, এ প্রমাণও আছে। আমি নিজে যে কপিটি যোগাড় করেছি একটি লাইব্রেরী থেকে তাতে "প্রাচী প্রকাশনী"র ষ্ট্যাম্প দিয়ে কম্‌প্লিমেণ্টারী বলে ছাপ মারা আছে। সোভিয়েত রুশিয়া প্রকাশ্যভাবে অল্প দামে যে সব বই বিক্রী করে তারাশঙ্কর বাবু তার সততা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার কি জবাব আছে জানি না।

ত্রিশ সালের বিপ্লবীদের হেনস্থা

"পরাভূত দেবতা"র ভূমিকায় তারাশঙ্কর বাবু এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা পড়লে মনে হয় কোন রকমে কমিউনিষ্টদের হেয় করতে পারাই যেন তাঁর

উদ্দেশ্য—সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন দামই যেন নেই। এ মনোভাব ভাড়াটে লেখকদের কাছেই আশা করা যায়—তারাশঙ্করবাবুর কাছে আশা করিনি। ১৯৩০-৩৪ সালে জেলখানায় যে সব বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে সাম্যবাদ গ্রহণ করেন তাদের বিচারশক্তিকে হেয় করার জন্য তিনি অমলেন্দু দাশগুপ্তের "বক্সাক্যাম্প" নামক বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন: "পিতা হিন্দু হইলে যেমন সন্তান-সন্ততিবা হিন্দু হয়, কোন দল বা উপদলের নেতা কমিউনিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবর্ত্তিগণের ধর্মান্তর ঘটে, এ যেন আগে মুসলমান হইয়া পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা" ('পরাভূত দেবতা'র ভূমিকা)।

সত্য যাচাই করার যদি সামান্য তাগিদও অনুভব করতেন তাহলে তারাশঙ্কর-বাবু কারো কাছে না যেয়ে এবং কোন বই না পড়েও বলতে পারতেন বাংলা দেশের দুটি প্রধান বিপ্লবী দল "যুগান্তর" ও "অনুশীলনের" কোন প্রথম সারির নেতাই কমিউনিষ্ট হন নি। অনুশীলন পার্টির কোন কোন নেতা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণ করেন বটে—কিন্তু তাঁরা কেউই কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আসেন নি এবং সোভিয়েত রুশিয়া সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল। অথচ এই সব নেতাদের কি প্রভাবই না ছিল তরুণ বিপ্লবী কর্মীদের উপর! দেবতার মত এঁরা পূজিত হতেন এবং এঁদের মুখের কথায় অনেক তরুণ প্রাণ দিয়েছে ও দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। অথচ এই সব তরুণরা কিসের জন্য এই প্রভাব কাটিয়ে একে একে কমিউনিষ্ট পার্টিতে এলেন তা তারাশঙ্করবাবু ভেবে দেখলেন না। তিনি জানতে চেষ্টা করলেন না যে, জেলের ভেতর নানারকম মনঃকষ্ট, বন্ধুবিচ্ছেদ এবং শারীরিক নির্যাতনের ভাগী হতে হয়েছে এই পরিবর্তনের যুগে—যা নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা চলে। আজকের একজন খ্যাতনামা কমিউনিষ্ট নেতাকে বন্দীশিবিরে তাঁর সহবন্দীরা কমিউনিজম প্রচারের অভিযোগে এমনভাবে মারে যে তিনি তিনদিন মৃতপ্রায় ছিলেন। একটু ইচ্ছা থাকলেই তারাশঙ্কর বাবু অমলেন্দু দাশগুপ্তকেই একমাত্র সাক্ষী না মেনে এসব জানতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের স্থানে লুই ফিসার

কিন্তু বিচার করে সত্য গ্রহণ করার তাগিদের পরিবর্তে কুৎসা রটনা করার কাজে আজ তিনি নেমেছেন। তাই তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণগুলির গুরুত্ব নিজের খুশী মতই দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন

কর্তৃক ট্রট্স্কি বিতাড়ন এবং স্তালিনের মৃত্যুর পর বেরিয়ার পতন চন্তাশীল মানুষদের 'বৃহৎ অংশকে' সাম্যবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে। এই 'বৃহৎ অংশের' ছয় জনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে যারা সোভিয়েত রুশিয়ার পক্ষে বলেন তাদের থেকে উক্ত ছয় জনের (লুই ফিসার, স্টিফেন স্পেণ্ডার, রিচার্ড রাইট প্রভৃতি) খ্যাতি নাকি "বিপুলতর!" অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস করতে হবে—রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ, বারবুস, বার্ণার্ড শ', পিকাসো, ড্রাইসার, রোবসন প্রভৃতির চেয়ে উক্ত ছজনের খ্যাতি বিপুলতর!

১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান প্রভাবিত ইউরোপে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আঁদ্রেজিদ অবশ্য পূর্বোক্ত ছ'জনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। কিন্তু তাঁর রচনা আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর সারাজীবনের পরিবর্তনশীল জীবন-দর্শনের মূলে রয়েছে নৈরাজ্যবাদ যার সঙ্গে সাম্যবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এবারে তারাশঙ্করবাবুর 'সাহিত্য জীবনে' আসা যাক। এই রচনাটি পড়লেই মনে হয় যে তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কেন কাজ করেছিলেন তার একটা সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ কারো কাছে দিতে চেষ্টা করেছেন। মার্কিন দেশে একটি কমিটি আছে শুনেছি তাদের কাছে এমনি অনেককে জবাবদিহি করতে হয়। তারাশঙ্কর বাবুর বর্তমান মাতব্বর কংগ্রেস নেতারা তেমনি কিছু দাবী করেছেন কিনা জানি না।

তারাশঙ্কর বাবুর জবাবে আসলে দুটি কথা আছে: ফ্যাশিষ্ট বিরোধী সংঘ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক তা তিনি জানতেন না এবং কমিউনিষ্টদের গত দুর্ভিক্ষকালীন জনসেবাপরায়ণতা দেখে তিনি অবশ্যই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন এরা জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদ ও সুভাষবাদ বিরোধী তখন এদের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। ভারতের কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বিদেশের কমিউনিষ্টদের যোগাযোগের একটা প্রমাণও তিনি পাড়া করবার চেষ্টা করেছেন।

স্বীকৃতির প্রবল আগ্রহ

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই তারাশঙ্করবাবু ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন—একথা তিনি স্বীকার করেছেন। কেন যোগ দিলেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ঢাকায় বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নিহত তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদে সই সংগ্রহ করতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার

"শনিবারে চিঠি"-র সজনীকান্ত দাসের কাছে এসেছিলেন। তিনি বল্লেন যে, সারা বাংলা দেশে সাহিত্যিকদের সই যোগাড় করবেন এবং সজনীকান্তের সইও তিনি নিলেন কিন্তু তারাশঙ্করকে তিনি সই দিতে আহ্বান করলেন না। অর্থাৎ তাঁকে সাহিত্যিক বলে স্বীকার গোপাল হালদার করলেন না এই মনে করে তারাশঙ্কর আহত হলেন। তাঁকে সাহিত্যিক বলে গণ্য করেও যে গোপালবাবু সই-এর প্রস্তাব অন্য কারণে না করতে পারেন এমন কথা তাঁর মনে এল না।

কারণ এমনি ধরণের আঘাত আরো একবার গোপাল হালদার মহাশয়দের কাছ থেকে তারাশঙ্করবাবু পেয়েছিলেন যার ইতিহাস তিনি নিজে ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠের "পরিচয়"-এ দিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী "প্রগতি' নামে এক সংকলন সম্পাদনা করেন। এই সংকলনের ভূমিকায় লেখা আছে যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা অনিবার্য কারণে প্রকাশ করা যায় নি। এ সম্পর্কে সেই সময় প্রশ্ন করতে তারাশঙ্করবাবুকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বলেন যে স্থানাভাবে রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তারাশঙ্করবাবু স্পষ্টতঃ সে কথায় বিশ্বাস করেন নি, যেহেতু তিনি এখন বলছেন যে রচনাটি সংকলন প্রকাশের চার পাঁচ মাস আগে তিনি দিয়েছিলেন। তারাশঙ্করবাবু ভেবে আহত হয়েছিলেন যে আসলে তাঁকে নগণ্য লেখক বলে মনে করার জন্যই তাঁর রচনা স্থান পায় নি। স্থানাভাবের যুক্তি তাঁর মনের মত হয় নি—যদিও পরে জানতে পেরেছিলেন যে সেকালেই লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শৈলজানন্দ এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাও একই কারণে প্রকাশিত হয় নি। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আজ বেঁচে নেই—আর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের উপরেই দায়িত্ব রেখেছেন।

তবু রচনা প্রকাশিত না হওয়ায় কেবল তারাশঙ্করকেই অবহেলা করা হ'ল—এমন যুক্তি আমরা মানতে পারি না। বিশেষ করে যে চার-পাঁচ মাস সময়ের কথা স্মৃতির ওপর ভরসা করে তিনি বলেছেন তাতে তাঁর যে ভুল হতে পারে—এমন নজির এখনই আমি দেখাবো। তারাশঙ্করের নিজের স্বীকৃত তথ্যে জানা যায় যে, কবি অনিল কাঞ্জিলাল 'দেশ' অফিসে তারাশঙ্করের রচনা 'প্রগতি'তে নেওয়ার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন। "প্রগতি"-তে একটি অনুবাদ সঞ্জয় গুপ্ত নামে অনিলবাবু করেন এবং তিনি প্রেসে কপি নিয়ে যাওয়া ও প্রুফ আনার কাজে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সাহায্য করতেন। তিনি

জানিয়েছেন যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারাশঙ্কর ও শৈলজানন্দের রচনা আসেনি। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তারাশঙ্করের বর্ণনামত তিনি তখন চশমা পরতেন না বা আজো পরেন না এবং তিনি কখনো সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন না। শ্রীযুক্ত গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সাহিত্যের ব্যাপার নিয়ে। মোটামুটি এইটুকু মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, কমিউনিষ্ট সাহিত্য সমালোচকদের কাছ থেকে সাহিত্যিক স্বীকৃতি তিনি সে সময়ে না পাওয়ায় আহত হয়েছিলেন এবং সেই স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েই তিনি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন। "এর পর ১৯৪২ সালের শেষে, তখন আমার 'গণদেবতা' প্রকাশিত হয়েছে, সেই সময় শ্রীযুক্ত সরোজ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি রূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে আসেন। তখন আমি আত্মপ্রত্যয় পেয়েছি। আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে সংঘের আদর্শের ঐক্য অনুভব করেই সেদিন যোগ দিয়েছিলাম।" [তারাশঙ্করের চিঠি 'পরিচয়' জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮)।

অজ্ঞতার ভান

অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র প্রবন্ধে তিনি নতুন করে আরো একটি কারণ যোগ করে দিয়েছেন—'কমিউনিষ্টদের ফাঁদ' সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্য। তিনি লিখেছেন,—"এই প্রতিষ্ঠানটি (লেখক ও শিল্পী সংঘ) স্থাপিত হয় বোধ করি দু বছর আগে। দু বছর বলছি একটা হিসাবের ওপর নির্ভর করে; আমার আগে এই প্রতিষ্ঠানের দুজন সভাপতির কার্য্যকাল বিগত হয়েছে। প্রথম সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তারপর সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তৃতীয় সভাপতি আমি।...ঠিক এই কারণেই (আঘাত পাবার কারণ—লেখক) মাত্র দু'বছর পর এবং শ্রীরামানন্দবাবু ও শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বের পর এঁরা যেদিন আমার কাছে এসে সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ জানালেন সেদিন এক কথাতেই প্রায় সম্মতি জানালাম।" (শনিবারের চিঠি : কার্তিক ১৩৬১)।

সোমেন চন্দের হত্যার পক্ষে যুক্তি ?

এই দু'বছরের যুক্তি অসার প্রতিপন্ন করার আগে সোমেন চন্দের হত্যা সম্পর্কে বর্তমান কালের 'গান্ধীবাদী' তারাশঙ্করের যুক্তি উল্লেখযোগ্য : "সোমেন চন্দ

হত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন কারণ ছিল না।" সোমেন চন্দ ও তারাশঙ্করের জীবনে সাহিত্য ও রাজনীতি কিভাবে স্থান পেয়েছিল সে কথা বর্তমানে আলোচনা করার আগে একথা ভেবে বিস্মিত হই যে,—যে ঘটনায় সারা বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা মর্মাহত হয়েছিলেন—তাঁরা যে সেদিন ভুল করেছিলেন,—সোমেনের গুপ্ত ঘাতক-দের পক্ষেও যে একটা যুক্তি আছে—এবং ভবিষ্যতে হীরেন মুখোপাধ্যায় বা গোপাল হালদারের ভাগ্যে যদি অমন ঘটনা ঘটে—তা হলেও যে ভবিষ্যৎ ঘাতকদের পক্ষেও যুক্তি থাকবে এবং "লোকে সরল বিশ্বাসে" "সে ব্যাপার নিন্দনীয়' বলে যাতে আর প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর না করেন সে সম্পর্কে যুক্তি ও সতর্কবাণী তারাশঙ্কর দিয়েছেন। 'গান্ধীবাদের' এটা লুই ফিসারীয় সংস্করণ বলে মনে হয় না কি ?

এইবারে দুবছরের আন্দাজী হিসাবের বিবরণটা পরীক্ষা করা যাক। সোমেন চন্দ হত হন ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক সংঘের সূচনা-মূলক জনসভা হয় ঐ মাসেরই ২৮শে তারিখে। এই সভাতে রামানন্দবাবু সভাপতি হয়েছিলেন এবং যে সংগঠন কমিটি হয় তার যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কমিটিতে যাদের নাম ছিল তার মধ্যে অতুল গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরণ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। (১৯৪২ সালের 'পিপল্‌স্ ওয়ার-'এ ১৫ই নভেম্বর প্রকাশিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ Bengal Progressive writers getting together for the people দ্রষ্টব্য)।

দুবছরের পরিবর্তে ৯ মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই দ্বিতীয় অধিবেশন হয়—তারাশঙ্করবাবুকে মূল সভাপতি করে। এই সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম ছিল—কিন্তু তিনি না আসতে পারায় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তকে আহ্বান করা হয়। শ্রীযুক্ত গুপ্ত কখনো লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি হন নি এবং তারাশঙ্কর বাবুর হিসাব মত তাঁর সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বা অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন না। ১৯৪৩ সালের ১০ই জানুয়ারীর 'পিপলস্ ওয়ার' কাগজে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সভা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে লেখা আছে যে, আবু সৈয়দ আয়ুব, হবিবুল্লাহ্ বাহার, বুদ্ধদেব বসু ও যামিনী রায় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন।

যামিনীবাবু না এসে বাণী পাঠান, তাই তাঁর স্থানে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত করা হয়।

"আমার কাছে অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন আমার সুপরিচিত অমৃতবাজারের কর্মী সরোজ দত্ত এবং আমার স্নেহের পাত্র প্রীতিভাজন শ্রীবিনয় ঘোষ। আমাকে বলেছিলেন—'অনেক ঝগড়া করে জিতেছি আমরা। আমরা নামকরা লোককে সভাপতি চাই না, চাই সত্যিকারের সাহিত্যিককে...' আমি সম্মতি দিলাম। সম্মতি দেবার সময় মনশ্চক্ষে দুবছর আগেকার স্মৃতিটি ভেসে উঠল। একবারও বিবেচনা করলাম না কিছু। জিজ্ঞাসা করলাম না কাউকে। নীচে অধ্যাপক নির্মল বসু থাকতেন, তিনিও তখন জেলে, জিজ্ঞাসা করব বা কাকে?" (আমার সাহিত্য জীবন,—শনিবারের চিঠি: কার্তিক ১৩৬১)।

পূর্বের ইতিহাস এবং তারাশঙ্করের নিজের উক্তি থেকে এখন সহজেই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় কি যে সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করতে না পারা বা পরে নির্মল বসু কি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই 'জীবনের আদর্শের সঙ্গে সংঘের আদর্শের ঐক্য অনুভব' করার ব্যাপারগুলি ছিল গৌণ, সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রবল আগ্রহই তারাশঙ্করকে 'কমিউনিষ্টদের ফাঁদে পা বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছিল'?

বন্ধুদের হুঁশিয়ারী উপেক্ষা

কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং বিখ্যাত এক অধ্যাপক বন্ধু তাঁকে বলেন সভাপতির অভিভাষণে এদের উলঙ্গ স্বরূপ যেন তারাশঙ্কর দেখিয়ে দেন। হুঁশিয়ার করে দেবার লোকের তাহলে অভাব হয় নি। তাছাড়া সজনীকান্ত দাস তো আর জেলে যান নি—এবং গোপাল হালদারের রাজনৈতিক পরিচয় আর হীরেন মুখার্জিদের সাহিত্য-ধর্ম কি—তা জানাবার লোকের অভাব তারাশঙ্করের ছিল একথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

তিনি হয়ত বলতে পারেন: 'গোপালবাবুদের পরিচয় আমি জানতাম না, এমন কথা বলিনি—আমি বলেছি উক্ত সংগঠন নিছক রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য-মূলক প্রতিষ্ঠান'—এই খবর আমি রাখতাম না। খবরটা তিনি রাখতেন না—একথা না বলে যদি খবরটায় কর্ণপাত করেন নি বলতেন তা হলে কথাটা ঠিক হত। কারণ হীরেন মুখোপাধ্যায়রা যখন প্রথম প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করেন (১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌএ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ও তার

নিকটস্থ একটি সভাগৃহে—যেখানে সাহিত্যিক হিসাবে কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং হসরৎ মোহানী উপস্থিত ছিলেন, মুন্সী প্রেমচন্দ সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আশীর্বাদ পত্র প্রেরণ করেছিলেন)—তার কিছু পর থেকেই 'স্টেটসম্যান' কাগজ প্রচার করে যে লেখক সংঘ কমিউনিষ্ট পার্টিরই ছদ্মরূপ। এবং ১৯৩৮ সালের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়—তার সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠিতে' বেনামে মোহিতলাল ও সজনীকান্ত দাস এবং স্বনামে অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—সাহিত্যে প্রগতি কি, এই প্রশ্ন তুলে শেষ পর্য্যন্ত এটা কুলি-মজুর ক্ষেপানোর সাহিত্য কিনা—এ আলোচনায় শেষ করেছিলেন।

১৩৪৫ সালের মাঘ শনিবারের চিঠি...... "প্রগতি সাহিত্য কি? এমন কোন সাহিত্য কি আছে, যাহার গতি বিপরীত দিকে ?...গোস্বামী —মজুমদারের নেতৃত্ব দৃষ্টে মনে হয় 'আপ্রাণ পরিস্থিতির' সাথেই যেন প্রগতি সাহিত্যের যোগ অথবা প্রগতি কুলি-মজুর ক্ষেপাইবার সাহিত্য; ...সাহিত্য নিভৃত সাধনা এবং নিশ্চিন্ত অবসর বিনোদনের সামগ্রী। ইহার গতি আছে কিন্তু প্রগতি নাই। দল বাঁধিয়া, পতাকা উড়াইয়া, ইনক্লাব জিন্দাবাদ মন্ত্রে সাহিত্য বাঁধা যায় না—অন্ততঃ এতদিন যায় নাই" এই সব আলোচনার মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতায় 'প্রগতি লেখক সম্মেলনে' অংশ গ্রহণকারী বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির উপর প্রবল আক্রমণ ছিল। তারাশঙ্কর বাবু নিজেই বলেছেন,— "প্রগতি লেখক সংঘের নাম শুনেছি: কাগজে পড়েছি, কোন অধিবেশনে কোনদিন নিমন্ত্রিত হইনি। প্রগতিমূলক লেখার সুর তখন মোটামুটি বুদ্ধদেববাবু প্রভৃতির সীমার তারে বাঁধা। দক্ষিণ কলকাতায় সম্মেলন হয়ে গেল তাতেও কোন নিমন্ত্রণ পাইনি।" (তারাশঙ্করের চিঠি: পরিচয়: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) কাজেই তিনি ভালমন্দ কিছু জানতেন না —একথা কেমন করে বিশ্বাস করা যায়।

অবশ্য প্রগতি লেখক সংঘের বিরুদ্ধে সে যুগের 'স্টেট্সম্যান' এবং এযুগের মার্কিন ও কংগ্রেসী প্রচারকদের কুৎসার জবাব দেওয়া দরকার: কারণ একথা পরিষ্কার করে বলা দরকার দেশ ও বিদেশের একটি বিশেষ অবস্থায় কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কংগ্রেস, সোসালিষ্ট এবং দল নিরপেক্ষ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘ এবং পরে বাংলা দেশে ফ্যাসিস্ট

বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সৃষ্টি করেন এবং ১৯৩৬ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাজ করার ফলে ভারতবর্ষে নতুন বাস্তববাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি হয়েছে—যার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ প্রভৃতি বহু সংগঠন। কমিউনিষ্টরা গর্ব করতে পারে এই কথা ভেবে যে, ভারতে শিল্পকলা ও শিল্পীর স্বাধীনতার দাবী নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের মূল দাবীর সঙ্গে সুর মেলাতে তারাই পেরেছে এবং সেই সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের পক্ষ থেকে জাতির কাছে প্রথম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে শিল্পকলা ও শিল্পী জাতির কল্যাণের জন্য বাস্তববাদী হবে এবং সমাজ পরিবর্তনের উন্নততর ধারাকে রূপ দেবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করবে।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যখন পণ্ডিত নেহেরু ফ্যাশিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি মানসে কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন গণসংগঠনের যৌথ অনুমোদনের (collective affiliation) জন্য প্রস্তাব করছেন যার ফলে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র নিজ নিজ সংগঠন ও দাবি-দাওয়া নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্টে সামিল হতে চেষ্টা করেছিল (অবশ্য দক্ষিণপন্থীদের বাধায় পণ্ডিতজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি), তখন সেই সম্মেলনের পাশেই সমাগত শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রথম ঘোষণা করলেন : "ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরান্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কর্মনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব। এই ঘোষণা হীরেনবাবু ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত 'প্রগতিতে' প্রকাশিত হয় এবং সে সংকলনে তারাশঙ্করবাবুর লেখা না প্রকাশ পেলেও বইটি তিনি দেখেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

প্রগতি লেখক সংঘের পূর্বোক্ত ঘোষিত নীতি ছাড়াও সংগঠনের দিক থেকে অধিকাংশ লোকই ছিলেন অকমিউনিষ্ট। তারাশঙ্কর বাবু নিজেই স্বীকার করেছেন যে, যেসব কমিউনিষ্ট ওখানে ছিলেন তাঁরা প্রধানতঃ সাহিত্যকর্মী হিসাবেই ছিলেন। বস্তুতঃ ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে অর্থাৎ

তারাশঙ্করবাবু আসার সময়ে উক্ত সংঘে পার্টি সভ্য জন পাঁচ-ছয়েকের বেশী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে হীরেনবাবু ও গোপালবাবু খ্যাতনামা ব্যক্তি গোপালবাবু লেখক হিসাবেই ওখানে ছিলেন, নতুবা পার্টিগতভাবে তিনি কৃষক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। সরোজ দত্ত বা বিনয় ঘোষ তখন পার্টি সভ্য ছিলেন না, যদিচ তাঁরা মার্কস্‌বাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের মত আরো কয়েকজন তরুণ লেখক ওখানে ছিলেন। তারাশঙ্করবাবু 'পরিচয়'তে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছেন—"প্রগতিমূলক লেখার সুর তখন মোটামুটি বুদ্ধদেব বাবু প্রভৃতির বীনার তারে বাঁধা।" অর্থাৎ লেখক সংঘের উপর কমিউনিষ্ট আধিপত্যের পরিবর্তে সাহিত্যিক (তা গোষ্ঠীগত হলেও) আধিপত্য বেশী ছিল এই কথাই প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ 'প্রগতি' সংকলন ও ১৯৩৮ সালের সম্মেলনের রূপ থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় সাহিত্য সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের যে ধারণাই থাক না কেন তারা পূর্বোক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে সকল দলের সাহিত্যিককে এক করার চেষ্টা করেছিলেন। 'প্রগতি' সংকলনে বুদ্ধদেবের পাশে সজনীকান্ত দাসের লেখা স্থান পেয়েছিল—এবং মার্কস্‌বাদের বিচারে এই দুটি রচনা নিশ্চয়ই সমালোচনার উর্ধে নয় বলে আমার বিশ্বাস। আসল কথা কোন রচনা প্রগতিশীল এবং কোনটি নয় তা নিয়ে ইতিমধ্যেই মার্ক্সবাদী মহলে তর্ক সৃষ্টি হলেও সংগঠনে সকলকে আনার ব্যাপারে কোন দ্বিমত ছিল না।

সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষ কেন তারাশঙ্করকে বললেন,—'অনেক লড়াই করে আমরা জিতেছি'—এর ইতিহাস যদি তারাশঙ্কর বলতেন—তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিযোগ একেবারেই দাঁড়াতো না। অবশ্য এই ইতিহাস তিনি ও "শনিবারের চিঠি"র গোষ্ঠী যেমন জানেন—তেমনি জানেন বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা।

বাংলা সাহিত্যে মার্ক্সবাদী বিচার

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে যখন আপোষকামী দক্ষিণপন্থীদের জন্য জাতীয় যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরেছে—অপরপক্ষে বামপন্থী, ফরোয়ার্ড ব্লক, সোসালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের ঐক্য ব্যাহত হচ্ছে, সেই সময় প্রগতির লেখক সংঘের দরদী ও সভ্যদের মধ্যে সাহিত্যে প্রগতি বলতে কি বোঝায় এবং কোন্ রচনাগুলিকে প্রগতি সাহিত্য বলব—এই নিয়ে রীতিমত তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে 'নব পর্য্যায় ভারত,'

'অগ্রণী' ও 'অরণি' কাগজ মারফৎ সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও সুবোধ চৌধুরী যে সব প্রবন্ধ রচনা করেন তা সংঘ ও সংঘের বাইরে সাহিত্যরসিকদের মধ্যে প্রচুর কৌতূহল উদ্রেক করে এবং সংঘের মধ্যে কিছু তিক্ততা সৃষ্টি করে। বিনয় ঘোষ ও স্বর্ণকমলদের একটা দল ছিল যার নাম 'অনামী চক্র' এবং তাতে 'ফসিলে'র লেখক সুবোধ ঘোষ ছিলেন। "ফসিল" গল্প 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত হয় এবং পূর্বোক্ত দলের নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে সুবোধ ঘোষ অল্প দিনের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। আমি সুবোধ ঘোষের লেখার শক্তিকে খাটো করার জন্য এই মন্তব্য করছি না। 'অনামী চক্রে'র অধিকাংশই আনন্দবাজারে কাজ করতেন অথবা লিখতেন এবং তাদের একাংশ তৎকালে বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রিকায় লিখতেন বলে সুবোধবাবুর পরিচয় দ্রুততর করা সম্ভব হয়েছিল। রচনার পরিমাণের তুলনায় তারাশঙ্কর তখন অনেক বেশী লিখেও এত নাম করতে পারেন নি। সমালোচনা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ ও সরোজ দত্তরা যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল 'পরিচয়' ও 'কবিতাভবনে'র কোন কোন লেখকদের রচনা—বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে ও সমর সেন প্রভৃতির রচনা। তারাশঙ্কর এবং 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর যে বিশেষ প্রীতি অন্ততঃ বুদ্ধদেব ও সমর সেনদের প্রতি ছিল না তা সর্বজনবিদিত। বুদ্ধদেবের প্রতি যে তারাশঙ্করের ক্ষোভ আজো আছে তা তাঁর 'সাহিত্য জীবনে' কয়েকবার প্রকাশ পেয়েছে।

তারাশঙ্কর-সরোজ, সজনী-বিনয় যোগাযোগ

কাজেই আমি যখন 'নব পর্যায় ভারত' কাগজে 'আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য' প্রবন্ধে পরোক্ষভাবে বাংলায় ইউরোপের অনুকরণে রচিত ক্ষয়িষ্ণু ধারার সাহিত্যকে সমালোচনা করি তখন সেই প্রবন্ধের অধিকাংশই সজনীকান্ত—পূজা সংখ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে "অলকা" কাগজে পুনর্মুদ্রিত করলেন। সরোজ দত্ত ও সুবোধ চৌধুরী "অগ্রণী"তে সাহিত্যে ক্ষয়িষ্ণুতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুললেন,—যা সে যুগে তরুণদের কাছে যেমন পছন্দসই হয় তেমনি প্রবীনদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। সবার উপর বিনয় ঘোষ আনন্দবাজারেও শনিবারের চিঠিতে নূতন সাহিত্য, নূতন সমালোচনা, সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং তার 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' বই-এ এই তর্কাতর্কিকে মার্ক্সবাদের রূপ দেবার চেষ্টা করলেন এবং বাংলা কবিতার

আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে সজনীকান্তের রাশিয়া-ভক্তির নমুনাস্বরূপ একটা লাইন তুলে—তাঁকে প্রগতির দলে আনার সম্ভাবনা দেখালেন। "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা"র ভূমিকায় বিনয়বাবু পূর্বোক্ত লেখকদের সম্পর্কে পরোক্ষে যেরূপ মন্তব্য করেছেন আজকের বিচারে তা অনেকের কাছে উগ্র ও যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। এই সময় কয়েকবার বিনয়বাবু 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে সজনীকান্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন বলে জানি। সরোজ দত্ত এই সময় অমৃতবাজারের কর্মচারী এবং 'অগ্রণী' থেকে তিনি যেমন প্রকাশ্যে বুদ্ধদেবের রচনার বিরুদ্ধে লিখেছেন, তেমনি 'অমৃতবাজারে"র সমালোচনা-স্তম্ভ থেকে তারাশঙ্করের কোন রচনাকে একেবারে রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' পরে স্থান নির্দেশ করেছিলেন। অমৃতবাজারের মন্তব্য হিসাবে সেই প্রশংসাপত্র উক্ত উপন্যাসের কভারে বহুদিন ছাপা হয়েছে। এই যুগে অসুস্থ সরোজ দত্তের রোগশয্যার পাশে ফলমূল নিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর প্রীতি জানিয়ে এসেছেন—এমন ঘটনাও জানি। ইতিমধ্যে সুবোধ ঘোষের রচনা নিয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়—এবং এই সব তিক্ততা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ ও সুধী প্রধান কয়েকটি বৈঠক করেন। তারাশঙ্কর, গোপালবাবুর আচরণে কয়েকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—অথচ তিনি পূর্বোক্ত ব্যাপারের মত এটাও না জানতে পারেন যে, গোপাল বাবুর সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র পুরানো সম্পর্ক এবং আমাদের মত তরুণদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুণ তিনি কখনো এই তর্কাতর্কিতে প্রকাশ্যে যোগ দিতেন না এবং গোপালবাবুকে যাঁরা জানেন যে উস্কানি দেবার লোকও তিনি নন। বরং তরুণদলকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন। এই কারণে গোপালবাবু সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। গোপাল-বাবুকে সাহিত্যিকদের সম্পর্কে যেটুকু করতে বলা হত নিজে তিনি তার বেশী করতে চান নি—বিশেষ করে তাঁর পুরানো সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

তারাশঙ্কর বাবুকে এমনি এক অবস্থার মধ্যে সরোজ দত্তরা ডাকলেন। ইতিমধ্যে সুবোধ ঘোষ আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। সরোজ দত্ত যখন তারাশঙ্করকে আহ্বান করতে যান তখন সে প্রসঙ্গও ওঠে। সুবোধ ঘোষের সঙ্গে তারাশঙ্করের আজ কি সম্পর্ক তা তাঁরাই ভাল জানেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট

কর্মীরা বুদ্ধদেব, সমর সেন, সুবোধ ঘোষ ও তারাশঙ্কর সকলকেই সংঘে রাখবার চেষ্টাই করেছেন, তাদের রচনার সমালোচনা করলেও। মোটামুটি এই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে যুগে লেখক সংঘ কোন রাজনৈতিক দলের ছদ্মরূপ কিনা, সেখানে গান্ধীবাদ ও অহিংসার স্থান আছে কিনা সে বিচার না করে সাহিত্যিক স্বীকৃতি-লাভের আগ্রহে তারাশঙ্কর এসেছিলেন এবং তিনি স্বীকৃতিলাভের যে মূল্য অযাচিতভাবে দিয়েছিলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধদেব বা পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ দেবার কোন প্রয়োজনও মনে করেন নি। এর থেকে তাঁর আজকের গান্ধীবাদের প্রশস্তি লোকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

তিনি ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের সভায় মূল সভাপতিরূপে বলেন,—"I have been drawn towards Russia before 1930; but it was then a kind of romantic and therefore rather impermanent fascination. Since 1930 I have had a new understanding, have rendered homage to Soviet Union as the dipositcry of humanity's greatest good (Hiren Mukherjee's report—'Peoples war' Jan, 10. 1943).

"১৯৩০ সালের আগে থেকে থেকেই আমি রুশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হই—কিন্তু এই আকর্ষণে ভাবাবেগ বেশী থাকায় তা অদৃঢ় ছিল। কিন্তু তিরিশের পর আমার নব চেতনার উন্মেষ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমি মানবতার চরমতম কল্যাণের আধার হিসাবে শ্রদ্ধা জানাই।" (পিপলস ওয়ার কাগজে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৩ সালের রিপোর্ট)।

তারাশঙ্কর বাবু বলেছেন যে তিনি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের মত প্রশ্ন তুলে (অর্থাৎ ফ্যাশিষ্ট-বিরোধীরা কার পক্ষে এই প্রশ্ন) বক্তৃতা শেষ করেছিলেন। হীরেনবাবু পূর্বোক্ত রিপোর্টে লিখেছেন,—"He concluded with a Tagore's quotation, that the fight against fascism was the fight for our freedom as well as the freedom of the world."

পরের বছর প্রেমেন বাবু যখন সভাপতি হলেন তখন অভ্যর্থনা সভাপতি হিসাবে তারাশঙ্কর বাবু উক্ত প্রশ্ন তুলে নিজেই জবাব দেন। Tarasankar Banerjee, Chairman of the Reception Commitee repudiated the charge that the term antifascist implied a negative

conception ; it implies, he said, a very positive fight for our country's freedom, without which the arts are sure to languish, a very positive fight against fascism and all its insidious varieties, against the forces that still keep India in chains, against 'man made famine' and greedy piling up of criminal war profits ; a very positive fight for the writers' and artists' link up with our long suffering, great-hearted people." (Hiren Mukherjee, Peoples War, Feb. 13, 1944). "ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা কথাটি নঙার্থক—এই অভিযোগের উত্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেন। তিনি বলেন ঐ কথাটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম চালানোর কথাও বোঝায়। কারণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে শিল্পকলা নিশ্চিতভাবে ম্রিয়মান হবে ; ফ্যাসিজম ও তার সর্ববিধ শয়তানী রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আমাদের দেশের উদারহৃদয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত জনগণের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে সংগ্রাম—ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়।" (পিপল্‌স ওয়ার—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সাল)।

এই প্রসঙ্গে তাঁর আরো কথার জবাব হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, এক বছর ধরে তাঁকে সংঘে থাকতে হবে এমন কথা আগে সরোজ দত্তরা তাঁকে জানান নি। কিন্তু এক বছর কেন ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই সমিতির কার্যকরী সদস্যরূপে ছিলেন—অন্ততঃ ১৯৪৬ সালের আগে পর্যন্ত তিনি যে খোশ মেজাজেই ছিলেন—তার একটি প্রমাণ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি। এই বছরের মে মাসে সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ও সজনীকান্ত দাস একটি ঘোষণা পত্রে সই দিয়েছেন এবং তিনি সম্মেলনের বক্তৃতায় সোভিয়েত ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী লোকের কাছে পৌঁছে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৮ই মার্চ ১৯৪৪ সালে তিনি মার্ক্স-এর জন্মদিবস উপলক্ষে মার্ক্স সম্পর্কে যা বলেছেন আজকের তারাশঙ্কর ভক্তরা নিশ্চয় তার জবাব চাইবেন :

"Tarasankar Banerjee related how in his youth he was drawn towards Marxism as the hope of the world. In language of inimitable beauty he pointed out how since the

days of Buddha mankind has passionately sought for escape from the thraldom of inequality, it was in the middle of 19th century that the prophetic vision of Marx indicated the road which men must tread, if they were to reach the golden goal of real freedom." (Hiren Mukherjee's report in 'Peoples war' April 2, 1944).

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, যৌবনেই তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন মার্কসবাদের প্রতি জগতের আশা ভরসা স্থল বলে। তাঁর অনমুকরণীয় লালিত্য ভরা ভাষায় তিনি বলেন "বুদ্ধের যুগ থেকে মনুষ্যজাতি অসাম্যের অত্যাচারের নিগড় হতে মুক্তি পাওয়ার পথ পরম আগ্রহে অনুসন্ধান করেছে—কিন্তু কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই মার্কসের ঋষিতুল্য দৃষ্টি দেখিয়ে দিয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বর্ণসৌধে পৌছাতে গেলে মনুষ্যকে কোন পথে অবশ্যই চলতে হবে।" (হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট—পিপলস ওয়ার, ২রা এপ্রিল ১৯৪৪ সাল)।

এই সভার সভাপতি ছিলেন সেই সময়কার কংগ্রেস এসেম্বলী দলের প্রধান হুইপ শ্রী জে. সি. গুপ্ত।

তারাশঙ্করের এই বক্তব্যের সঙ্গে পি, সি, যোশীর ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালের লেখা চিঠির জবাবের খসড়া পড়ে পাঠকরা নিশ্চয় বিস্ময় প্রকাশ করবেন।

কমরেড পি, সি, যোশী ১৯৪৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে তারাশঙ্কর বাবুকে বাংলার দুর্দিনে—দুর্ভিক্ষে ও যুদ্ধজনিত বিপাকে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবার জন্য অভিনন্দন জানান। তার উত্তরে তারাশঙ্করবাবু যোশীকে জানান যে, তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের সাহস ও আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল—তবে পার্টির অনেক নীতি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তিনি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী।

তারাশঙ্কর বাবুর পত্রখানির তারিখ নেই। তবে যোশীর পত্র থেকে আন্দাজ করা অন্যায় হবে না যে, ১৯৪৬ সালের শুরুতেই তারাশঙ্করবাবু জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে তখন কংগ্রেস নেতাদের প্ররোচনায় কমিউনিষ্টদের উপর দৈহিক আক্রমণের যুগ শুরু হয়ে গেছে। কাজেই ধারকরা মার্কসবাদের পোষাক ছেড়ে সত্য ও অহিংসার নামাবলী গায়ে দেওয়ার সময় হয়েছিল বৈ কি! নতুবা বলতে হয়—তিনি না জেনে শুনেই মার্কসবাদের

প্রশংসা করেছিলেন অথবা প্রগতিশীল মহলে সস্তায় নাম কেনার জন্য তিনি পূর্বোক্ত উক্তিগুলি করেছেন। এই যুগে কংগ্রেসের অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কাজ করেছেন। কমিউনিষ্টদের যিনি পয়লা নম্বরের শত্রু বলেন সেই চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আগষ্ট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কমিউনিষ্টদের বোম্বাই আড্ডাতে একবার উঠেছিলেন—এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে গান্ধীজীর প্রকৃত আদর্শ নাকি সেদিন কমিউনিষ্টরা রক্ষা করেছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়—যাঁর রাজত্বে কমিউনিষ্ট অপবাদে নিরীহ ও নিরস্ত্র মেয়েদের প্রাণ দিতে হয়েছে—তিনিও বাংলার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের কাজে কমিউনিষ্ট-দের সঙ্গে কাজ করেছেন (বেঙ্গল মেডিকেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি) এবং অনেক অনিচ্ছুক লোকদের (শ্যামাপ্রসাদের দলকে) করতে বাধ্য করিয়েছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জেল থেকে বেরিয়েই নানাভাবে সেবাকার্যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিতে পরাঙ্মুখ হন নি। কিন্তু এর জন্য তাঁদের কাউকে মার্কসের গুণগান করতে হয় নি। তারাশঙ্করবাবু কিসের তাগিদে সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধীবাদের পরিবর্তে 'হিংসা ও মন্ত্রগুপ্তি'র (অর্থাৎ মিথ্যা) প্রচারক মার্কস্‌কে প্রশংসা করে বসলেন ?

কংগ্রেসী রাজনীতি ত্যাগের ইতিহাস

১৯৩০ সালে তারাশঙ্কর অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে চার মাসের জন্য জেলখানায় ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ১৩৫৪ সালের (১৯৪৭) শ্রাবণের "শনিবারের চিঠিতে" সজনীকান্ত লিখেছেন,— "সেখানে মাত্র চার মাসের বসতি তাহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিল…কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যাহারা তাঁহার সহবাসী ছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কারা হইতে নিষ্কৃতি লাভের দিন ইহারা তারাশঙ্করকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া কামনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন। তারাশঙ্কর এই সহৃদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"না, আপনাদিগকে প্রনাম করিয়া আমি বিদায় লইতেছি। বুঝিয়াছি নিছক রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। যে বঙ্গভারতীকে আমি উপেক্ষা করিয়াছি এবার তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব মনস্থ করিয়াছি।"—সাহিত্যযশাভিলাষী তারাশঙ্কর সুতরাং এবারে প্রস্তুত হইয়াই ভারতীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।"

বস্তুতঃ সাহিত্য যশাভিলাষই তারাশঙ্করকে ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক সংঘে নিয়ে

গিয়েছিল—রাজনীতিটা ছিল পরিস্থিতির। নতুবা লেখক সংঘে মার্কসবাদ বা সত্য ও অহিংসা-এর কোনটা নিয়েই সরকারীভাবে আলোচনা বা প্রস্তাব নেওয়া হত না এবং হয়েছে বলে কোন প্রমাণ তারাশঙ্করবাবু দিতে পারেন নি। তারাশঙ্করবাবু বলেছেন যে কমিউনিষ্টরা সেকালে তাঁর সাহিত্যে জমিদার প্রীতির প্রশংসা করেছেন। শ্রীগোপাল হালদার এক প্রবন্ধে তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণীর কোন কোন চরিত্রের ঋজুতার ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু তাতে জমিদার প্রীতিকে পছন্দ করা বোঝায় না এবং গোপালবাবুর সেই মত তাঁর নিজস্ব। তা পার্টির মত, এমন কি লেখক সংঘের মত তো নয়ই। কমিউনিষ্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখন এসব বিষয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ না করার নীতিই মেনে চলেছিল— তার উদাহরণ তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" প্রসঙ্গে দেব।

'মন্বন্তর' রচনায় তিনি কি ধরণের কমিউনিষ্ট চরিত্রের প্রশংসা করেছিলেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—সেই ধরণের কমিউনিষ্ট ভারতের কমিউনিষ্ট-পার্টিতে থাকার যোগ্য নন। অবশ্য :—"দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এদের কর্মীরা। সেই সময় সেইটাই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন সঠিক বুঝতে পারিনি আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বা রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে দেশের সংগ্রামের বিরোধিতা করার অপরাধ এই একমাত্র আবরণ দিতে আবৃত করা ছাড়া এঁদের উপায় ছিল না।" (আমার সাহিত্য-জীবন : অগ্রহায়ণ '৬১) কমিউনিষ্টরা না হয় 'আন্তর্জাতিকতা' বা রাশিয়ার খাতিরে অপরাধ করেছিল—কিন্তু কংগ্রেসী তারাশঙ্কর বন্ধুবর নির্মল বসুর পথ ত্যাগ করে নিজের সাহিত্য যশ উপার্জন এবং জেল যাওয়ার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ায় যে সহজ রাস্তাটি ধরেছিলেন—এমন অভিযোগের কি জবাব দেবেন তিনি ?

তিনি কেবল এতেই নিরস্ত হন নি। ভারতের কমিউনিষ্টরা, সোভিয়েত বিশ্বকোষ, ষ্ট্যালিন ও রজনীপাম দত্তের রচনা গান্ধীবাদকে কিভাবে নিন্দা করে এবং সুভাষচন্দ্রকে কমিউনিষ্টরা কিভাবে হেয় করতে চেষ্টা করেছে—সেই সব মার্কিন প্রচার পুস্তিকা ও এদেশী ভাড়াটে কমিউনিষ্ট বিরোধীদের কুৎসার পুনরুল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে লেখক ও শিল্পীসংঘের কি যোগাযোগ আছে তা জানাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। মোটের উপর ধরা যাক যে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর গান্ধীবাদের বা সুভাষচন্দ্রের (?) নিন্দাকারীদের

সংশ্রব ত্যাগ করার নীতিই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? তা হলে 'শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর এতদিনের বন্ধুত্ব কি করে রইল, মোহিতলালকে কি করে গুরু বলে আজো মানেন তিনি? বেশী দিনের কথা নয়—১৯৩৯ সালের জুনের 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা) "প্রসঙ্গ কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীসত্যসুন্দর দাস এই ছদ্মনামে মোহিতলাল গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যা লিখেছেন তা তুলে দিচ্ছি। এই সংখ্যায় তারাশঙ্করের "ধাত্রী দেবতা" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মোহিতলাল লিখছেন,— "আমাদের ঋষি গান্ধী নয়। গান্ধীর অপরিসর মন ও বৈশ্যবুদ্ধি রাষ্ট্রনীতির মরুপ্রান্তরে মরীচিকা সৃষ্টি করিতেছে। গুজরাটের মহাত্মার পদতলে অন্ধ ভক্তির আবেগে যেদিন আমরা লুটাইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। দেশের দুর্বলতাই গান্ধীর বল, অর্থহীনতা, ধর্মহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার উপরেই তাহার নেতৃত্ব শক্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সাধু সন্ন্যাসীর কৌপীন পরিয়া তিনি দীন দরিদ্র ভিখারী জনগণের অন্ধ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার যাহারা ধনকুবের তাহাদের প্রতি ও তিনি কম প্রসন্ন নহেন। মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁহার প্রীতিভাজন নহে। কারণ সম্ভবতঃ যে, নিজের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে অন্ধ ভক্তির প্রয়োজন তাহার পক্ষে ইহাদের আনুগত্য তিনি প্রথমে সংশয়ের চোখে দেখিয়াছেন···অহিংসা, সত্যাগ্রহ, চরকা ও খাদি গান্ধীধর্মের এই চতুর্বিধ মার্গ যে গভীর চিন্তার ফল, তাহা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে হার মানাইয়াছে, কর্ম করিবার জন্য চাই শূন্য মস্তিষ্ক এবং মার খাইবার জন্য অন্ধভক্তি।···গান্ধী ধর্ম যে আমাদের পক্ষে কত বড় পরধর্ম এখনো কি তাহার প্রমাণ চাই? গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে অনেক নিগূঢ় ও অগূঢ় কারণে চিরদিনই ঘৃণা করিয়া থাকেন—গান্ধী এক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উৎসুক, উন্মুখ ও Provincial autonomy যেমন তাহার রুচিকর হইয়াছে—Federation তেমনি লোভনীয় হইতে বাধ্য—সুভাষের সম্পর্ক মাত্র বর্জন না করিলে গান্ধীর মুখ রক্ষা হয় না। ইংরাজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে বিঘ্ন ঘটিতে পারে···।"

সুভাষচন্দ্র এই সময় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত এবং সোদপুরে আগত গান্ধীজীর সঙ্গে মীমাংসার শেষ চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ। সেই প্রসঙ্গে মোহিতলাল লিখেছেন,—"সুভাষচন্দ্র গান্ধীধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে সর্বান্তঃকরণে অস্বীকার করিতে পারেন নাই—নেতৃত্ব করিবার মত বুদ্ধি ও সাহস এই দুইয়ের

অভাব এত অধিক যে বাঙালীর লজ্জা পাইতে হয়; মতের স্থিরতা বা নীতির সামঞ্জস্য নাই। তিনি গান্ধীবাদের সঙ্গে মিটমাট করিবার জন্য যতখানিতে রাজী হইয়াছিলেন তাহা তাহার নিজ আদর্শ নিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। তিনি শুধু বুদ্ধিহীনই নহেন আত্মপ্রত্যয়ের সাহসও তাহার নাই···নেতৃত্ব করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনও রকমের নির্ভয় ও নিস্পৃহ জাতীয় কল্যাণ কামনা তাঁহাকে চালিত করে নাই। এত অল্প বুদ্ধি ও এত অল্প সাহস লইয়া নেতৃত্ব করা যায় না।"

এরপর যদি তারাশঙ্কর বলেন—এ দলের (কমিউনিষ্ট দলের) কর্মী ও সাহিত্যিকদের মতো নিজের সুবিধামত নিরন্তর মত পরিবর্তন কবেন না তা হলে কি কথাটা ভাল শোনায়? অবশ্য তারাশঙ্করের গুরু মোহিতলাল, তারাশঙ্কর ও সজনীকান্তের কংগ্রেস ও হিন্দী প্রীতিতে এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, ইদানীং তাঁদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়,—এমন কি মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত মোহিতলালের কাছে যেতে সাহস পান নি ওঁরা। ('শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলাল শোক সংখ্যায় জগদীশ ভট্টাচার্যের ডায়েরী দ্রষ্টব্য)।

তারাশঙ্কর বাবু বারবার বলেছেন সংঘের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ দেখতে পেলেন—এবং একমাত্র প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে মহম্মদ আলি পার্কের সম্মেলনে ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় এবং মুজফ্ফর আহ্মদকে তিনি দেখতে পেলেন। তাঁরা কি কিছু বললেন? না—তেমন কথা তারাশঙ্করবাবু বলেন নি। "এই সম্মেলনের সমারোহ প্রায় ঐতিহাসিক" উক্তিটি তারাশঙ্করের। কাজেই সেখানে দর্শক হিসাবে কমিউনিষ্ট নেতারা যেতে চাইবেন—এতে হস্তক্ষেপের কি আছে? সম্মেলনে তারাশঙ্কর বাবু মাত্র একদিন অনুপস্থিত ছিলেন—কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—বাড়ীতে অসুখ ছিল। নতুবা এই সম্মেলনের প্রস্তুতিতে তাঁর পূর্ণ উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে তিনি বাংলার মন্বন্তরোত্তর সাহিত্য সম্পর্কে সুন্দর রচনা পাঠ করেন এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ সৃষ্টি ও কংগ্রেস নেতাদের সাহিত্য-সম্পর্কে জাগ্রত চেতনাকে অভিনন্দন জানান। এই উপলক্ষে যে লোক-কবি সমাবেশ হয়েছিল তার পিছনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল (সুধী প্রধান সম্পাদিত "বাংলার লোক-কবি" পুস্তকে তারাশঙ্করের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কবিগানের রাত্রিতে তিনি অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সংঘের নাম পালটিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পরিবর্তে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ

করার পিছনে তাঁর উৎসাহ ছিল। সেই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় হীরেনবাবুর বক্তৃতায় তিনি ক্ষুব্ধ হননি—হয়েছিলেন সুধী প্রধানের বক্তৃতায়। সুধী প্রধান ১৯৩৮ সালের 'শনিবারের চিঠি' ও বনফুলের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন যে,—"প্রগতি নাম নিয়ে প্রথম যুগে যেমন অব্যাহতি পাওয়া যায়নি—তেমনি আজো যাবে না,—এবং বনফুলের আশঙ্কা মত তারাশঙ্কর কমিউনিষ্ট হবেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তর লেখক সংঘ দিতে পারে না—তা একান্তভাবে তারাশঙ্করের নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে।" সুধী প্রধান আরো বলেছিলেন যে, ১৯৩৮ সালে যারা দল বেঁধে সাহিত্য করায় আপত্তি করেছিলেন, সাহিত্যে প্রগতি মানতে অস্বীকার করেছিলেন—এবং সাহিত্য কাস্তে-হাতুড়ীর সাহিত্য হবে বলে শঙ্কিত হয়েছিলেন—তারা আজ দল বেঁধে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ গড়তে রাজী হয়ে গেছেন।

তারাশঙ্কর এই মন্তব্যে আপত্তি করেছিলেন—কারণ তিনি এই উক্তিগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন—এবং সেদিন সভা ছেড়ে চলে যান। পরের দিন সুধী প্রধানই তাঁকে ডেকে আনেন এবং প্রতিনিধি সভাতে সংঘের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও উন্নতির পথ নির্দেশ করতে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রতিনিধি সভায় তারাশঙ্কর দীর্ঘক্ষণ সংগঠনের প্রসারমূলক বক্তৃতা করেন। কাজেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শেষ বারের মত চলে আসতে তিনি পারেন নি—এদের বন্ধনে তিনি সুবিধামত আরো কিছুকাল ছিলেন—তার কারণস্বরূপ তিনি অবশ্য বলেছেন এদের বন্ধনের নানারূপ ধরতে বা "পাক" ছাড়াতে তাঁর দেরী হয়েছিল।

ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। এই ঘটনার কিছু আগে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর কাছে আহ্বান আসে যোগদানের। শচীন মিত্রের সেই পত্রের উত্তরে তিনি লেখেন যে, কোন রাজনৈতিক পার্টির সাহিত্য হয়—এ তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে যোগ না দিয়েও সেখানে তাঁর যাতায়াত শুরু হল নির্বাচনের যুগে। তখন কংগ্রেসীরা কমিউনিষ্টদের পথে-ঘাটে মারধোর করছে, কমিউনিষ্ট মেয়েদের অপমান করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। নির্বাচনের দিনগুলিতে এই ব্যাপার চরমে উঠলো। অধ্যাপক নীরেন রায়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এই নৃশংসতা থেকে উদ্ধার পেলেন না। তারাশঙ্কর এ সবের খবর পেতেন। এরপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যুগ এল—যখন কংগ্রেসের বহু সমর্থকদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোন তফাৎ রইল না। কিন্তু কমিউনিষ্টরা আবার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিপদ ডেকে আনলেন।

নোয়াখালিতে সদ্য আন্দামান ফেরত কমিউনিষ্ট লালমোহন সেন প্রাণ দিলেন, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মিত্রও শহীদ হলেন। তারাশঙ্কর সেদিন পূজা সংখ্যার এক রচনাতে নিজেকে এবং যামিনী রায় প্রভৃতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"সাহস আছে কি তোমাদের?" বস্তুতঃ সেদিন স্রোতের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যাওয়ার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল।

এই প্রসঙ্গে এমন একটা ঘটনা মনে পড়ে যাতে তারাশঙ্করের চরিত্রের আর একটি দিক প্রকাশ পায়, অন্ততঃ আমার কাছে। দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে সকল মতের সংস্কৃতি কর্মীদের আমরা এক করি। বস্তুতঃ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘও প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘ এক হয়ে কাজ করতে পারে বলে শচীন্দ্রনাথ মিত্র নিহত হওয়ার আগেই আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর শোক সভায় আমি সেই প্রস্তাব উত্থাপন করলে সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তরফ থেকে সেই প্রস্তাবে সাড়া দেন এবং তাঁদের সংঘের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অধ্যাপক নির্মল বসুর সঙ্গে সজনীকান্ত দাস ও তাঁর বন্ধুরা শান্তি অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সংঘের পক্ষ থেকে কমিউনিষ্ট কর্মীরা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সজনীকান্তের এই উদ্যোগকে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে তাঁদের সংঘের সজনী-বিরোধী অংশ কম ক্ষুব্ধ হন নি। কিন্তু জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে দলগত বা ফ্রন্টগত সংকীর্ণতা কমিউনিষ্টরা বড় করে দেখে না বলেই শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত চেষ্টায় সে যুগে সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য বাংলার বৃহত্তম সভা ও শোভাযাত্রা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ সভায় সজনীকান্ত দাস সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর ছবি "স্বাধীনতা" কাগজে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারটি তারাশঙ্করের পছন্দ হল না। ঢাকায় একটি সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা দল পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বাগবাজারের বাসায় যেতে তিনি আমাকে বললেন,—সজনীদের নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ক'র না। আমরা তোমাদের সঙ্গে অনেক দূর যাব—এরা কিন্তু বেশীদিন থাকবে না।" সজনীবাবুর সম্পর্কে আরো একটি মন্তব্য তিনি করেছেন—যাতে তাঁর বন্ধুপ্রীতি সম্পর্কে সংশয় জাগে। গণনাট্য সংঘের 'ভারতের মর্মবাণী' নামে নৃত্যনাট্য দেখবার জন্য অন্যান্য সংবাদপত্র সম্পাদক ও সাহিত্যিকদের সংঘ নিমন্ত্রণ করেছিল যার মধ্যে সজনীকান্ত দাস একজন ছিলেন। তারাশঙ্করবাবু এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাতে সজনীকান্তকে চিৎপুর পাড়ার দর্শকশ্রেণীভুক্ত করা হয়। কাজেই তারাশঙ্কর একদিন কমিউনিষ্ট হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও

'অকৃত্রিম হিতৈষী' বলে দুবছর বাদেই তাঁর দলকে পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও সোভিয়েত গুপ্তচরের দল বলবেন—তাতে আর আশ্চর্য কি! হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ই তাঁকে প্রথম জানান যে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (Voks) সোবিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে এবং তিনি যেতে পারবেন—কিনা। সেদিন তারাশঙ্কর, হীরেন্দ্রনাথকে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখান—কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি কলকাতায় এক সংবাদপত্র অফিসে বলেন—আর কমিউনিষ্ট ফাঁদে তিনি পড়তে চান না বলে রাশিয়ায় যেতে অস্বীকার করেছেন। এখবর হীরেন্দ্রনাথের কাছে এলে তিনি বিশ্বাস করেন নি, বরং যারা খবর এনেছিল—তাদের প্রতি তিনি রুষ্টই হয়েছিলেন। সজনীকান্ত হয়ত আজ আমার কথা তেমনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না—যতদিন না তারাশঙ্করের "সাহিত্য জীবনের" আর এক অধ্যায় প্রকাশ পায়। অবশ্য বর্তমান অধ্যায় প্রকাশ করতে গিয়েও শুনেছি—সজনীকান্ত একেবারে রক্ষা পান নি। বছর দুই আগে 'শনিবারের চিঠি" পূজাসংখ্যায় বনফুলের 'ছুঁচোর আত্মজীবনী' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। নিজ কীর্তিতে স্ফীত ও স্পর্শকাতর তারাশঙ্কর তাঁরই "সাহিত্য জীবন" রচনার উপর কটাক্ষ মনে করে সজনীকান্তর উপর এক হাত নেন। তারাশঙ্করের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে সজনীকান্ত নিজেই লিখেছেন,—"মানুষটি অতিশয় জটিল" (১৩৫৪ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা, 'শনিবারের চিঠি') এবং সজনীকান্ত যে তা নন—তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারাশঙ্কর তাঁর কুৎসাবাদ শেষ করার আগে "হাঁসুলি বাঁকের উপকথা" নিয়ে কমিউনিষ্টদের পরস্পর বিরোধী মত এবং তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াতে উক্ত বই ছাপা হল না বলে একটি অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিদেশের কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্টদের গোপন যোগাযোগের কথা।

"হাঁসুলি বাঁকের উপকথা" নিয়ে প্রগতি লেখক সংঘে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এই তর্কাতর্কির শীর্ষে দুই পক্ষে এমন দুজন ছিলেন যাঁরা কমিউনিষ্ট নন—অথচ সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত। একজন কবি বিষ্ণু দে পক্ষে—অপরজন হীরণ সান্যাল—বিপক্ষে। হীরণ সান্যালের সমালোচনা 'পরিচয়ে' ছাপানো হয়েছিল। এর প্রতিবাদে বিষ্ণু দে 'পরিচয়ের' সম্পাদকীয় বোর্ড থেকে ইস্তফা দেন। কমিউনিষ্ট কর্মীরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন না—কিন্তু হীরণ বাবুর লেখাকে প্রকাশ করা হয় অন্য কারণে। বয়স ও

সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি 'পরিচয়ে'র অন্যতম অগ্রজ এবং দল নিরপেক্ষ এই কারণে। তিনি তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা'-র সমালোচনা 'পরিচয়ে' করেন এবং সেখানেও তিনি কোন কোন বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিরূপ সমালোচনা পাওয়ার জন্য কমিউনিষ্টরাও প্রস্তুত ছিল এবং তা তারাশঙ্করের আগেই ঘটে। ঘটনাটা ঘটেছিল বিজন ভট্টাচার্যের বিখ্যাত নাটক "নবান্ন" নিয়ে। 'নবান্ন' তখন কলকাতায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব 'নবান্ন'র কমিউনিষ্ট কর্মীদের কাজে খুশী হয়ে "লাল পতাকা"র সম্মান দিয়েছে। অথচ সেই নাটকের কিছু বিরূপ সমালোচনা লিখলেন 'পরিচয়ে' হীরণকুমার সান্যাল, যাতে কমিউনিষ্ট কর্মীদের একাংশ ও বিষ্ণু দে প্রভৃতিরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কাজেই একথা জোর করে বলা যায় যে, লেখক সংঘে লেখকের রচনা নিয়ে যে সব মতবিরোধ হয়েছে —তাতে কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কদাচিৎ পক্ষ নিতেন। তারাশঙ্কর বাবু এটা জানতেন বলেই আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট নেতা ভবানী সেনের একটি প্রশংসাপত্র 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"র জন্য পাওয়া যায় কিনা—জানতে চেয়েছিলেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কাছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাঁর বই ছাপা হয় নি—ইংরাজী অনুবাদের অভাবে। চেকোশ্লোভাক কর্তৃপক্ষের পত্র—যা তারাশঙ্কর বাবু উদ্ধৃত করেছেন—তার থেকেই তা প্রমাণ হয়। কমিউনিষ্ট বিরোধিতাই যদি তাদের একমাত্র মাপকাঠি হত তাহলে 'প্রগতি' সংকলনে স্থানাভাবে পরিত্যক্ত "তারিণী মাঝি"র রুশ অনুবাদ সম্প্রতি সোবিয়েত ইউনিয়নে বের হত না এবং ১৯৫২ সালেও পোল্যাণ্ড থেকে 'পরিচয়' অফিসে তারাশঙ্করবাবুর কাছে অনুরোধ আসতো না। একথা তারাশঙ্করবাবু চেপে গেলেন কেন? ১৯৪৬-৪৭ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাংলা দেশের যে রচনাগুলি অনুদিত হয় তার পিছনে ছিলেন, সেই সময় প্রাগে অবস্থিত এক বাঙালী তরুণ যাকে আমরা কোনদিনই চিনতাম না। তিনি নিজে থেকে কয়েকটি অনুবাদ করেন। বইটি এদেশে এলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে উক্ত প্রকাশককে জানান—তারাশঙ্করবাবু, মানিকবাবু প্রভৃতির লেখা ছাপাতে। খুব সম্ভবতঃ তারপর তারাশঙ্করকে তাঁরা অনুরোধ করেন এবং প্রধানতঃ ইংরাজী অনুবাদ চান 'could be reviewed by some of the reliable readers who co-operate with FLK' (তারাশঙ্করের নিকট লিখিত চেক প্রকাশক প্রতিনিধির পত্র)। এতে করে প্রমাণিত হয় যে তারা

ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য পাঠককে তার রিভিউ করার পরে তাদের ভাষায় অনুবাদের যোগ্য কিনা—বিবেচনা করবে। বাংলায় কমিউনিষ্ট-দের সঙ্গে গোপন সম্বন্ধ এতে প্রমাণ হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক বাঙালী লেখকদের মধ্যে ভবানী ভট্টাচার্যের বই প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ভদ্রলোককে আমরা কেউই চিনি না বা তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁর লেখা বই ইংরাজীতে ছিল এবং তা কোন সোবিয়েত সমা-লোচকের ভাল লেগেছিল তাই সেইটাই প্রথম প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে যে সব লেখক ও কবি ওদেশ থেকে এসেছেন—তারা সকলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদের দাবী করেন। প্রসঙ্গতঃ পূর্বোক্ত ভবাণী ভট্টা-চার্য্যেরই সুপারিশে পোল্যাণ্ড থেকে সম্প্রতি তারাশঙ্করের কাছে অনুরোধ এসেছিল। কাজেই সোবিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের সাহিত্য বিচার ভারতের কমিউনিষ্টদের দলগত সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়—তারাশঙ্করের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সেবারে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ফিল্ম ডিরেক্টর দেবকীকুমার বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও নিমাই ঘোষ—তারাশঙ্করের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হন। এই ঘটনার আগে বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর পুডভকিন ও অভিনেতা চেরকাশভ কলিকাতায় আসেন এবং তাঁরা ব্যক্তিগত-ভাবে কাউকে কাউকে নিমন্ত্রণ করেন। তারপর যখন সোভিয়েট সংস্কৃতি-যোগাযোগ বিভাগের ভারতীয় দপ্তর থেকে (voks) নিমন্ত্রণ পত্রগুলি আসে তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির অন্যতম নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের পক্ষ থেকে স্বভাবতঃই অনুরোধ করা হয়েছিল নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পূর্ব্বেই বলেছি – তারাশঙ্করের বন্ধুত্বে প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাসী হীরেনবাবুকে তারাশঙ্কর কিভাবে এই ব্যাপারে এক মিথ্যা অজুহাত দেন এবং "শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও অকৃত্রিম হিতৈষী"র ভাগ্যে সোভিয়েত গুপ্তচরের অপবাদ জোটে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে সাম্প্রতিক কালে ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘ, (যার মধ্যে কংগ্রেসের লোকেরাও আছেন) এবং ভারত সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে গেছেন। এই সব দলে, এমন কি সরকারী মহলেও কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস, প্রজাসোসালিষ্ট এবং দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও গেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব্ব ইউরোপ বা চীনের

নিন্দা করেছেন। কাজেই কেবল কমিউনিষ্টদের সুপারিশের এবং তার জন্য সোভিয়েত ও চীনকে প্রশংসা করার অবিশ্বাস্য সর্তের যে অভিযোগ তারাশঙ্কর করেছেন তা একেবারেই মার্কিন প্রচারকদের পদ্ধতি অনুযায়ী।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও কমিউনিষ্ট

রুশ ও চীনের ভারতীয় দালালরা ছদ্মনামে কি ভাবে নিরীহ লোককে এমন কি অনেক পোড় খাওয়া তারাশঙ্করকে ফাঁদে ফেলতে পারে তার একটা বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর রচনা শেষ করেছেন। ঘটনাটি এই, বাংলার কৃষক জীবনের অমর কাহিনী রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য এক সভার আয়োজন করেছিল তার গ্রামবাসীরা। বস্তুতঃ এই কাজে পাশের গ্রামের এক কালের কংগ্রেস ও পরে কমিউনিষ্ট কর্মী মোল্লা জাহেদালী বিশেষ উদ্যোগ নেন। জাহেদালী ১৯২১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কয়েকবার জেলে গেছেন। তাঁর প্রাথমিক উৎসাহ ও জনপ্রিয়তার জন্য অ-কমিউনিষ্ট গ্রামবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করে। এই সমিতির চেষ্টায় বর্দ্ধমান শহর থেকেও জেলার বিভিন্ন দলের নেতারা অনুষ্ঠানের পক্ষে বিবৃতি দেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এফ, বি, ও পি, এস, পি'র নেতাদের (দাশরথি তা) নাম ছিল। এই আয়োজনের কথা কলকাতার কাগজে প্রকাশিত হয় এবং স্কটিশচার্চ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জন কেলাস সেই বিবৃতি দেখে ওখানে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে জাহেদালীকে লেখেন। এমনিভাবে মীরাট মামলার ভূতপূর্ব বন্দী রাধারমণ মিত্রও পত্র লেখেন এবং যান। মোটের উপর ব্যাপারটা তারাশঙ্কর বাবুর কথামত গোপন ফাঁদ বলে বিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না। এই সভায় কলকাতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, চিত্র পরিচালক নিমাই ঘোষ ও গণনাট্য সংঘের কর্মীরা গিয়েছিলেন।

এই সভার ফল খুবই ভাল হয়েছিল। অধ্যক্ষ কেলাস ওখান থেকে এসে স্কটিশচার্চ কলেজে রক্ষিত স্মৃতি প্রস্তরে ভুল গ্রামের নাম পরিবর্তন করে সোনা-পলাশী গ্রামের নাম লেখান। পরের বছর লালবিহারী স্মৃতি তহবিল কমিটি গড়া হয়, যার মধ্যে অধ্যক্ষ কেলাস, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ বিমলাচরণ লাহা প্রভৃতি এলেন এবং শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উক্ত গ্রামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করলেন। লালবিহারীর জন্মস্থানের পার্শ্ববর্তি গ্রামের একটি কমিউনিষ্টের উদ্যোগে এই যে

ঘটনা ঘটলো তার জন্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর কোথায় তাঁকে প্রশংসা করবেন—তা না সস্তা কমিউনিষ্ট বিরোধিতার নামে তাঁকে ছদ্ম প্রতারক বলে গালাগালি দিলেন। চরম বিদ্বেষে তিনি এই সভার যে বিবরণ দিয়েছেন সেই সময়কার কলিকাতার দৈনিক কাগজে (সব কাগজেই এই সভার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়) তার কোন প্রতিফলন নেই। অবশ্য সেই সব রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত—কিন্তু 'সুবর্ণ-বণিক সমাচার' নামে যে কাগজটি সভার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে তাতেও তারাশঙ্করের অভিযোগ মেলে না। এই কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহাকে কেউই কমিউনিষ্ট বলবে না। এই কাগজের ৩৬ বর্ষ ৮ সংখ্যায় বলা আছে,—প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মোল্লা জাহেদালীর বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতায় কোথাও কমিউনিজম, রুশিয়া বা চীনের প্রসঙ্গ ছিল না। তারপর গ্রামের ডাক্তার অম্বুজাকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন। স্থানীয় শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত একটি কবিতা পাঠ করেন। তারপর অধ্যক্ষ কেলাস বক্তৃতা করেন। আবদুল গণি খাঁ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন—কবিতাটি দীর্ঘ হয়েছিল বলে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করা হয়—কিন্তু তারাশঙ্করবাবু সভাপতি হিসাবে পড়া শেষ করতে দেন। কিছুদিন পরে বর্দ্ধমানে যখন কংগ্রেসী সাহিত্যিকদের সভা হয়—তারাশঙ্করবাবু এই কবিকে ডেকে নিয়ে যান। এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন। এঁদের কেউই কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য নন, অথচ এঁদের একজন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরজন চীন ভ্রমণ করে এসেছেন। এঁদের মত খ্যাতনামা ব্যক্তি সচরাচর ঐ সব অঞ্চলে আসেন না। সুতরাং লালবিহারী ও বাংলার কৃষকের জীবন প্রসঙ্গে তাঁরা যদি রুশ ও চীনের কৃষক সম্পর্কে বক্তৃতা করে থাকেন তা' খুবই স্বাভাবিক হবে—এবং একমাত্র তারাশঙ্কর ছাড়া অন্যেরা নিশ্চয় কৌতূহলের সঙ্গে শুনেছেন। 'সুবর্ণবণিক সমাচার' কাগজে ওঁদের যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতে দেখা যায় ওঁরা লালবিহারী দে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং রুশ ও চীনের কোন উল্লেখ নেই। গণনাট্য সংঘও "জন্মভূমি" গানটি দিয়ে শুরু করেন এবং 'বিচার' নাটিকা অভিনয় করেন। ইতিমধ্যে তারাশঙ্করবাবু রাত্রের ট্রেণ ধরার জন্য রাধারমণবাবুকে সভাপতি করে চলে আসেন। এই সমস্ত ঘটনা এবং তারাশঙ্করের লেখা থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ যা পরে প্রগতি লেখক সংঘ হয়েছে তা মূলতঃ সাহিত্য-কর্ম ছেড়ে কোন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান হয়েছে।

শিল্পকর্ম মানবমুক্তির হাতিয়ার

কমিউনিষ্ট সংস্কৃতিকর্মীরা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করে—মানব-মুক্তির সংগ্রামে সংস্কৃতি নিরপেক্ষ হতে পারে না—সে তার নিজস্ব রূপ-রীতি-নিয়ে এই সংগ্রামে সাহায্য করবে। মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্তালিন ও গোর্কীর এই ঘোষিত নীতি যৌবনে মার্কসবাদে আকৃষ্ট তারাশঙ্কর যদি না পড়ে থাকেন তাহলে সে তাঁরই অজ্ঞতার পরিচায়ক—কমিউনিষ্টদের অপরাধ নয়। কমিউনিষ্টরা জানে যে রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েও সত্যিকারের শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজের যে শিল্পরূপ দেন তা বহুক্ষেত্রে বিপ্লবের সহায়ক হতে পারে—তাই তাঁরা সব সময়ে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সমস্যা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও চাইবেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই চেষ্টার বিবরণ বিশ্ব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নেতাদের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—যার ঐতিহ্য লুই ফিশার থেকে তারাশঙ্কর পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও মুছে দিতে পারবেন না। মুক্ত এশিয়া ও মুক্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাশিজম, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে গোর্কী, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, বারবুশ, শ, প্রভৃতির চেষ্টা এই কথাই প্রমাণ করবে যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবানরা নিরপেক্ষ ছিলেন না বরং মুক্তিসংগ্রামে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে বহু শহীদের মৃত্যুর আগে সাহস ও প্রেরণা দিয়েছেন। কর্ণফোর্থ, কডওয়েল, রালফ ফক্স ও সোমেন চন্দরা তার প্রমাণ।

কমিউনিষ্টরা বিনীতভাবে এই ঋণ-স্বীকার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট ও প্রগতিশীলদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ তারা কখনো অস্বীকার করে না। কারণ এই সম্পর্ক অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নয়—মানব মুক্তির বাস্তব প্রয়োজনে। যার জন্য জার্মানীর কার্ল মার্কস এর শিক্ষা নিয়ে রুশিয়ার লেনিন বা চীনের মাও-সে-তুং দেশ ও বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের শত নিন্দা সত্ত্বেও নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পরাঙ্মুখ হননি। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের যে সকল কমিউনিষ্টকর্মীদের তারাশঙ্কর প্রশংসা করার ঔদার্য দেখিয়ে—তাদের আদর্শকে নিন্দা করেছেন—তাদের নিষ্ঠা ও সুদুর্লভ প্রকৃতির মূলে রয়েছে তাদের আদর্শ নিষ্ঠা।

তৃতীয় রিপুর তাড়নায়

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনে লিখেছেন যে, কংগ্রেস আন্দোলন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয় বুঝে তিনি পুরাপুরি সহিত্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যিক সাফল্য বিলম্ব দেখে বাড়ির লোক হতাশ হল—শ্বশুরবাড়ীর লোক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'ল তাদের কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে এবং সেই অবস্থায় টিনের ঘরে শুয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে এমন রচনা লিখবেন যা বর্তমানে আদৃত না হলেও কোন না কোন সময়ে হবে। সাহিত্যে যশাভিলাষী তারাশঙ্কর তাই কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, গান্ধীজী, মার্ক্‌স-এবং শেষ পর্য্যন্ত 'প্রাচী' প্রকাশনীর সিঁড়িগুলি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেছেন—যশ তাঁর হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বৈষয়িক সাফল্য—যার বারো আনাই তাঁর নিজের ভাষায় 'আর্থিক সাফল্য।'

কিন্তু তিনি যাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে তাঁদের আদর্শের গায়ে কাদা ছিটিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশেরই জীবনে অভাব, লাঞ্ছনা ও অপবাদ অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। এবং আশ্চর্য যে তা সত্বেও তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তরুণ লেখক ও শিল্পীরা। আশা করা গিয়েছিল,—সাহিত্যিক তারাশঙ্কর তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করবেন।

কিন্তু "সুবিধাবাদী" রাজনীতির মুখোশ পরতে গিয়ে তারাশঙ্কর আজ তাঁর সাহিত্য-ধর্মও হারাতে বসেছেন। যে দক্ষতা একদিন পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের অভাব সত্বেও দেশের সাধারণ মানুষ, তার দুঃখ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে নিযুক্ত হয়েছিল আজ তা সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও মধ্যযুগের ভাবধারা প্রচারে ব্যস্ত। এর বিনিময়ে আজকের শাসকশ্রেণীর কাছে বাহবা ও শিরোপা মিললেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ঘটনাটা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর ও দুঃখজনক।

দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকা [আষাঢ়-শ্রাবণ]—১৩৬২ সাল।

নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে

নব-নাট্য আন্দোলন বলতে যদি কোন নতুন নাটক লেখাও প্রযোজনার বিষয় বোঝায়—তাহলে এ প্রবন্ধে তা' আলোচনার সুযোগ আমার নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে বাংলা নাটক লেখা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে সব তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোচনা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যে যুগের কথা আমি বলছি সেই যুগে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম ও বৃদ্ধি যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটা আজ অনেকে স্বীকার করছেন। কাজেই এ যুগের নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস বলতে গেলে গণনাট্য সংঘের জন্মকালের আগের ঘটনা বলতে হবে।

গণনাট্য বা পিপ্‌ল্‌স থিয়েটার কথাটার পিছনে ফরাসী দেশের থিয়েটর লিব্‌র (স্বাধীন থিয়েটার) জার্মানীর অটো ব্রাহ্‌ম-এর নব স্বাধীন থিয়েটার, ইংলণ্ডের টমাস গ্রেইন'র ইণ্ডিডিপেডেণ্ট থিয়েটার' এবং রমাঁ রলাঁর পিপ্‌ল্‌স থিয়েটারের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের কিছু কর্মী সচেতন ভাবে সেই ধারা অনুকরণ করলেও ঘটনাগুলি যান্ত্রিক অনুকরণ নয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে একটি মৌলিক বিশ্বদর্শনের বিচারে আমরা উক্ত নাম ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম। ইতিহাসের ক্রমপরিণতিতে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব আগে হয়েছিল বলেই সেখানে আগে উক্ত ঘটনা ঘটে এবং আমাদের শিল্পবিপ্লব ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় বাধা পেয়েছিল বলে এদেশে উক্ত ঘটনা ঘটতে দেরী হ'ল। একশোবছর আগে ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শ, সেক্সপিয়ার—মলিয়েবের নাটক পঠন-পাঠন, বিদেশী শিক্ষকদের কাছে আবৃত্তি এবং অভিনয় শিক্ষা, এদেশে বিলাতী থিয়েটারের অভিনয় দর্শন—এক দিকে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরকে দিয়ে সমাজ সংস্কারের পথ তৈরী করছিল—অপর দিকে রামনারায়ণ, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিকে দিয়ে আধুনিক বাস্তববাদী বাংলা নাটক ও তাদের অভিনয়োপযোগী মঞ্চ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

এর একশো বছর পরে সমাজতন্ত্রবাদের ভাবাদর্শ তরুণ জাতীয়তাবাদী ও

বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মনে যে আকুতি সৃষ্টি করে তার ফলে ১৯৩২-৩৪ সালে লণ্ডনে পাঠরত কয়েকটি ভারতীয় যুবক সাহিত্য ও শিল্পকলার নতুন তাৎপর্য্য আলোচনার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এঁদের অনেকেই পরে কংগ্রেস, সোসালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ্য। এঁদের চেষ্টায় ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন হয়—যেখানে বহু লেখকের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। [এই প্রবন্ধের কিছু অংশের জন্য এই বইয়েয় ৫৯-৬০ পাতা অবশ্য দেখা দরকার—প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারের জন্য। কিন্তু সেখানে বলা হয়নি যে ১৯৩৬ সালে সারাভারত ছাত্রফেডারেশন সৃষ্টি হয়—যার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন—মহম্মদ আলি জিন্না]।

এই লেখক সংঘে সমবেত হয়েছিলেন প্রাচীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্র, তরুণ লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গীতিকার ও নাট্যকাররা। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে উক্ত লেখক সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় অধিবেশন ঘটে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাই ছাত্ররা ক'লকাতার আশেপাশের জেলায় পথ নাটিকা ও গান করে বেড়াচ্ছেন। বাংলার অনেকগুলি জেলায় প্রগতি সাহিত্যা-দর্শের ভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং সৃষ্টি হয় গান ও অভিনয়ের দল। এদের চিন্তায় নতুন বিশ্বদর্শন এবং তার উপযোগী সংগঠন যার সঙ্গে আগেকার দিনের সৌখিন নাটুকে দলের মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা ছিল।

কলকাতা ও মফস্বল জেলাগুলিতে এই ধরণের কাজগুলির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট বা YCI। কারণ পরবর্তি-কালে বাংলা গণনাট্যসংঘের অনেক কর্মী এই দল থেকে এসেছিলেন। এই ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক এবং বিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র জলিমোহন কাউল রোয়িং ক্লাবের এক অনুষ্ঠানের জন্য লিখলেন—'পলিটিসিয়ানস্ টেক টু রোয়িং' (রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নৌকা বাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন)। নাটিকাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব্ব ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে লেখা। আমাদের দেশের রাজাগোপালাচারীর চরিত্র নাটকের চরিত্র হয়েছিল।

এই নাটিকার অভিনয় এত চিত্তাকর্ষক হয় যে স্কটিশচার্চ কলেজে দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। জলি 'বয় গ্রোজ আপ' (ছেলে বড় হচ্ছে) বলে আর একটি নাটিকা লেখেন। এই প্রতিষ্ঠানে অভিনয় ছাড়া সমবেত সঙ্গীতের আসর বসতো—যেখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদের গানগুলির সঙ্গে ফরাসী দেশের জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সাই (অব কোমর বন্ধ্ তৈয়ার হো), ইনটারন্যাশনাল (শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক গীত), ইটালি ও রুশিয়ার বিপ্লবী সঙ্গীত গাওয়া হ'ত। এই ইনষ্টিটিউটের প্রথম সভা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানার বাড়ীতে হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিন্তামনি কর—যিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ দেখে এসেছেন, তিনি সংগঠনের প্রতীক চিহ্ন এঁকে দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী প্রফেসর অব-আর্ট শাহেদ সুরাবর্দি সভাপতি মনোনীত হন। গানের দলে বর্তমানে বিখ্যাত দেবব্রত বিশ্বাস এবং নিখিল সেন ছিলেন। এই দলের নাটকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেবব্রত বসুর লেখা, 'ইন দি হার্ট অব চায়না' (চীনের অভ্যন্তরে) এবং 'দি শপকীপার্স' (দোকানদার) নাটিকা দুটি অভিনীত হয়।

বাঙালী ছেলেরা (জলি কাশ্মিরী, কিন্তু ক'লকাতার বাসিন্দা) আন্তর্জাতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরাজীতে নাটক লিখবে—এমন আর কতদিন চলতে পারে। ইতিমধ্যে 'আনন্দবাজার' ও 'অগ্রণী' পত্রিকা মারফৎ নতুন শক্তিশালী লেখক ও সমালোচক তৈরী হয়েছে যাদের সঙ্গে এই দলটির যোগাযোগ হ'ল। সুবোধ ঘোষ সবেমাত্র নাম করতে শুরু করেছেন। 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত তাঁর 'ফসিল' গল্পকে 'অঙ্গনগড়' নামে নাটকে রূপান্তরিত করলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। ওয়াই সি, আই ওভারটুন হলে (কলেজষ্ট্রীট ও হ্যারিসনরোডের সংযোগস্থলে) একই দিনে অভিনয় করলো—'অঙ্গনগড়' ও 'ইন দি হার্ট অব চায়না'। দর্শকদের মধ্যে কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন—এবং সময়টি ১৯৪০ সালের শেষদিকে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। তখনকার দিনে বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে অভিনয় বিশেষ প্রচলিত ছিল না। ওয়াই, সি, আইয়ের সদস্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রী শেষোক্ত নাটকে অভিনয় করতে রাজী হয়েও যে দৃশ্যে ছেলেরা থাকবে সে সব দৃশ্যে নামতে রাজী হলেন না। হাসপাতালের দৃশ্যে নার্স দেখা গেল কিন্তু রোগীর বিছানায় কেবল সাদা চাদর!

এর পর এই দলের হয়ে সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'কেরাণী' নামে একটি নাটক লেখেন এবং মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে তার অভিনয় হয়। কেরাণী জীবনের দুঃখ

দুর্দশা নিয়ে তখনো সংগ্রামের সংগঠন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল—তারই পূর্বাভাষ। এই নাটকের পরিচালনায় এবং অভিনয়ে ছিলেন খ্যাতনামা ফিল্ম পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ পরিকল্পনায় নতুনত্ব করা হয়েছিল মঞ্চটাকে দুই কামরা করে। দু'টি দৃশ্যই দর্শকরা একসঙ্গে দেখতে পেত। এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়—ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এতে। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সরোজিনী নাইডু। ইউথ কালচারারাল ইনষ্টিটিউটের অভিনীত এই নাটক অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ নাটক এবং এইটিই বোধ করি ঐ দলের শেষ নাটক। কারণ এরপর জাপানী আক্রমণ পূর্বভারতে সুরু হলে সংস্থাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং তার শেষ অফিস ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে অল্পদিনের মধ্যে সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ এবং ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ স্থাপিত হয়। সুনীল চট্টোপাধ্যায় এই লেখক ও শিল্পী-সংঘের নাট্যবিভাগের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। বিভাগটির নাম পরে গণনাট্য বিভাগ রাখা হয়। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই শহরে সর্বভারতীয় গণনাট্যসংঘ স্থাপিত হলে—এই বিভাগটি তারই শাখা হিসাবে কাজ করতে থাকে—যদিচ সংগঠনের নতুন চেহারা হয় নতুন লোকদের নিয়ে।

পূর্বোক্ত নাটিকা/নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি এখন যোগাড় করা সম্ভব নয়। তবে আমি কিছু কিছু দেখেছি বলে বলতে পারি বিষয়বস্তুতে একদিকে কেমন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করার চেষ্টা ছিল—অপরদিকে তারা নতুন ধরণের বাস্তববাদী বাংলা নাটকের ভিত্তিভূমি তৈরী করেছিল। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৪১ এ বোম্বাইয়ে গঠিত গণনাট্য সংঘের (বাঙালোরে সর্বপ্রথম গণনাট্যসংঘ নাম দিয়ে সংস্থা স্থাপিত হয়) উদ্দেশ্যে বলেন: "ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের উন্নতিবৃদ্ধিতে আমি অত্যন্ত আগ্রহশীল। জনগণ এবং এদেশের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তার বিকাশ হলে প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। অন্যথায় এটি হাওয়ায় ভাসবে। তোমাদের সার্কুলারে জনগণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি আনন্দিত। চীন ও স্পেনে এই আন্দোলন বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে তার অভাব। তথাপি এদিকে চেষ্টা সুরু করা দরকার আর তাই আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি।" প্রকৃতপক্ষে গণনাট্য আন্দোলনের ঠিক আগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই হ'ল সংক্ষিপ্ত বিবরণ। স্পেনে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীরা লড়েছিলেন এবং প্রাণ দিয়ে ছিলেন—(জহরলাল নেহেরু, মুল্‌করাজ আনন্দ, চিন্তামণি কর প্রভৃতি এদের সঙ্গে

সহমর্মিতা জানিয়ে এসেছিলেন) এবং চীনেও জাপ-বিরোধী আন্দোলনে নাটকের ভূমিকা ছিল। সে যুগে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে উৎসাহও শক্তি যোগাচ্ছিল। তাই শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যেকার সচেতন অংশ নিজ দেশের অবস্থা বিবেচনা করে নতুন সংস্কৃতি তথা নাট্য আন্দোলন ধীরে ধীরে তৈরী করতে অগ্রসর হল।

আমি আগেই বলেছি সুবোধ ঘোষ প্রমুখ নতুন ধরণেব সাহিত্যিকদের সঙ্গে এই দলের অনেকের সংযোগ ছিল। আনন্দবাজারের সেই যুগের তরুণ লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য্য, অরুণ মিত্র প্রভৃতি অনেকে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান করেন। গঙ্গাপদ বসুও আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আসেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' কাগজ এঁদের রচনা ছাপতে থাকে। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে খ্যাতনামা শিল্পী হারীণ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে এদের যোগাযোগ দৃঢ় হয়। ইতিমধ্যে ক'লকাতাব পথে পথে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বিনয় রায় ও তাঁর তৈবী গায়কের দল। হারীণের সাহায্যে কয়েকটি নৃত্য-গীত ও নাটিকার অভিনয় হয। এই ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই বিনয় ঘোষ 'ল্যাবরেটরী' এবং বিজন ভট্টাচার্য্য 'আগুন' নামে দুটি একাঙ্কিকা রচনা করেন। বিনয় ও বিজনের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের আলাপ ছিল—আগে থেকেই। শম্ভুবাবু পেশাদার মঞ্চে চেষ্টা করেও কোন সুযোগ না পেয়ে মনমরা অবস্থায় ছিলেন। ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখকও শিল্পী সংঘে তাঁকে বিনয় ঘোষ আনেন এবং 'ল্যাবরেটরী' নাটকের পরিচালনার ভার দেন। শম্ভুবাবু এই নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে এবং পরিচালনা করে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসের প্রথম দিকে একই রাত্রিতে 'নাট্যভারতী' মঞ্চে (বর্ত্তমানে গ্রেস সিনেমা) নাটিকা দু'টি অভিনীত হয়। 'ল্যাবরেটরী' একটি ফ্যাশিষ্টবিরোধী চলচ্চিত্র 'প্রফেসার ম্যামলক' দেখে লেখা। কিন্তু বিনয়বাবু তার আদর্শ ছাড়া আর কিছুই নেননি। আগত মহা মন্বন্তরের পটভূমিতে বৈজ্ঞানিক ও তার আন্দোলনকারী পুত্র-কন্যার বিরোধ মীমাংসায় নাটক শেষ হয়। আর বিজনের 'আগুন' ছিল চালের কণ্ট্রোল দোকানের সামনে ক্রেতাদের লাইন শান্তি পূর্ণ রাখার সমস্যা নিয়ে লেখা। এই রাত্রিতে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য্য, তৃপ্তি ভাদুড়ি (বর্ত্তমানে মিত্র) ও আমি গণনাট্যের অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে পরিচিত হই। নাটকগুলির গঠন তত ভাল ছিল না, কিন্তু বিষয়বস্তু ও

টিম ওয়ার্কের জোরে দর্শকদের তৃপ্ত করে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে আমাদের বন্ধুপত্নী রেখা জৈনকে কৃষক রমণী হিসাবে আমার বিপরীত স্ত্রী ভূমিকায় নামানো হয়েছিল। তিনি কিন্তু গরীব কৃষক বধূর ময়লা কাপড় না পরে আধুনিকার বেশে মঞ্চে নেমে ছিলেন। অপর পক্ষে আমি ছেঁড়া ও ময়লা গেঞ্জি, হাঁটুর উপর কাপড় পরে ভাঙ্গা কলকে টানতে টানতে অভিনয় করেছিলাম।

এর পর ১৯৪৩ সালেই লেখা নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের রচিত 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটিকা নিয়ে ১৯৪৪ সালের প্রথমেই অভিনয় সুরু হয়। 'হোমিওপ্যাথী'তে জাপানী আক্রমণের পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দৃশ্য দেখানো হয়। এই নাটকটি ২ বারের বেশী অভিনীত হয় নি। কিন্তু 'জবানবন্দী'র জনপ্রিয়তা ছিল অভূতপূর্ব। আমার বিবেচনায় 'জবানবন্দী' নাটক কেবল গণনাট্যসংঘকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নি—নব-নাট্য আন্দোলনকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবান্বিত করেছে।

গঙ্গাপদবাবু,বিজন, তৃপ্তি মিত্র, রবীন মজুমদার, অমল ভট্টাচার্য্য ও আমি এই নাটকে অভিনয় করে নানাধরণের দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। আবার নাট্যকার হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য্য এবং পরিচালক হিসাবে শম্ভু মিত্রের ভবিষ্যৎ ও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এই নাটক হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় অভিনীত হয়। বাংলার বাইরে 'অন্তিম অভিলাষ' নামে এই নাটক অভিনয় করিয়ে এবং গঙ্গাপদবাবু যে ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেই ভূমিকায় শম্ভু মিত্র অভিনয় করে সর্বত্র, বিশেষ করে বোম্বাই শহরে বহু শিল্পী, ও রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির কাছ থেকে নিজের এবং সমগ্র দলটির জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। কলকাতায় আমাদের কাজ থাকায় গঙ্গাপদ, বিজন ও আমি এই টুরে যেতে পারিনি।

বিজনের যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন'র জন্য যে কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও সংগঠক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল—তা' এই নাটকে সাফল্যের ভিত্তিতে এই নাটক সম্পর্কে সেকালের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও সমালোচক যে সব মত প্রকাশ করেছিলেন—আমি তার সামান্য উল্লেখ করছি।

'জবানবন্দী'র প্রথম অভিনয় দেখে সংবাদপত্রে প্রথম মন্তব্য করেন বিখ্যাত চিত্র ও নাট্য সমালোচক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ। তিনি ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের ইংরাজী 'দীপালি'কাগজে নাটক ও অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করে লেখেন—নতুন থিয়েটার যারা করতে চায়—এই নাটক বারবার প্রদর্শিত হলে তারা

প্রয়োজনীয় উৎসাহ পাবে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত দ্বিতীয় অভিনয় দেখে বলেন: রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ে এঁরা নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা যত বেশী প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করবেন, থিয়েটার ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউশন হওয়ার পথে তত এগিয়ে যাবে। শ্রীনরেশ মিত্র বলেন: অভিনয়ের ভিতর দিয়ে এমনভাবে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করা যায় দেখে আমি চমৎকৃত। (আমি ও তৃপ্তি যশোহরে স্থানীয় একটি দলের হয়ে অভিনয় করি যা' দেখেছিলেন সে যুগের বিখ্যাত অভিনেতা নরেশ মিত্র এবং তৃপ্তিকে একটি রূপার পদক উপহার দিয়েছিলেন)। অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ি বলেন, "আমার ২৫ বছরের অভিনেতার জীবনে এ রকম বাস্তববাদী অভিনয় কখনো দেখিনি।" অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন: "জবানবন্দীর অভিনয় অপূর্ব। আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সোসালিষ্ট রিয়ালিজম (সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা) এতদিন আমার কাছে ধরতাই বুলি ছিল—আজ আর নেই।" এই হ'ল বাংলার ভিতরকার মতামত। বাংলার বাইরে, বিশেষ করে বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক নেতা ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের মতামত প্রায় অনুরূপ।

'জবানবন্দী'র বিষয়ে আমি এতখানি লিখলাম এই কারণে যে সবদিক থেকে 'নবান্ন'র প্রথম খসড়া এই 'জবানবন্দী'। বিষয়বস্তু ও চরিত্র সৃষ্টিতে 'জবানবন্দী'র অভিনয় 'নবান্ন' অভিনয়ের সংগঠন গড়ার বাস্তবভিত্তি রচনা করেছে। অর্থ, লোক-জন, সুনাম প্রভৃতি যে সকল বিষয় একটি শক্তিশালী দল গড়তে লাগে তা' এই নাটক দিয়েছে। বাংলার মন্বন্তরে কাতর মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে প্রথমে হারীণ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাব সফর এবং পরে শম্ভু মিত্র ও বিনয় রায়ের নেতৃত্বে বোম্বাই প্রভৃতি সফর কলকাতার পিপ্‌ল্‌স রিলিফ কমিটিকে জিনিষপত্রে ও অর্থে প্রায় লক্ষাধিক টাকা দেয়। পিপ্‌ল্‌স রিলিফ কমিটি তাই কিছু টাকা দিয়ে 'নবান্ন'র সর্বক্ষণের দলগড়ার সুযোগ করে দেন এই ভরসায় যে নবগঠিত দল বাংলার অনাহার ক্লিষ্ট রোগগ্রস্ত মানুষদের জন্য আরো সাহায্য সংগ্রহ করতে পারবে অনুষ্ঠানের দ্বারা। অবশ্য 'নবান্ন' সে আশা পূরণ করতে পারেনি। তাই ১৯৪৭ সালের মধ্যে সর্বক্ষণের দল উঠিয়ে দিতে হয়েছিল।

কোন কোন জায়গায় লেখা হয়েছে যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'নতুন প্রভাত' নব-নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে কারণ সেটি ১৯৩৯ সালে লেখা এবং কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়। সালের হিসাব করলে ছাত্র লেখকদের

নাটিকাগুলি, যারা ওয়াই, সি, আইতে নাটক লিখেছিলেন তাদের রচনাগুলি এবং 'ফসিল' ও 'কেরানী' 'নতুন প্রভাতের' সমসাময়িক। আমি জানি প্রয়াত জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত নামে একজন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীবন্দী ১৯৩৫ সালে জেলে বসে 'ভাঙাচাকা' নামে যে নাটক লেখেন—তা' সম্পূর্ণ মার্ক্সবাদ প্রভাবান্বিত প্রথম বাংলা নাটক—যা শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের পটভূমিতে লেখা। এসব জানা থাকলেও আমাকে বলতে হবে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—অন্য কোন নাটক তা' পারে নি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' ও 'অন্তরাল' হয়তো বিজনের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র আগে লেখা এবং 'দীপশিখা'র অভিনয় দিল্লীতে বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রভাব সৃষ্টির ব্যাপারে দিগিনবাবুর নাটকগুলি সে সুযোগই পায়নি। অপর পক্ষে তিনি যখন গণনাট্য সংঘের দ্বারা ভারত তথা বাংলা বিভাগের সমস্যা নিয়ে 'বাস্তুভিটা' অভিনয় করান তার প্রভাব বাস্তুহারাসমস্যা সম্বলিত পরবর্তী নাটক-গুলিতে পড়ে।

'জবানবন্দী' অভিনয়ের সাফল্য 'নবান্ন' এবং তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমাণ' রচনার উৎসাহ সৃষ্টি করেছে—আর 'নবান্নে'র সাফল্য নাট্যাচার্য, শিশিরকুমার ভাদুড়িকে 'দুঃখীর ইমাণ' প্রযোজনা করতে উৎসাহ দিয়েছিল। তা' ছাড়া বর্তমান যুগের বহু নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্নের' অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কর্মীরা আছেন।

এই সকল ক্রিয়া কর্মের প্রতিক্রিয়াতে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, ক্রান্তি শিল্পীসংঘ প্রভৃতি সে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনয় রায় গানের দল তৈরীর জন্য জেলায় জেলায় ঘুরতেন। ফলে অনেক জেলাতে গান ও নাটকের দল গণনাট্য সংঘ গড়ে। এরই ফলে গানে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সলিল চৌধুরীরা আসেন—সঙ্গে ছিলেন হেমন্ত মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্র এবং জর্জ বিশ্বাস প্রভৃতি। কাজেই ওয়াই, সি, আই, ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের গণনাট্য শাখা এবং জেলায় জেলায় গণনাট্যের শাখা গড়ার মধ্যে—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও গিরীশ ঘোষের বা শিশিরকুমারের দল গড়ার সামান্য মিল থাকতে পারে—কিন্তু অমিলই অনেক বেশী এবং ভিন্ন তাৎপর্য্যে মণ্ডিত। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তৎপরতা সৃষ্ট ভারতের প্রধান রাজনৈতিক-সামাজিক বিকাশের গতি মুখে নব-নাট্য আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে—নৃত্য, গীত ও অভিনয়কে সুনিশ্চিতভাবে সামাজিক বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার

জন্য। সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগ ভারতের শোষিত ও বঞ্চিত জনসাধারণের অবস্থা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উন্নত জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে নতুন ভারত ।ড়ার কাজ যদি শিল্পকলার সাহায্যে অগ্রসর করতে পারে—এই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

সূত্রধার—অক্টোবর ১৯: সাল।

গণনাট্যের ভবিষ্যৎ

ভারতে গণনাট্য আন্দোলন সংস্কৃতির নূতন রূপায়নে এবং সেই দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশের মনযোগ আকর্ষণ করার ব্যাপারে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে—একথা শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য।

কিন্তু দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় সম্মেলনের পর পাঁচ বছর হয়ে গেল—আজ যদি সারা ভারতে এই সংঘের সামগ্রিক কার্যকলাপের হিসাব করা যায় তাহলে এই সংগঠন যে গুরুতর সংকটের মধ্যে পড়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে একথা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে কয়েক জনের আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। দুই একজন যারা কলকাতায় আছেন—তারা শুধু যে এই সংকট স্বীকার করতে চান না—তাই নয়—সংকটের সম্পূর্ণ রূপ সভ্যদের সামনে তুলে ধরে তার সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে পুরানো কায়দায় তা ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। তাদের প্রধান বক্তব্য হ'ল সংগঠন বড় হয়েছে তাই তার সমস্যা হ'ল বৃদ্ধির সমস্যা। অথচ কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে—সর্বভারতীয় কমিটি উঠে গেছে। প্রাদেশিক কমিটিগুলির অবস্থাও তাই। বহু শাখা লোপ পেয়েছে, সামান্য যারা কাজ করছে তারা নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চালিত। কাজেই ১৯৫২-৫৩ সালে যে যুক্তি দিয়ে সমস্ত গণসংগঠন তথা আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বোঝাবার চেষ্টা করা হোত—আজ সে যুক্তি অচল।

আজ একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতে মার্ক্সবাদী আন্দোলনে যে গুরুতর সংকট দেখা গেছে—গণনাট্যেও তার প্রতিফলন হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে পূর্বোক্ত সংকট প্রকাশ পাওয়ার আগেই তা' গণনাট্যে প্রকাশ পায়। দিল্লী গণনাট্য সম্মেলনের পূর্ণ সমালোচনা যখন প্রকাশ হবে—তখন এ কথার সত্যতা সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকবে না।

এ কথা কিছু নূতন নয় যে গণনাট্যের দার্শনিক প্রেরণা ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের প্রয়োগের দ্বারা সূচিত হয় এবং গণনাট্য সংগঠনের বাস্তব ভিত্তি ছিল শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে সঙ্গে বৈপ্লবিক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী

আন্দোলনের যোগাযোগ। এই যোগাযোগ যতই ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে ততই সংস্কৃতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এলাকা থেকে শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের সংগ্রামী চেতনার বাহন হয়েছে। শুধু তাই নয়—বিষয়বস্তু ও পরিবেশনায় ব্যাপক জনজীবনের ছাপ পড়ায়—তার প্রতিক্রিয়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাদারী সংস্কৃতি প্রচেষ্টারও রং বদলাতে সাহায্য করেছে।

এ যুগ ছিল বৃটিশ শাসনের যুগ। রাজনীতিতে যেমন বৃটিশ শাসনের অবসানকে মৌলিক কর্ত্তব্য হিসাবে ধরে মার্ক্সবাদ—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের সঙ্গে সাময়িক সহযোগ করে অগ্রসর হচ্ছিল—অর্থাৎ তখনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি, তেমনি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ও গণনাট্য বা গণসংস্কৃতি আন্দোলন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও বনেদি সংস্কৃতি প্রচেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে না দাঁড়িয়ে নিজেকে তাদেরই মাঝে নূতন ও পৃথক ধারা হিসাবে দাঁড় করতে চেষ্টা করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে যারা বিশ্বাসী তারা এইটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করবে। থিসিসের এন্টি-থিসিস—এমনি করেই সুরু হয়।

বৃটিশ যুগ অবসানের শেষে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন তার আঘাত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের উপর আসে, তেমনি আসে সংস্কৃতি আন্দোলনের উপর। ইতিহাস ভাল করে হিসাব করলে দেখা যাবে—অতিবাম বিচ্যুতি সুরু হওয়ার আগেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সেদিন মার্ক্সবাদকে উচ্ছেদ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। বৃটিশ আমলের শেষ নির্বাচনের সময় কমিউনিষ্টদের উপর দৈহিক আক্রমণ সুরু হয়েছিল।

এ যুগে গণনাট্য সংঘের অফিস লুণ্ঠিত হয়েছে। গুণ্ডাদের ষ্টেনগানের গুলিতে গণনাট্যের কর্ম্মীরা নিহত হয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘ উঠে গেছে এবং গণনাট্যকে নানা নাম নিয়ে জনতার মধ্যে আত্মগোপন করতে হয়েছে। মার্ক্সবাদের অতিবাম বিচ্যুতি সর্বাংশে ক্ষতিকারক—শুধু এই জানাই যথেষ্ট নয়—এটা যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্ররোচনার প্রতিক্রিয়া এটাও বোঝা দরকার। সেদিনের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে শেষ পর্যন্ত নির্ভর করেছিল আজ তা সকলেই জানে।

বছর দুই এই বিচ্যুতির যুগ কাটিয়ে ভারতে মার্ক্সবাদ যখন আবার সুস্থির সংগঠনে মনোনিবেশ করেছে—তখন গণসংস্কৃতি আন্দোলনও আবার মাথা

চাড়া দিয়েছে। এই যুগ ১৯৫২-৫৫ সালের যুগ—যখন নির্বাচনে সারা ভারতে কমিউনিষ্টরা কেন্দ্রে ও প্রদেশে অনেকগুলি আসন দখল করেছে। গুরুতর বিচ্যুতি করেও এমন ফল হল কি করে? প্রথমতঃ রাজনীতে ভুল চাল দিলেও ভারতের মানুষের জন্য প্রাণ দিয়েছে স্বাধীন ভারতে তারাই; দ্বিতীয়তঃ ভারতের সাধারণ মানুষের নিকট বনেদি নেতাদের ও তাদের সংগঠনের কুরূপ ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে বেশ কিছু পরিমাণে। কাজেই নতুন করে কমিউনিষ্টদের এবং তাদের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে।

এই অবস্থার ফলে মার্ক্সবাদী পরিচালিত সমস্ত গণসংগঠনগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সংহত ও বিস্তৃত করা যেতে পারতো—যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীও আভ্যন্তরীণ ঐক্য থাকতো। কিন্তু দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির ফলে যে সকল শীর্ষ-স্থানীয় নেতারা সাধারণ কর্মীদের কাছে মর্যাদা হারিয়ে ছিলেন—তারা সামগ্রিক আত্ম-সমালোচনার পথে সে মর্যাদা ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে উপদল সৃষ্টি করে নিজ নিজ ঘাঁটি আগলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন; ভারতের বৈপ্লাবিক পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠন তৈরী হওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না। এর উপর ষ্টালিনের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক মতবিরোধও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে আজ চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছে। পুরানো নেতারা কর্মীদের বিশ্বাস হারিয়েছেন —নতুনরা বিভ্রান্ত

এখন এই বিশ্লেষণের সঙ্গে যদি গণনাট্যের উত্থান পতন মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না—কেন আজ গণনাট্যসংঘ সংকটে পড়েছে।

গণনাট্যসংঘ কমিউনিষ্ট পার্টি নয়, এটা একটা গণসংগঠন যা গড়ার কাজে কমিউনিষ্টরা প্রথম থেকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগে কমিউনিষ্টরা জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও কাজ করতে পেত। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে উদারনৈতিক বামপন্থী ভাবাপন্ন নেতা ও কংগ্রেসী ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীরা এই সংঘে আসতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নি।

সে যুগে জহরলাল, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ, বিধানচন্দ্র রায়, ভুলাভাই দেশাই ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গণনাট্যের কাজে উৎসাহ দিয়েছেন—সে যুগে ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টের যুগ। সে যুগে কংগ্রেস কোন সংস্কৃতি আন্দোলন করার পরিকল্পনা করেনি বা করতে অসমর্থ ছিল—কারণ এই আন্দোলনের সুদূর প্রসারী প্রভাব তাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাদের রাজনীতি

ছিল—পার্লামেণ্টারী রাজনীতি, মন্ত্রীসভায় আসন গ্রহণ করার রাজনীতি, সমাজের উচ্চশ্রেণীর সমাবেশ করে আপোষে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতি। ব্যাপক গণচেতনার ভিত্তিতে গণবিপ্লব করার রাজনীতিকে তারা ভয় করতো। সুতরাং গণসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কমিউনিষ্টদের মত হৃদয়ঙ্গম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই এই যুগের শেষের দিকে তারা বোম্বাইয়ে ও কলকাতায়—গণনাট্যের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সংগঠন গড়লেও তা' কখনো সাধারণ লোকের কাছে জনপ্রিয় হয় নি। এই সব সংগঠন গড়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইতিমধ্যে যে সকল কংগ্রেসী ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিষ্টদের গড়া লেখকসংঘ বা নাট্য সংঘে এসেছে—তাদের সরে যাওয়ার একটা প্রাথমিক বনিয়াদ করে দেওয়া।

ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে থেকেই কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস ছেড়ে আসতে হয়,—তারপর প্রথম নির্বাচন উপলক্ষে সংঘর্ষও এড়ানো যায় নি। কমিউনিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে সংস্কৃতি কর্মীরাও আক্রান্ত ও প্রহৃত হন একথা সর্বজন বিদিত।

এর পরে কমিউনিষ্টদের বামপন্থী বিচ্যুতির যুগ আসে। এই যুগে কংগ্রেস শাসকদের যে উগ্ররূপ প্রকাশ পায় তার ফলে তখনি কংগ্রেস থেকে সংস্কৃতি আন্দোলন গড়া সম্ভব ছিল না, কারণ সমস্ত নাম করা সংস্কৃতি কর্মীরা তখনো কংগ্রেসী জেলে। সেই অবস্থায় দালালদের দিয়ে সংগঠন গড়া কঠিন ছিল।

তাই প্রতিক্রিয়া এই সময় ভিন্ন কৌশলে কাজ করে। সারা ভারতে এই সময় মার্কিন সাহায্য পুষ্ট কতগুলি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—যারা 'এশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা', 'কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম' প্রভৃতি নাম দিয়ে সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশনী প্রভৃতি রাতারাতি সৃষ্টি করে এবং 'রাম স্বরূপ' ও 'সীতারাম গোয়েল' নামে দুই ভদ্রলোক এই কাজে বিশেষ ভাবে তৎপর হন। ১৯৫০-৫২ সালের ষ্টেট্সম্যান পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগ অনুসন্ধান করলে তা' জানা যাবে। বাংলাদেশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আসামের বিনোদবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে এই সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। বিলাতের কোয়েসলার প্রভৃতির কমিউনিষ্ট বিরোধীদের লেখার সঙ্গে এঁদের রচনাও যুক্ত হতে থাকে। বোম্বাইয়ে একটি সম্মেলনও হয়ে যায়। বাংলা থেকে একমাত্র বুদ্ধদেব বসু গিয়েছিলেন।

ঠিক এই যুগে কমিউনিষ্টদের কালচারাল ফ্রণ্টেও শিল্প-কলার স্বাধীনতা নিয়ে এবং আন্দোলন থেকে শিল্পকলাকে পৃথক করার দাবী নিয়ে প্রবল মতবিরোধ চলছিল। অর্থাৎ বাইরে যেমন প্রতিক্রিয়ার শক্তি কমিউনিষ্ট আদর্শ ও

কমিউনিষ্ট দেশগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিল—তেমনি ভিতরেও (পার্টির) শিল্পকলা সৃষ্টি ও সংগঠনে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার অভিযান চলেছিল।

অবশ্য বামপন্থী বিচ্যুতি—গণসংগঠনগুলিকে পার্টিসংগঠনে পরিণত করেছিল—তার প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ ঝোঁক দেখা দিতে পারে। কিন্তু কোন কমিউনিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী শিল্পকলাক্ষেত্রে এই ধরণের নৈরাজ্যবাদকে কি করে মেনে নিতে পারে? ঐ সময় আরো একটি কথা প্রায় শোনা যেত যে ভারতের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত সুতরাং তাদের জন্য নূতন সাহিত্য রচনার বাস্তব ভিত্তি কোথায়? অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে শ্রমিক-কৃষকের জন্য যে সংস্কৃতি প্রচেষ্টা ও যোগাযোগ করার নূতন ধরণের চেষ্টা হয়েছিল—তা' এই ভাবে বাতিল করার আন্দোলন সুরু হ'ল। সাম্যবাদকে অপদস্থ করতে—এককালে কমিউনিষ্ট ঘেষা সংস্কৃতিবান লোকদের দিয়ে বিদেশে পার্টির বাইরে যে চেষ্টা মার্কিন ঘেঁষা গোষ্ঠীরা করছিল—কার্য্যতঃ ভারতের পার্টির ভিতরেও সেই চেষ্টা সুকৌশলে করা হ'তে লাগলো। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিপন্ন করা অবশ্য কঠিন – কিন্তু আদর্শগত মিল বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

শীর্ষস্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতারা এই আভ্যন্তরীণ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' আন্দোলনের কাছে মাথা নত করলেন। গণনাট্যের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাছে অজয় ঘোষ ১৯৫২-৫৩ সালে নির্দ্দেশ দিলেন 'যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়—তাই গণনাট্য করতে পারে'। আর সংগঠনের প্রধান দায়িত্বে নাম করা পেশাদার নাট্যকার, ফিল্‌ম পরিচালক, অভিনেতা প্রভৃতি বসানো হ'ল—উদার নৈতিক বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও সংগঠন পদ্ধতির কাছে—আবার আত্ম-সমর্পণ সুরু হ'ল।

সন-তারিখ মিলিয়ে যদি কেউ দেখেন—তাহলে দেখে আশ্চর্য্য হবেন—বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ কর্তৃক ভারত পরিদর্শনের পর – মার্কিন ঘেঁষা চেষ্টাগুলি অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়। 'এশিয়া' কাগজ এই সময় উঠে যায়। লোকে অবশ্য বলাবলি করেছিল যে ভারতে সোভিয়েত নেতাদের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দেখে মার্কিনরা পূর্ব্বোক্ত ধরণের কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারের অসারতা উপলব্ধি করে পূর্ব্বোক্ত চেষ্টাগুলি বন্ধ করে দেয় এবং নূতন কায়দায় যোগাযোগ সুরু করে।

কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস সরকারও নিজস্ব সংস্কৃতি চেষ্টা সুরু করে দিয়েছে—, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সঙ্গীত নাটক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে। ঠিক দশবছর আগে অর্থাৎ ১৩৬১ সালের (১৯৫৪) 'পরিচয়' কাগজের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই প্রবন্ধে আমি জানিয়েছিলাম যে একাডেমি বাহ্যতঃ বে-সরকারী লোকদের দ্বারা গঠিত হ'লেও আর্থিক দিক থেকে রাষ্ট্রপতির ফাণ্ডের উপর নির্ভর করবে এবং কেন্দ্রীয়ও প্রাদেশিক সরকার এর পরিচালনার দায়িত্বে রাখবেন। যে সকল সংগঠন এই একাডেমিব সদস্য-সংস্থা হবে—তাদের যোগ্যতা প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনার অধীন অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের ভাল রিপোর্ট তাদের পক্ষে চাই। যে সকল জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল—যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ বা পশ্চিম বাংলায় একাডেমির কোন রাজ্যশাখা হয় নি; যে সকল জায়গায় আঞ্চলিক শাখা হয়েছিল যথা বিহার, হায়দ্রাবাদ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও আসাম—তাদের অন্যতম আসাম শাখা সম্পর্কে আমি মন্তব্য করেছিলাম: "মণিপুবনাচেব কলেজেব প্রতিষ্ঠা থেকে এর কারণ খানিকটা অনুমান করা যায়। সেখানকার চীফ কমিশনার একটি অ্যাডহক নির্বাচন কমিটি গঠন কবে কংগ্রেসেব টাই দ্বিজমণি শর্মাকে উক্ত কলেজেব অধ্যক্ষ করেছেন। অথচ এই ভদ্রলোক নাচের কিছুই জানেন না (ইউনিটি জুলাই '৫৪)। মণিপুরের শ্রেষ্ঠনর্তক আমুদুনশর্মাকে এই কলেজে নেওয়া হয়নি—মণিপুরের উপজাতীয় নৃত্যের বিশিষ্ট অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষকই গানেব এবং মণিপুবের নিজস্ব সঙ্গীত বাদ দিয়ে মণিপুরের অপরিচিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষাব জন্য জবরদস্ত ওস্তাদ রাখা হয়েছে। তা' ছাড়া উক্ত কলেজের মাহিনা এত বেশী যে মণিপুরের লোকেরা সেই পয়সা দিয়ে এই কলেজে ঢুকতে পারবে না। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। অথচ ইম্ফলের তিনটি থিয়েটার আজ মবণাপন্ন।"

একডেমির নাম করে ঠিক এই ধরণের ঘটনা বাংলা বা দক্ষিণ ভারতে করা কষ্টকর ছিল। বাংলাতে বিধানচন্দ্র রায়ের কয়েকটি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে আমি উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম যে ডাঃ রায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের পরিবর্তে জাতীয় সংস্কৃতি সংঘ কবে যখন দেখলেন যে কাজ হ'ল না—তখন পশ্চিমবাংলায় একাডেমি গড়ার ষ্টীয়ারিং কমিটিকে (যাতে গণনাট্যের

প্রতিনিধিকে তৎকালীন সম্পাদিকা নির্মলা যোশী নিয়ে ছিলেন) অগ্রাহ্য করে ফোকএণ্টারটেনমেণ্ট শাখা সোজা সরকারী তত্ত্বাবধানে তৈরী করলেন। আমি মন্তব্য করেছিলাম বিধানবাবুর ক্রিয়াকলাপ দেখে সহজেই বোঝা যায়— সরকারী সংস্কৃতি প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য কি। কেন্দ্রীয় কর্তারা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পুরাতনের উদ্ধার প্রভৃতি গালভরা কথা বলেন, বিধানবাবুকে কেউ ঐ সব দোষে দোষী করতে পারবেন না। কোদালকে কোদাল বলাই তাঁর অভ্যাস। বিধানবাবু নিশ্চই জানেন বাংলা দেশে সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রসার করতে হলে নাটকের উপর থেকে সেন্সার তুলতে হবে, প্রমোদকরের অবসান ঘটাতে হবে, এবং অনুষ্ঠানের জন্য অনেক থিয়েটার হল গড়ে দিতে হবে। কৃষকদের যাত্রা, ভাসান ও কবিগানে উৎসাহিত করতে হ'লে কৃষকদের জমি পাওয়ার আন্দোলনে সাহায্য করতে হবে……কিন্তু একাডেমির কর্তারা বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন না।" সরকারী সংস্কৃতি নীতি আসলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমর্থক যোগাড় করার নীতি—এই মন্তব্য করে আমি বলেছিলাম—খেতাব, অর্থশালআলোয়ান শিল্পীদের দিয়ে কংগ্রেস কোন নূতন কাজ করছে না এবং এই সব দিয়ে শিল্পীর জীবিকা অর্জনের সুবিধা, সাহায্য, নিরাপত্তা বা গণশিল্প প্রসারের কাজও হবে না। এমনি ধরণের মামুলি উৎসাহ রাজা জমিদাররাও দিত—যার ফলে শিল্পীরা ব্যক্তিসর্বস্ববাদী, জনগণ থেকে পৃথক ও ফর্মসর্বস্ব হয়ে শিল্পকলাকে সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশ ও উন্নতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। একাডেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন: "অসুন্দরকে সুন্দর করাই শিল্পকলার ধর্ম! কলা-নৈপুণ্যে কুৎসিত ও সুন্দর হয়ে ওঠে।" শিল্পের এই অপূর্ব সংজ্ঞা তিনি কোথায় পেলেন—এই প্রশ্ন তুলে আমি প্রবন্ধের শেষ লাইনে লিখেছিলাম—সত্যসত্যই যদি কংগ্রেসী শাসনের কুৎসিত রূপকে সুন্দর করাই একাডেমির উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে —তবে ঈশ্বর রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করুণ!

যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি এই সকল মন্তব্য করেছিলাম—ভারতের প্রগতিশীল আন্দোলনে তখনো এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিমাণে বজায় ছিল তারপর সোভিয়েত রুশিয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সুরু হ'ল—বিশ্ববিপ্লব, যুদ্ধ-শান্তি, ধনতান্ত্রিক অবস্থার ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে এমন সব মতবাদ প্রকাশিত হতে থাকলো—যার ফলে কেবল কমিউনিষ্টদের মধ্যে নয়—সহৃদয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও গভীর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হ'ল। মতাদর্শের এই বিভ্রান্তি

দৈনন্দিন জীবনের কাজেও প্রতিফলিত হয়—এবং দ্রুত প্রকাশ পায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রথমেই। বিপ্লব যদি দূরবর্ত্তী হয়ে যায়, সমাজ পরিবর্তনের কাজ যদি ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতেই করতে হয়—তাহলে বিপ্লবীদের পুরানো পন্থায় জীবন যাপনের কোন অর্থ থাকে না। সময়ের হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে—পার্টির ডাক্তার, অধ্যাপক, সংস্কৃতিকর্ম্মীরাই এই যুগেই আবার নতুন করে পেশাদারী জীবন গঠনের দিকে মনযোগ দিলেন—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিপুল অর্থের কোন কোন অংশ যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে টেনে এনে কিছু 'জনসেবা' করা যায়—এমন ধারণা নিয়েও অনেকে কাজ করার সার্থকতা প্রমাণ কবতে চেষ্টা করলেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে যেমন যন্ত্রশিল্পের বনিয়াদ তৈরী হচ্ছিল —তেমনি হয়েছিল কংগ্রেসী শাসনের সমর্থক শ্রেণী তৈরী করা অর্থনৈতিক বনিয়াদ। আজ একথা প্রশান্ত মহলানবীশ কমিটিকে স্বীকার করতে হয়েছে যে এই পরিকল্পনার সুফল ভারতের অধিকাংশ গ্রামবাসী পায় নি—। সম্পদের অধিকাংশই অল্পলোকের হাতে জমা হয়েছে,—মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধনী আরো ধনী হয়েছে এবং গরীব হয়েছে আরো গরীব।

ভারতের জনসংখ্যার সর্ববৃহৎ অংশ যে কৃষক তাদের অধিকাংশই এই পরিকল্পনা থেকে আজো পর্যন্ত কোন উপকার পায় নি।

কিন্তু মার্ক্সবাদী মহলের বেশ প্রভাবশালী অংশ গত দশ বছরের এই ধারণা মেনে নিতে পারে নি। কংগ্রেসী শাসনে দেশের উন্নতি কি পরিমাণে হচ্ছে—এই নিয়ে তারা তর্কাতর্কি করেছে এবং বাম ও দক্ষিণপন্থী মার্ক্সবাদীরা উভয়েই কেরালার কমিউনিষ্ট মন্ত্রীসভার দৃষ্টান্তকে পঃ বাংলা ও ভারতের অন্যত্র বিস্তার করার স্বপ্ন দেখেছে। বিরোধীশ্রেণীর শক্তি ও তার কৌশল সম্পর্কে একটি মার্ক্সবাদী-দলের এই রূপ অসতর্কতায় কোন উদাহরণ আছে কিনা জানিনা।

এই যুগে একাডেমিকে জনপ্রিয় করার জন্য ফিল্ম সেমিনার, নাটক সেমিনার প্রভৃতি ডেকে ভারতের শিল্পকলা রসিকদের কংগ্রেসের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। তেমনি স্বাধীনতা দিবসে সারা ভারত থেকে লোককলার শিল্পী সংগ্রহ, দিল্লীতে ছাত্র ও যুবদের দিয়ে সংস্কৃতি প্রতি-যোগিতা প্রভৃতি করার সরকারী চেষ্টা প্রবলতর হতে থাকে। বাংলা দেশে এই যুগে 'বঙ্গসংস্কৃতির' নামে ছদ্ম কংগ্রেসী প্রচেষ্টা প্রবল হতে থাকে। একাডেমি কর্তৃক আহুত নাটক সেমিনার নাট্য আন্দোলনের বাধা বিপত্তি গুলি তুলে

দিতে সুপারিশ করেছিল—কিন্তু সরকার তা আজো তোলেনি—এমনি সে সেমিনারের ফল !

অথচ সেই একাডেমিতে গণনাট্যকে যুক্ত করার জন্য আমরা উঠে পড়ে লাগলাম—এবং দিল্লী সম্মেলনে সফলও হ'লাম। গণনাট্য আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থাসৃষ্টির নিশ্চিত পথ এমনি করে তৈরী হ'ল।

এই সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা আমি একক ভাবে চালিয়েছিলাম—তার মারফতে সারা ভারতে সংস্কৃতি কর্মীদের নেতৃত্বস্থানীয় যারা ষ্টীয়ারিং কমিটিতে ছিলেন তাদের চেতনার কিছু হিসাব করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সংস্কৃতি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য কি,—পেশাদারী শিল্পকলা সৃষ্টি কি ভাবে সেই ঐতিহ্য বহন করছে—ফিল্‌ম প্রভৃতি মারফতে কি ভাবে প্রমোদমূলক সংস্কৃতি পরিবেশন করছে যার ফলে জনসাধারণের সংগ্রামীচেতনা স্তিমিত হয় এবং শিল্পকলার পৃষ্টপোষকতায় সরকারী নীতির দুর্বলতা প্রভৃতি নিয়ে তুমুল আলোচনা এই ষ্টীয়ারিং কমিটিতে হয়—এবং আমার মন্তব্যকে কেবল বিভক্ত বাংলা, রেফিউজি অধ্যুষিত বাংলার বিশেষ সমস্যা বলে অনেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কারণ কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস শাসনে নাকি 'দুধ ও মধুর' ছড়াছড়ি হচ্ছিল। আর তখনও তো কেরালায় কমিউনিষ্ট রাজত্ব চলছে। আরো কেরালার স্বপ্ন দেখার অধিকার নিশ্চয় থাকবে! তাই ষ্টীয়ারিং কমিটির কনভেনার হয়েও যখন পদত্যাগ পত্র দাখিল করে চলে এলাম তখন অনেকে বিস্মিত হয়েছিলেন, অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং যারা আমার বিদায়কে 'আপদ গেল' মনে করেছিলেন—তারা সারা ভারতের গণনাট্যকর্মীদের কাছে আমার একগুঁয়েমির জন্য নিন্দাবাদ করে বেড়িয়েছিলেন। তখন অবশ্য রুশ-চীন বিরোধ সুরু হয়নি তাই রক্ষে। তাতে কিন্তু গণসংস্কৃতি আন্দোলন রক্ষে করা গেল না! আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। কিন্তু এত বড় একটা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন ও সর্ব ভারতে পরিচিত সংস্কৃতি আন্দোলনকে রক্ষা করতে পারলো না!

পারা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কারণ দেখা গেল যে আজ সে নিজেকেই রক্ষা করতে পারেনি। এই সময় কমিউনিষ্ট নেতা ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি বলেন যে তাঁরা শ্রমিক-কৃষক ফ্রন্টেও ঐক্য রক্ষা করতে হিম সিম খেয়ে গেলেন! কোনটা ঠিক মার্কসবাদ আর কোনটি বেঠিক তা' নিয়ে আন্তর্জাতিক তর্কে মাথা না গলিয়ে একথা বলা যায় কিনা যে, (১) আমরা ফ্রন্ট ও

পার্টি এক না করেও চলতে পারতাম ; (২) আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলন মূলতঃ শ্রমিক-কৃষক ও বিপ্লবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামশীল চেতনার ভিত্তিতে গড়া আন্দোলন। এই ভিত্তিতে ফ্রন্টে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখতে পারতাম ; (৩) যা কিছু শ্রমিক-কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের বাঁচবার সংগ্রামকে শিল্পকলায় প্রতিফলিত করে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর কৌশলের মুখোস খুলে দেয় এবং উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করে তাই শিল্পকলার বিষয়বস্তু করতে নিরন্তর চেষ্টা চালাতে পারতাম ; (৪) প্রধান প্রধান শহরে নিছক পেশাদারী অল্পসংখ্যক অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট না থেকে সহজ প্রয়োগ কৌশলের সাহায্য যেখানে গণআন্দোলন হচ্ছে সেইখানেই অনুষ্ঠান করতে পারতাম ; (৫) কৃষক এলাকায় লোকশিল্পীদের প্রতি বিশেষ মনযোগ রেখে তাদের সহযোগিতায় এবং কৃষক সন্তানদের নিয়ে পৃথক স্কোয়াড গঠন করে প্রচলিত লোক কলার আঙ্গিকগুলিকে নতুন ধরণের বিষয়বস্তু দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারতাম।

এ সব করতে হ'লে—তথাকথিত শিল্পীর স্বাধীনতার নামে উচ্চ মধ্যবিত্তের আড্ডা না জমিয়ে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে শিল্পীদের যেতে হ'ত ও সাংগঠনিক যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করতে হোত। গ্রামে ও শহরে সংস্কৃতি আন্দোলনের পৃথক ধরণের সংগঠনের ব্যবস্থা রেখেও তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের নতুন ধরণের ব্যবস্থা করতে হোত। সর্বোপরি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার যেমন পরিকল্পনা করা দরকার—তেমনি তার সহকারী রূপে সংস্কৃতি আন্দোলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার দায়িত্ব মার্কসবাদীদের রয়েছে। গণসংস্কৃতি ও গণআন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একে অপরকে পুষ্ট করে। শ্রমিকশ্রেণী তার মিত্র ছাড়া চলতে গেলে নিঃসঙ্গ হবে, তেমনি মিত্র ও ভারতের মৌলিক পরিবর্তনকারী শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হলে শূন্য গর্ভ এবং নিস্ফল হবে ও শেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা আশ্রয় করতে বাধ্য হবে, শুধু টিঁকে থাকার যুক্তিতে যেমন আজ অনেকে যা করছে।

জনান্তিক, শারদীয়া ১৩৬৪ সাল।

গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য

ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলনের স্থান সুনির্দিষ্ট। বর্তমানে দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও নাট্যকলা, নৃত্য ও লোকসঙ্গীতের উপর ২৫ বছর ধরে এই আন্দোলন যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে তার কেবল বিগত ইতিহাস নয়—সেই ইতিহাস থেকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যে সূত্র পাওয়া যায়—তা সকল সংস্কৃতি কর্মীর পক্ষে অবশ্য বিবেচ্য।

গত একশো বছরের সংস্কৃতি আন্দোলন ভারতীয় সমাজের প্রগতি ও বিকাশের মৌলিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারায় এসে যুক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন যতই প্রবল হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ততই মুখর ও শক্তিশালী হয়েছে। ২৫ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চরম পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তখন স্বাধীনতাকামী শ্রেণী, ধনিক-বণিক, শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার রূপ ও তার প্রয়োগ নিয়ে পরস্পর বিরোধী ধারণা ও কর্ম কৌশলের সংঘাত সুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতেই কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক সংগ্রাম সুরু করতে চায়নি তার কারণ এখানে খুঁজতে হবে।

শ্রমিক-কৃষকরা স্বাধীনতা বলতে কি চায় তা' তাদের শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন-গুলি এবং কমিউনিষ্ট ও সোশালিষ্ট দলগুলির মারফৎ ঘোষণা করেছিল। তেমনি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ—যারা শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জন-সাধারণের ঐক্যের মধ্যে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা ধরতে পারছিলেন, তারাও নিজ নিজ সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সহযোগিতা জ্ঞাপন করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের তাৎপর্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন।

গণনাট্য আন্দোলন এই চেষ্টার ফল অর্থাৎ সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবীর এক বিশেষ অংশের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সচেতন অগ্রণী অংশের সহযোগিতার ফল।

সাম্যবাদ শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের এমন ধরণের জীবন দর্শন যা দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম। কাজেই ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনে সাম্যবাদী বিচার বিবেচনা ও অনুশীলন এই আন্দোলনকে সর্বপ্রথম ভারতের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দিল। বৃটিশ শাসিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতে আত্মবিকাশে তৎপর ভারতীয় ধনিকতন্ত্র সংস্কৃতিকে কেবল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল —ভারতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন তাকে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশে সচেতন ভাবে বিস্তার করে এ যাবৎকাল যতকিছু সংস্কৃতি আন্দোলন হয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক গুণসম্পন্ন সংস্কৃতি আন্দোলন সৃষ্টি করল। এই সংস্কৃতির কাঠামো জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর হলেও বিষয়বস্তু হল সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট; সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের প্রমোদের বিষয়বস্তু না হয়ে এই সংস্কৃতি হ'ল সমাজের বৃহত্তম শ্রেণীর সামাজিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির হাতিয়ার; ভারতের সংস্কৃতির যা কিছু মহান ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়েছে এই সংস্কৃতি তার থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজের বিরাট অংশের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়ে এই সংস্কৃতি আন্দোলন ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনে এক নতুন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সম্পদশালী ভাব প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে।

কাজেই সাম্যবাদী আন্দোলন গণনাট্য আন্দোলন সৃষ্টি করেছে একথা বলতে প্রকৃত গণতন্ত্রী হিসাবে কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের যুগে কোন কোন প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতা এই আন্দোলনের মঞ্চে এসেছেন বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন বলেই যে এ আন্দোলন এককালে ব্যাপকতা পেয়েছিল এবং এখন তারা আসছেন না বলে আন্দোলন সংকীর্ণ হয়ে গেছে এই যুক্তি বিচারসহ নয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী আন্দোলন বিস্তারের কায়দা ছিল পৃথক পৃথক শ্রেণীগত সংগঠনগুলি তৈরী করা। কমিউনিষ্টরা এই সকল শ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন গড়লেও এগুলি ঠিক কমিউনিষ্ট পার্টি'র শাখা নয়। নিজ নিজ শ্রেণীর সমস্যাগুলির আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করে গণতান্ত্রিক কায়দায় এই সংগঠনগুলি চালানো এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই ধরণের কাজ করে পার্টি'র বাইরেকার জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট

করার নিরন্তর চেষ্টা করা এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে—এই হচ্ছে সাংগঠনিক নীতি।

ট্রেডইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি সব গণ-সংগঠনগুলি এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত। আর গণনাট্য শুধু এই ভিত্তিতে নয়—যেহেতু এ আন্দোলন সংস্কৃতি আন্দোলন তাই এর প্রথম সর্বভারতীয় কমিটিতে শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে ছিলেন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল ভারত কৃষকসভা, ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রগতি লেখকসংঘের সভাপতি ও সম্পাদকেরা। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা নাট্যকার মামা ওয়ারেরকার, বাংলার নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সাংবাদিক খাজা আহমদ আব্বাস সে যুগে ভাসা ভাসা ভাবে হলেও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

গণনাট্য আন্দোলন গড়ার প্রথম যুগে এই আদর্শগত ও সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়—তার প্রথম সর্বভারতীয় বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায়। এটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং 'ঐতিহাসিক পটভূমিকা' নামক প্রথম প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচিত হয়। এই প্রবন্ধের সমস্ত অংশ তুলে দিতে পারলে পাঠকদের পক্ষে, বিশেষকরে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অলোচনা করতে চান তাদের সুবিধা হ'ত। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য আমি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করছি।

প্রথমে আমাদের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বর্তমানে তার অধোগতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে ঃ

The social matrix in which our classic culture had risen to splendour had gone by, never to return. New methods of production, new social relationships and patterns, new social conflicts and problems have emerged conditioning and transforming life···since breakdown of feudalism, we are to-day in the throes of an ever more revolutionary transformation and that art or literature which does not potray the deepest human emotion and aspirations of this epoch cannot have any life or significance for the people.

এই সত্য বুঝতে না পারায় গত শতাব্দীতে অনেক শিল্পকর্ম অসার্থক হয়েছে এই ধরণের কথা বলে বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার, সমাজবিপ্লব এবং

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা, তার বিরুদ্ধে সোশালিষ্টশক্তি সহ শ্রমিকশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যে গণঅভ্যুদয় হয় —উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ফলে সে যুগের শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়। কিন্তু এর রূপ সীমাবদ্ধ ছিল।

The realism of these writings was, however, of a limited character as the writers who were mainly from the upper and middle classes look at the problems of India from only their own class point of view. The conditions and aspirations of vast masses did not find expression in these writings except in romantic and sentimental manner : The dramatic stage was not materially affected by even this limited realism···Most of these dramas written in this epoch including some of those from Tagore's pen, tended to be abstract and symbolical or they dealt with the united class.

আবার অনেকে মধ্যবিত্ত প্রেমের আতিশয্য নিয়ে নাটক লিখেছেন। যারা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—সেই সব শিল্পীরা—sought to resurrect the glory of these arts around themes, which since long had ceased to be of any great significance in the lives of the people···attitude was of romantic revivalism—tales from mythology or idyllic scenes from idealised peasant life. They had no clear conception or understanding of the significance of the forces which were revolutionising society and to them the poignant details of the present could not become a suitable material for artistic expression.

এরপর বলা হয়েছে যে তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিছু কিছু শিল্পীর এই বোধ এসেছে যে Art and literature can have a future only if they become the authentic expressions and inspiration for people's struggles for freedom and culture.

রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ এই চেতনায় কি ভাবে প্রগতিলেখক সংঘে এলেন—

উদয় শংকরের মত নৃত্যশিল্পী কেন 'রিদম অব লাইফ' বা 'লেবার ও ম্যাসিনারী' ব্যালে রচনা করলেন তার একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে: নাটকের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে: শ্রমিক ও কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করে এবং জাতীয় ফ্রণ্টে সংগ্রামী শ্রেণীশক্তি হিসাবে তাদের উদয়কে স্বাগত জানিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে। এই ভাবে মধ্যবিত্তের প্রতীকধর্মী প্রেম জরজর নাটকের পরিবর্তে একটি নূতন ধরণের নাট্য আন্দোলন সুরু হচ্ছে। অবশ্য এই সব আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এখনো সংগঠিত শ্রমিক—কৃষক আন্দোলনের যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। কিছু কিছু ছাত্রদল বিখ্যাত চীন গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শ অনুসরণ করে গ্রামে গ্রামে প্রগতিশীল নাটিকা অভিনয় করে জনসাধারণকে সচেতন ও সংগ্রামী করেছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লোককবি ও শ্রমিক গীতিকার তাদের আশা আকাঙ্খা সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করছে এবং জাতীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের গান গাইছে।

১৯৪৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের পাশে গণনাট্য সম্মেলনে অন্ধ্র, মালাবার ও বাংলার লোক-গীতি এবং শ্রমিকদের অনুষ্ঠানগুলি উল্লেখ করে শেষ প্যারায় বলা হয়েছে—জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় নিজস্ব এক নতুন নাট্য আন্দোলন সুরু করেছে। It is in this situation that the Indian Peoples Theatre Association has been formed to co-ordinate and strengthen all progressive tendencies that have so far manifested themselves in the nature of dramas, songs and dances…It is a movement which seeks to make of our arts, the expression and the organiser of our people's struggles for freedom, economic justice and democratic culture…It stands for the defence of culture against imerialism and fascism and for enlightening the masses about the causes and solution of problems facing them. It tries to quicken their awareness of unity and their passion for better and just world order. [সম্পূর্ণ বিবৃতি লেখকের মার্ক্সিষ্ট কালচারাল মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া পুস্তকে আছে।]

গণনাট্যের—এই 'ঐতিহাসিক পটভূমিকা' পড়লে বেশ বোঝা যায় যে এটি কেবল মার্কসবাদী নয়—১৯৪৩ সালের কমিউনিষ্টপার্টি চেতনায় এটি রচিত।

তাই সংস্কৃতি বিচার এবং সংগঠনের কৌশল নির্ণয়ের ব্যাপারে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও লেখক-শিল্পীকে এক সূত্রে বেঁধে দেবার ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে এই পটভূমিকায়। প্রথম যে প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়—তাতে বলা হয়েছে যে নৃত্যকলা, গীত ও নাটকের বিষয়বস্তুকে নূতন ধারণার বাহন করলেই চলবে না—তাদের প্রয়োগকৌশল—টেক্‌নিক্ এমন সরল ও প্রত্যক্ষ করতে হবে যা জনসাধারণ সহজে বুঝে নিজেরাই করতে পারে। সমবেত সঙ্গীত ও মুক্তাঙ্গনে অভিনয় করার উপর এই প্রস্তাবে বিশেষ নির্দ্দেশে দেওয়া হয়।

প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই প্রদেশে প্রদেশে এই ধরণের কাজ করা হয়েছে প্রায় বছর দুই ধরে। ক'লকাতার ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের গানের দলের নেতৃত্বে ট্রেডইউনিয়ন কর্মী বিনয় রায় বা নাটকের দলে আমার যোগদানকে সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে। তেমনি মফস্বল জেলাগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে নিবারণ পণ্ডিত ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত কমিউনিষ্ট কবি ও গীতিকার প্রভৃতির সাহায্যে লোকসঙ্গীত ও লোককলার নবরূপায়ণে নিযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় কৃষক ও ছাত্রকর্মীদের সাহায্যে দল গড়ে উঠতে থাকে।

কমিউনিষ্ট পার্টি এই কাজে মূল দায়িত্ব নিলেও সংগঠনগুলি পার্টি সংগঠন ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা প্রভৃতির মত এখানে পার্টি সংগঠক বাইরের জনসাধারণকে নিয়ে কতগুলি সর্ববাদীসম্মত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কায়দায় সংগঠন পরিচালনা করতেন। যে সব নাম করা লেখক বা শিল্পী আসতেন তারা নিজেদের রচনা নিয়ে আসতেন না। প্রথমে পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক শিল্পীদের রচনা নিয়ে আমাদের কাজ সুরু হয়েছে। তাদের লেখা গান ও নাটকই প্রথমে নামকরা নাট্যকার ও অভিনেতা, গীতিকার ও সুরকারদের প্রশংসা অর্জন করেছে। অবশ্য তারা দেখার আগে আমরা মাঠে ময়দানে জনসাধারণের কাছে অনেক অনুষ্ঠান করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আত্মপ্রত্যয় পেয়েছি।

এই সব ঘটনার তাৎপর্য্য আজ অনুধাবন করা দরকার। এ হচ্ছে নতুন ভাবাদর্শের প্রাথমিক বিজয়। আমরা যদি সে সময় 'টিপু সুলতান' বা 'আলমগীর' অভিনয় করতাম তাহলে কি গণনাট্য হ'ত, না পেশাদার মঞ্চ যে

শম্ভুবাবুকে পাত্তা দেয় নি তিনি নাম করতে পারতেন? সুরকার হিসাবে বিনয় রায় বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এমন কোন বিশেষ শিক্ষা ছিল না যা শচীনদেব বর্মন বা পঙ্কজকুমার মল্লিককে প্রভাবান্বিত করতে পারে। আর পানু পালের 'মহামারী নৃত্য' পরিকল্পনার তো কথাই নেই—একটি মাদল আর নৃত্য সম্পর্কে প্রাথমিকজ্ঞানবর্জিত রেবা, উষা বা তৃপ্তিকে নিয়ে তিনি মহামারীর যে ভয়াবহতা মঞ্চে সৃষ্টি করতেন তা' উদয় শংকরের মত শিল্পীকে মুগ্ধ করেছিল। সে কালের অখ্যাত, অজ্ঞাত ও সামান্য লোক নিয়ে নতুন ভাবাদর্শ যে অসামান্য শিল্পরস সৃষ্টি করল তাতে জনসাধারণ যেমন মুগ্ধ হ'ল প্রতিক্রিয়াও তেমনি সরব হয়ে উঠল। প্রথমে 'আর্ট রসাতলে গেল' বলে 'শনিবারের চিঠি'তে কোলাহল সুরু হ'ল, তারপর কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হ'ল—সংস্কৃতিক্ষেত্রে কমিউনিষ্টদের বিরোধিতা করার জন্য। প্রথমে সমালোচকরা বল্লে যে দল বেঁধে কি করে সাহিত্য ও শিল্প করা যায় তা তারা জানে না—তারপর বল্লে এ সব শিল্পকলাই নয় কেবল প্রচার। কিন্তু দেখা গেল অবিলম্বে তারা দল বাঁধলো এবং সেই দলের মারফতে তারা কংগ্রেসের প্রচার শুরু করেদিল। 'বিপ্লব প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত করে'—এই উক্তির তাৎপর্য্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গণনাট্য আন্দোলন সেইদিনই বুঝতে পেরেছিল।

কিন্তু তখনও কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা পায় নি—এবং তাদের কর্মীরা আমাদের মত জনসাধারণের নীচের তলায় যেতে পারতো না। অপর পক্ষে আমাদের শ্রমিক-কৃষক নেতারা আমাদের কাছে এসে দেশের অবস্থার কথা, বিভিন্ন দলের মূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্লোগানগুলির ব্যাখ্যা দিতেন এবং শহরের মধ্যবিত্ত তরুণ শিল্পীদের গ্রামে বা শ্রমিক অঞ্চলে অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে যেতেন। শম্ভু মিত্র মশায় নিবারণ পণ্ডিতের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, আর শম্ভু বাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে নিবারণ রচনার নূতন ইঙ্গিত পেয়েছেন নিজ চেতনার ভিত্তিতে। এমনি করে মালদহের বিশু পণ্ডিত, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, মুর্শিদাবাদের গোমানী প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক শিল্পচেতনায় উন্নত হয়েছেন। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য এইভাবে সংস্কৃতিক্ষেত্রে হয়েছে এবং বুদ্ধিজীবীর সমাজতন্ত্রবাদী সংস্কৃতি প্রচেষ্টা এইভাবে জনতার সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়ার উদ্যোগ করেছে।

প্রধান সহরে বা জেলার মধ্যবিত্ত অঞ্চলে যে সব অনুষ্ঠান হ'ত সেখানে দর্শকরা কেউ নিশ্চয় শিশিরকুমার বা শচীনদেব বর্মণের রস সৃষ্টি উপভোগের আশা

করেননি। কিন্তু তারা আমাদের জনসমাবেশগুলিতে আসতেন নূতন দিনের নূতন কথা শুনতে—তাই আমাদের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে তারই প্রতিধ্বনি শুনে মনে মনে তারা যে তুলনা একেবারেই করতেন না এমন কথা হতে পারে না—তবু তারা নূতনের স্বাদ পেয়ে যেতেন—সে স্বাদ সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সৃষ্ট সংস্কৃতির প্রথম স্বাদ। এ যুগে আমরা আর্থিক সাফল্যের কথা বা কোন প্রতিভাবান শিল্পীর বিকাশের সুযোগের কথা হিসাব করিনি। সর্বত্যাগী শ্রমিক, কৃষক ও দেশ সেবক কর্মীদের মত সর্বত্যাগী সংস্কৃতি কর্মীর দল গড়ার চিন্তায় আমরা ব্যাপৃত ছিলাম। প্রথমদিকে যারা সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন—তারা পার্টি হোলটাইমারের বেতন পেতেন—আর বাকী সব 'ঘরের খেয়ে পরের মোষ' তাড়াতেন, কিন্তু তার জন্য তাদের কোন ক্ষোভ ছিল বলে মনে করি না। 'গণনাট্যে এসে আমার কি সুবিধা হ'ল'—এ প্রশ্ন তখনো ওঠেনি।

প্রাথমিক সাফল্যের পর স্বভাবতঃই সংগঠন ও অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া গেল। ইতিমধ্যে গান ও নাচের দলে হারীন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং নাটকে শম্ভু মিত্র প্রভৃতিরা এসেছেন। '৫০ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষের সময় হারীণ ও বিনয়ের নেতৃত্বে গণনাট্যের পাঞ্জাব প্রভৃতি সফর গণনাট্যের জন্য অসামান্য খ্যাতি ও বাংলার জন্য বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু বোহেমিয়ান স্বভাবের জন্য হারীণকে দলে রাখা গেল না। অপর পক্ষে শম্ভুবাবুদের নাম তখন কিছুই ছিল না—কিন্তু তাঁরা এই আন্দোলনের সম্ভাবনা নিজেদের পক্ষে কতদূর সুফল আনতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের নিজস্ব লক্ষ্য স্থির ছিল, ব্যক্তিগত দায়িত্ব কম ছিল এবং লক্ষ্যে পৌছবার মত কৌশলগত নমণীয়তার সঙ্গে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছিল। গণনাট্যের বাহিরে নতুন নাট্য প্রচেষ্টায় পরিশ্রম করার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ তারা পান নি। সর্বোপরি কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক আবহাওয়া তাদের পক্ষে ছিল। পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে পার্টি তখন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মিলনের উপর ভারতের মেহনতী জনসাধারণের ভাগ্য সমর্পণ করেছে।

রাজনীতিতে যেমন বুর্জোয়া নেতাদের হাতে আত্মসমর্পণ—সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনি বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় দল গঠন করে—তাতে উদয়শংকরের দলের শান্তিবর্ধন ও রবিশংকর প্রভৃতিকে নেতৃত্বে বসানো এবং ক'লকাতায় 'নবান্নের' সর্বক্ষণের দল গঠন করে সেখানে শম্ভুবাবুদের প্রাধান্য সৃষ্টি করার ব্যবস্থা একই নীতির এপিট ওপিট। প্রকৃত পক্ষে পার্টির সংস্কৃতি কর্মীদের বলা হল: এরা তোমাদের

পলিট ব্যুরো! 'ভারতের মর্মবাণী' বা 'অমর ভারত' যে নেহেরুর ভারত আবিষ্কারের সাংস্কৃতিক রূপ বা 'নবান্ন' যে টেকনিক নাটকের ক্ষেত্রে আমদানী করেছে তা যে গণনাট্য আন্দোলনকে তার ঘোষিত নীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তা সেদিন অল্প লোকেই বুঝেছিল। 'নবান্ন' নাটকের রিহার্সালের মধ্যে এবং 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যনাট্যের প্রথম অনুষ্ঠান দেখে কমিউনিষ্ট পার্টির শীর্ষ-স্থানীয় নেতাদের কাছে এই বিপদ-এর আশংকা অর্থাৎ একদিকে বিষয়বস্তুতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও অন্যদিকে ফর্মালিজমের বিপদ সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এর পরে অবশ্য এরই প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় অতিবাম বিচ্যুতির যুগ। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে রবিশংকর ও শম্ভু মিত্ররা তার আগেই গণনাট্য ছেড়ে চলে গেছেন কার্যতঃ। 'নবান্ন'র পরে শম্ভুবাবুর পরিচালনায় একরাত্রি 'মুক্তধারা' অভিনয় হয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে বেরিয়েছেন এবং নির্বাচন উপলক্ষে তাদের লোকেরা সারা ভারতে কমিউনিষ্টদের মারধোর করছে। সারা ভারতে গণনাট্যের কর্মস্থল আক্রান্ত হয়েছে। গুলি খেয়ে গণনাট্যের লোকেরা মারা গেছে। অধ্যাপক নীরেন রায় ও রাধারমণ মিত্রের মত শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতি নেতারা গুরুতর ভাবে প্রহৃত হয়েছেন – কাজেই সুযোগ সন্ধানীরা বা soap-bubble socialist art workerরা সরে পড়াই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন। এর উপর অতিবাম বিচ্যুতি এসে পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে একাকার করে একটি ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে যান্ত্রিক ভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দিল। সংস্কারবাদই যে অতি-বামবিচ্যুতির পথ করে দেয়—গণনাট্যে তার প্রতিফলন দেখা গেল।

অতিবামবিচ্যুতির রাজনৈতিক শ্লোগান অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্লোগান ভুল হলেও এই যুগ শ্রমিক কৃষক—মেহনতী জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার যুগ, যদিও তা নিয়ে বাড়াবাড়ি যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু গণনাট্যে তার কিছু কল্যাণকর প্রভাব দেখা যায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মাউণ্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য', বিনয় রায় ও সলিল চৌধুরীর কাকদ্বীপের অহল্যা সম্পর্কে গান ও কবিতা এবং অনিল ঘোষের 'নয়ানপুর' নাটক—সারা ভারত গণনাট্য কর্মীদের উৎসাহ সঞ্চার করে। বস্তুত তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকে এই ধরণের রচনা শুরু হয়। এছাড়া পুলিশের হামলা থেকে বাঁচবার জন্য গণনাট্য পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে প'ড়ে তথাকথিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কালচারাল 'পলিটব্যুরো'র হাত থেকে উদ্ধার পায়। অভিজ্ঞ এবং পেশাদার

শিল্পীদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া আমি অন্যায় মনে করি না—কিন্তু তারা মার্ক্সবাদী চেতনা দিতে পারেন কি ভাবে ?

অতিবাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ১৯৫০ সাল থেকে সুরু হল—তা আবার দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৫৩ সালে বোম্বাই গণনাট্য সম্মেলনে কমিউনিষ্ট কর্মীদের কাছে অজয় ঘোষ বলেন—"প্রগতি কথাটা অস্পষ্ট—কাজেই যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়—তাই গণনাট্য করবে।"

এই নীতির সার্থক পরিণতি ১৯৫৮ সালে দিল্লী সম্মেলন—যেখানে সরকারী শিল্পপ্রচেষ্টা ও গণনাট্য একাকাব করার চেষ্টা হয়।

ইতিমধ্যে ভারতের বর্জোয়া শ্রেণী নিজ শাসন ভালভাবে কায়েম কবেছে—এবং তাই এখন আর কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ নয়—নানাবিধ সরকারী ও বেসরকারী সংস্কৃতি সংগঠনের মাধ্যমে (যেমন তথাকথিত পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য ক্ষেত্রে করছে) সে শিল্পীদের কিনে নিচ্ছে। যে সকল শিল্পী এককালে প্রগতিলেখক সংঘে ও গণনাট্যে ছিল—কিন্তু কমিউনিষ্টদের বাড়াবাড়ির জন্য এই সব সংগঠন ছেড়ে গেছে আজ তারা নির্লজ্জভাবে নানাবিধ সরকারী ও বে-সরকারী অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের জয়গান করে বেড়াচ্ছেন। ১৯৬৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅতুল্য ঘোষের আহ্বানে যে সব শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন—তাদের মধ্যে গণনাট্যের কয়েকজন প্রথমদিককার নাট্যকার ছিলেন। নির্বাচনী সভায় কংগ্রেসের পক্ষে শম্ভুবাবুর উপস্থিতির তুলনায় এ সংবাদ কম চমকপ্রদ নয়।

তাই আজ গণনাট্যের যে সমস্যা দেখা গেছে—তা কেবল তার বৃদ্ধি ও বিকাশের সমস্যা নয়। সমস্যা আদর্শগত—যে সমস্যার ফলে আজ ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনও দ্বিধাগ্রস্ত। এই সমস্যার সুরাহা না করতে পারলে, অন্ততঃ মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের সংগঠনের ন্যূনতম চরিত্র স্থির না করে দিতে পারলে গণনাট্য বা তার প্রভাবাধীন সংস্কৃতি সংগঠনগুলির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই আজ দল গঠনে, নাটক নির্বাচনে, আঙ্গিক উদ্‌ভাবনে, বিদেশী নাটক অনুকরণে এবং পুরানো নাটক বিনাবিচারে নির্বাচনে এক অরাজকতা দেখা দিয়েছে। সংগঠনে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের অব্যবস্থা, নামকরা পরিচালক ও অভিনেতাদের নৈতিক অবনতিকে অবহেলা করা, সাধারণ কর্মীদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখা—এখন কেউ অন্যায় বলে মনে করে না। যেমন রাজনীতিতে—তেমনি সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই

ধরণের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কার্যকলাপ কিছুতেই ফলপ্রসূ হতে পারেনা বলে আমার ধারণা।

একথা কেমন করে বিশ্বাস করা যায় যে কংগ্রেস দেশ এমনভাবে শাসন করছে··· যাতে কমিউনিষ্টরা নির্বাচনের সিড়ি বেয়ে নিরাপদে তাদের গদি দখল করতে পারে? একথা কেমন করে বিশ্বাস করা যায় কংগ্রেস শাসনে গঠিত একাডেমি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের মধ্যে সম্মান ও অর্থ এমন ভাবে বিতরণ করবে যাতে বৈপ্লবিক গণসংস্কৃতি প্রসার লাভ করবে? প্রমোদব্যবসা ক্ষেত্রে, সরকারী সাহায্যপুষ্ট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে তারা কাজ করছে তার স্বরূপ জানা ও তা' প্রকাশ করা আজ গণসংস্কৃতি কর্মীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। গণনাট্য আন্দোলন মূলতঃ সংস্কৃতি আন্দোলন হলেও মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের প্রেরণায় এই আন্দোলনের জন্ম ও বিস্তার। কাজেই একে অগ্রসর হতে হলে সেই আলোক বর্তিকা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কংগ্রেস আজ সমাজতন্ত্রবাদ বলে চীৎকার করছে। তার প্রতিনিধি হয়ে প্রতাপ চন্দ্র, ইলা পালচৌধুরী ও নীহাররঞ্জন রায়ের মত 'সমাজতন্ত্রী'রা এসে 'গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনকে' ধন্য করেন এবং অতি পরিচিত ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্টিভুক্ত 'বাজারী' সম্পাদক এসে নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন!

একি নাট্য আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির লক্ষণ, না চরম রাহু গ্রাসের লক্ষণ? গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে যারা প্রকৃত মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করেন এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠন গড়তে চাইছেন এর জবাব তারাই দেবেন।

গণনাট্য পত্রিকা সেপ্টেম্বর ১৩৭১ সাল।

গণনাট্য আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘ

গণনাট্য আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে অনেকের মনে আজ গণনাট্য সংঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছে।

গণনাট্য সংঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে—বিশেষ করে সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে—এ-কথা আজ শত্রু মিত্র সকলেরই স্বীকার করতে হয়। গণনাট্যের পতাকা হাতে অনেক সংস্কৃতি কর্মীকে শত্রুপক্ষের হাতে প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করতে হয়েছে। গণনাট্য সংঘের অফিস আক্রান্ত, তার কর্মীরা প্রহৃত, নাটকাভিনয় সরকারী নাগপাশে বদ্ধ হয়েছে। ভারতের আর কোন সংস্কৃতি সংগঠনের উপর সরকারী নির্যাতনের এইরূপ ব্যাপক নজীর ইদানীং কালে আর মেলে না।

অথচ ১৯৫০-৫২ সালের পর থেকেই শোনা যেতে লাগলো গণনাট্য সংঘের ঐতিহাসিক প্রয়োজন নাকি ফুরিয়েছে। শত্রুপক্ষের হাতে সদ্য রক্তস্নাত গণনাট্য সংঘের কর্মীরা—(যারা কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য) বোম্বাই কংগ্রেসে অজয় ঘোষের কাছে শুনতে পেল ভূ-দান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জয়গান থেকে যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয় তাই গণনাট্যের বিষয় বস্তু করার আহ্বান। এই ধরণের তত্ত্বগত মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাপারেও এমন ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল—যা আজ গণনাট্য সংঘকে বর্তমান দুর্দ্দশায় ফেলেছে।

কাজেই গণনাট্য সংঘের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট বুঝতে গেলে এবং তার প্রতিকার করতে গেলে গণনাট্য সংঘের মৌলিক চালক শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টির সংকটের অবস্থা বুঝতে হয়। কারণ হিসাব করলে দেখা যাবে গণনাট্য সংঘের সংকট ভারতে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সংকটের সুরু থেকেই হয়েছে। আর তা না হওয়াই অস্বাভাবিক হ'ত। কারণ গণনাট্য সংঘ যা গণসংস্কৃতি আন্দোলনের সৃষ্টির গৌরব ন্যায্যতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাপ্য।

এ যুগে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সঙ্কটের প্রধান রূপ হ'ল—শোধনবাদের অনুপ্রবেশের ফলে দলে বিভেদ সৃষ্টি এবং ক্রিয়াকর্মে বৈপ্লবিক তাৎপর্যের পরিবর্তে সংস্কারবাদী তাৎপর্যের প্রভাব বৃদ্ধি। শোধনবাদকে আসলে বুর্জোয়া

আদর্শের নামান্তর বলে প্রকৃত মার্ক্সবাদীরা মনে করেন। অথবা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যখন চরমভাবে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে তখন সে কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়াও তত্ত্বগত সংগ্রামের নামে প্রগতিশীল শিবিরে ঢোকে এবং বিভেদ আনার ব্যবস্থা করে। বর্তমান যুগে এদেশে ও বিদেশে মার্ক্সবাদী মহলে শত্রুপক্ষের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাত গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে একথা বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের লক্ষ্য করা দরকার যে ভারতে মার্ক্সবাদী আন্দোলন যখন জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল কেবল তখনি সংগঠিত গণসংস্কৃতি আন্দোলন সৃষ্টি হ'ল।

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক দল তার চূড়ান্ত বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনের সকল স্তরেই মিত্র খুঁজবে এবং এই মিত্ররা যতই শ্রেণীগত চরিত্রে অদৃঢ় হোক, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি তাকে সংগঠিত করে বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি করবে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তিকে মধ্যমণি করেই এই সকল যোগাযোগ করা মার্ক্সবাদী কর্মকৌশলের মূল নীতি বলে জানা যায়।

বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা পূর্বোক্ত মিত্রদের মধ্যে পড়েন—যাদেব সৃজনশীল কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব চেতনা বিস্তারের ব্যাপারে মার্ক্সবাদীরা দিযে থাকেন—যদিও তারা জানেন যে এই শ্রেণী দোদুল্যমান, পলায়নপর, অহংবাদী এবং বিপদের দিনে সহজে ভোল পাল্টানোর ব্যাপারে তৎপর। তবু এঁদের কাজের গুরুত্ব আছে বলেই এঁদের সংগঠিত করা, সহযোগিতা অর্জন করা এবং বিপদের দিনে এরা যাতে সরাসরি শত্রু শিবিরে না যেতে পারে—তারজন্য নিরন্তর চেষ্টা করার দায়িত্ব মার্ক্সবাদীরা কখনো অস্বীকার করতে পারে না। কারণ মার্ক্সবাদী সংগ্রাম কৌশল সর্বাত্মক (total) এবং মার্ক্সবাদীরা নিশ্চিত ভাবেই জানে যে কয়েকটি শিল্পী বা সাহিত্যিককে প্রতিক্রিয়াশীলেরা অর্থ, চাকুরী ও খেতাব দিয়ে কিনতে পারে, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ও উন্নতি-বৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর দ্বারা কখনো সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে শতকরা ২০ জনের বেশী লোকের অক্ষর জ্ঞান হয় নি—যার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে সংগ্রামী জনচেতনা বিস্তারের চেষ্টার গুরুত্ব অনেক দিন ধরেই থাকবে। কারণ যে হারে অক্ষর জ্ঞান বাড়ছে তাতে একশো বছরেও সব লোক শিক্ষিত হবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই অশিক্ষিত

লোকের মধ্যে রয়েছে ভারতের ভারতের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যা শ্রমিক ও কৃষক যারা ভারতের সমাজ বিপ্লবের মৌলিক শক্তি। অথচ লেখক ও শিল্পীরা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারণাও এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে—যদিও সেই ধারণাকে কার্যকরী করার শক্তি হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুনলেই নাক উঁচুতে তোলা যুক্তি সঙ্গত নয়। তবু এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা স্থির করে মার্ক্সবাদীরা অগ্রসর হ'য়ে থাকেন।

আমাদের দেশে বিদেশী শাসনের অত্যাচারের জন্য এবং এই বিদেশী শাসন প্রথম দিকে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন বরে ভারতে বুর্জোয়া বিকাশকে বাধা দিতে থাকে বলে—ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতন অংশ সহজেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, বুর্জোয়া বিশ্বজনীনতা (কসমোপলিটানিজম) এর প্রভাবে পড়ে। তদুপরি এ দেশে লেখক ও শিল্পীদের নিজস্ব পেশাগত অন্ন-সংস্থানের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা থাকায় নিছক বাঁচার তাগিদেও সুবিধাবাদ এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের মুখোস পরতে তাদের বেশী দেরী না হওয়া অসম্ভব নয়।

এই সকল অবস্থা বিচার করে গণসংস্কৃতি আন্দোলনের সুরুতেই মার্ক্সবাদীরা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন লেখক ও শিল্পীদের শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে জানা এবং সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে তাদের সংগ্রামী সহযাত্রী করার জন্য নানা সাংগঠনিক ব্যবস্থা করে। প্রগতি লেখক সংঘ ও গণনাট্য সংঘের গোড়ার দিককার ইতিহাসে এই সকল ব্যবস্থার নজির মিলবে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সংকটের প্রথম যুগের প্রথম বলি হ'ল প্রগতি লেখক সংঘের অবলোপ। এর জন্য দায়ী কেবল কংগ্রেস সরকার সৃষ্ট সাহিত্য বা সঙ্গীত নাটক একাডেমী নয়—এর জন্য দায়ী রাজনৈতিক শোধনবাদ। অতিবাম বিচ্যুতির যুগে একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত ও নাটক রচনা হয়েছিল—অপর দিকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক সচেতন অংশ সার্থকভাবে পূর্বোক্ত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়েছিল। এর ফলে শিল্পী সাহিত্যিকদের আন্দোলন নতুন অভিজ্ঞতায় আরো শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল অনতিবিলম্বে তাদের প্রধান অংশ অন্য বিচ্যুতির অর্থাৎ শোধনবাদের কবলে পড়লো।

যারা ১৯৫১ সালের মধ্যে শ্যামবাজারের এক স্কুলে এবং রামমোহন লাইব্রেরী

হলে মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি কর্মীদের আত্ম সমালোচনার বৈঠকের খবর রাখেন—তারা জানেন এই সব বৈঠকে পার্টির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তথাকথিত শিল্পীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বুর্জোয়া বা শোধনবাদী পরিকল্পনা সুকৌশলে গৃহীত হয়। সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ—বাংলাদেশে যার শাখার নাম ছিল প্রগতিলেখক ও শিল্পীসংঘ—তার মৃত্যু পরোয়ানা এইভাবে লেখা হয় এবং সুরু হয় 'আনন্দবাজার, দেশ, যুগান্তর' গোষ্ঠীর কাছে প্রগতি লেখকদের আত্মসমর্পণের কলঙ্কজনক অধ্যায়। ঘটনাটি সহজে ঘটেনি। প্রথমে প্রগতিলেখকদের মধ্যে কিছু কিছু সাময়িকপত্র ভিত্তিক উপদল সৃষ্টি হয় এবং সেইসব সাময়িকপত্র বেশ কিছুদিন নিজ নিজ সংগঠনের ভিত্তিতে চলতে লাগলো। আজো সে যুগের কয়েকটি সাময়িকপত্র আছে যাদের পূজা সংখ্যা বেশ জাকজমক করে প্রকাশিত হয়।

এক সময় আশা করা গিয়েছিলো যে প্রগতিলেখক সংঘ না বাঁচানো গেলেও এদের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে মার্ক্সবাদী সাহিত্য সংগঠনের একটা কাঠামো তৈরী হতে পারে এবং ইতিমধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে হলেও মার্কসবাদী চেতনা বিস্তারের কাজ বজায় থাকতে পারে। কিন্তু আজ যদি সেই সকল সাময়িক পত্রের অবস্থা ও সংগঠনের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা হয় তাহলে দেখা যাবে শিল্পের স্বাধীনতা এবং শিল্পীর সাংগঠনিক স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারসচিব অশোক সরকার ও তুষারকান্তিদের সুবিধা করে দিয়েছে। সাংস্কৃতিক আসরে আজ তারাই প্রধান পাণ্ডা, নাট্য মেলায় বঙ্গসংস্কৃতিতে, রবীন্দ্র স্মরণীর (রবীন্দ্রসদন খোলার) সংগ্রামে (?) আজ ততই তুষারকান্তি, অশোক সরকার এবং সুকোমলকান্তিদের জয় জয়কার! মার্কসবাদী আন্দোলন তা শ্রমিক-কৃষকদের হোক আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের হোক, স্বতঃস্ফূর্তির স্রোতে বইলে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে বিপথে চালিত হতে পারে একথা মার্কসবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বলে।

গণনাট্য আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘ লেখক ও শিল্পীদের আন্দোলনের অংশ বলেই এই ইতিহাসটুকু ভূমিকা হিসাবে মনে রাখা দরকার।

কারণ আলোচ্য সময়ে গণনাট্য আন্দোলনে এবং গণনাট্য সংঘেও পূর্বোক্ত 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'আন্দোলন নয় শিল্প সৃষ্টিই আসল কাজ' এবং ছোট ছোট উপদল গঠনের স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠে। ফলে নবনাট্য কথা চালু হয়—যার পরিণতিতে বর্তমান যুগে সংনাট্য আন্দোলন হয়েছে। প্রথম দিকে এরা সকলেই

মার্কসবাদী দল ও তাদের সমর্থনপুষ্ট গণআন্দোলন গুলির সহায়তা পাওয়ার জন্য অনেকে পার্টি'র সভ্য পদ নিয়েছেন বা পার্টি'র ঘনিষ্ট দরদী রূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে। বস্তুতঃ গত ১৫ বছরের ইতিহাস গণনাট্য সংঘের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার নামে সংগঠন বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাস; শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের নামে স্বৈরাচারের ইতিহাস; দলগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে সুযোগসন্ধানী নেতাদের সুবিধাবাদী ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস এবং সর্বোপরি মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক পরিচালনার পরিবর্তে মার্ক্সবাদের তত্ত্বে ও সংগঠনে অনভিজ্ঞ নামকরা নাট্যকার, সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতাদের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা করার ইতিহাস। মার্ক্সীয় পরিভাষায় এই ঘটনাকে 'লিকুইডেশনিজম' বা 'আত্ম-বিলোপবাদ' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

এসব সত্ত্বেও গণনাট্য সংঘের প্রভাব এবং তার কয়েকটি শাখা আজো আছে কেন? তার উত্তরে ভারতের মার্ক্সবাদী আন্দোলনের দিকেই তাকাতে হয়। শোধনবাদের আক্রমণে মার্ক্সবাদীরা আজ তিন ভাগে বিভক্ত—কিন্তু তবু তো প্রকৃত মার্ক্সবাদীরা হাল ছাড়েন নি। ব্যাপক তাত্ত্বিক নৈরাজ্যবাদ, সাংগঠনিক অরাজকতার মাঝখান দিয়ে তাবা সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন—এবং এত দুর্বলতা নিয়েও তারাই আজ প্রতিক্রিয়াশীলদেব চরম আক্রমণেব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বলে জানা যায়।

শত দুর্বলতা নিয়েও গণনাট্য সংঘ আজ এই পুনর্গঠনের অংশীদার। কারণ পশ্চিমবাংলায় আজ অধিকাংশ সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রগুলি চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বেতার ও সিনেমাতে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃত্ব দৃঢ় হওয়ার ফলে বৈপ্লবিক মধ্যবিত্ত শিল্পীর পক্ষে আত্ম বিক্রয় না করে এই সব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবা কঠিন এবং করতে পারলেও মালিকদের ব্যবস্থামত কাজ করতে হয়। পশ্চিমবাংলার ২।১ জন ফিল্ম পরিচালক ছাড়া সাধারণ ভাবে ভারতীয় ফিল্ম প্রমোদ বিতরণের নামে 'আমেরিকানিজম' শেখাচ্ছে। ভারতের কোনে কোনে অবস্থিত কয়েক সহস্র সিনেমা গৃহ থেকে, প্রতিদিন অসংখ্য বেতার কেন্দ্র থেকে সংগ্রামী জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশলী চেষ্টা চলছে। সরকার পুরস্কার, পদবী, লোক সভায় ও আইনসভায় মনোনয়ন দিয়ে নামকরা শিল্পীসাহিত্যিকদের কিনছেন। আর যারা সোজা পথে পক্ষে না আসতে চায় যেমন শিশির কুমার বা বিলায়েৎ হোসেন কোন পক্ষে আসেননি

তাদের ভোলাবার জন্য উৎপল দত্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় 'অঙ্গার' বা সুভাষের অনেক বিপ্লবী কবিতার পরিবর্তে 'ফেরারী ফৌজ' ও 'লাল গোলাপ'কে পুরস্কৃত করা হ'ল।

এইরূপ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বিপ্লবী তরুণ শিল্পীদের সামনে কেবল একটি পথই খোলা আছে, তাহ'ল গণসঙ্গীত ও গণনাট্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই সাজ্ঘাতিক প্রভাব থেকে নিরন্তর মুক্ত রাখার চেষ্টা করা। তাই যেখানেই জনগণ সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে সেখানেই গণসঙ্গীত ও গণনাট্যের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

এই প্রয়োজনীয়তা কেবল ক'লকাতার কয়েকটি ভাড়া করা মঞ্চে অভিনয় করে মেটানো যায় না, এর জন্য সংগঠিত গণআন্দোলনের সহযোগিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হয়। নবনাট্য ও সংনাট্যের নামে যারা গণনাট্য আন্দোলন করছেন বলে দাবী করেন তাদের সাধ্য নেই এ কাজে অগ্রসর হওয়ার। তাই দেখা যায় যে পুরানো গণনাট্যের কর্মীরা যখন পেশাদারী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গণনাট্য সংঘ থেকে সরে গেছেন এবং পৃথক সংগঠন করে নিজেদের পেশাদারী জীবনের দাম বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন তখন কিছু কিছু নতুন কর্মী এসে গণনাট্য সংঘের পতাকা তুলে ধরেছেন। সর্বভারতীয় সংগঠন যখন লুপ্ত, রাজ্য সংগঠনের নেতারা বিনা কৈফিয়তে সর্বপ্রকার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন অথবা পেশাদারী জগতে নিজ সাফল্যলাভে ব্যস্ত তখন তরুণদের এই চেষ্টা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের প্রাণের লক্ষণ। কারণ তারা আজকের গণনাট্য সংঘের দুর্দশার পরিবর্তে বিগত দিনের গণনাট্য সংঘের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা ভেবে প্রেরণা পেয়েছেন। প্রতিক্রিয়ার গুলিতে নিহত গণনাট্য সংঘের শহিদ ভাবমাধব ও সুশীলের কথা ভেবেছেন আর ভেবেছেন যে গণনাট্য আন্দোলন করবো অথচ গণনাট্য সংঘ গড়বো না এমন কথা কিছু সরল, বোকা বা মৎলব-বাজ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তাই গণনাট্য সংঘ পুনর্গঠনের এই লক্ষণ গুলিকে যদি আবার স্বতঃস্ফূর্তির স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে বর্ত্তমান যুগের সংকট থেকে মার্কসবাদীরা কোন শিক্ষাই লাভ করেনি।

গত কয়েক বছর আমরা দেখেছি দুই একটি প্রগতিশীল মঞ্চসফল নাটকের ভিত্তিতে যে সকল প্রগতিশীল কর্মী ব্যক্তি ভিত্তিক দলগঠন করেছেন সেই সকল দলের নিজের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি

করতে না পারার ফলে দলগুলির ধীরে ধীরে অবনতি ঘটেছে, অনেকে সরকারী ফাঁদে পা দিয়েছে এবং অনেক শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনে শোচনীয় পরিবর্তন দেখা গেছে। আমরা দেখেছি নব-নাট্য ও সৎ-নাট্যের নামে নানা রকম প্রগতি বিরোধী নাট্য প্রচেষ্টা সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আবার অপর দিকে রাজনৈতিক বিষয় বস্তু, প্রয়োগ নৈপুণ্য ও মঞ্চ সাফল্যের ভিত্তিতে পেশাদারী মঞ্চের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করেই অনেকে সন্তুষ্ট নন, বর্ত্তমান যুগে তারাই গণনাট্য সংঘ একথা বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে।

এই সকল ভদ্রলোকেরা পেশাদারী মঞ্চে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সার্থক ভাবে উত্থাপনের জন্য নিশ্চয় গণ আন্দোলনের অভিনন্দন যোগ্য—এবং তারা পেশাদার মঞ্চে গণনাট্যের পরিপূরক এমন কথাও বলা যেতে পারে—কিন্তু অংশ কখনো সম্পূর্ণ থেকে বড় নয় একথা তাদের স্মরণ করানো দরকার।

কারণ গণনাট্যের সামনে কেবল প্রধান প্রধান শহরের কয়েকটি মঞ্চ এবং সেখানে পয়সা দিয়ে যারা প্রবেশ করতে পারে এমন দর্শক নেই; গণনাট্যের সামনে রয়েছে ভারতের বৃহত্তম জনসাধারণ—যারা দরিদ্র, নিপীড়িত, নিরক্ষর শ্রমিক, কৃষক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষ, যারা ভারতীয় সমাজের ভাবী রূপায়ণে চূড়ান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করবে। গণনাট্য সংঘ হবে সেই রূপান্তরের কাজে সহযোদ্ধা। নব সংস্কৃতির এই বাহিনীকে সংগঠিত না করে কয়েকটি আধা পেশাদার ও সৌখিন নাটুকেদলের হাতে নেতৃত্ব মার্ক্সবাদীরা ছেড়ে দিতে পারে না।

গণনাট্য সংঘের গোড়ার দিকে তার সর্বভারতীয় কমিটিতে প্রগতি লেখক সংঘ, ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সংগ্রামী গণ-সংগঠনগুলির প্রতিনিধি রাখা হয়েছিল। রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটিগুলিতে পুরোপুরি এই নীতি গৃহীত না হলেও পূর্বোক্ত গণসংগঠন গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হ'ত। মফঃস্বল জেলায় কৃষক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সে যুগের গণনাট্য আন্দোলনের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ছিল। এই সকল সংগঠন কেবল আমাদের দর্শক যোগাড় করে দিত—তাই নয়, এদের মধ্য থেকেই আমরা অনেক শিল্পী সংগ্রহ করেছি। এই ভাবে গণনাট্য সংঘ সংগ্রামী ও সংগঠিত জনগণের অংশ হিসাবে পরিচয় দিতে পেরেছে। এই সকল আন্দোলনের বাইরে থেকে যে সকল মধ্যবিত্ত শিল্পীরা এসেছেন তারা এবং সাধারণভাবে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শিল্পীদের পক্ষে পূর্বোক্ত গণসংযোগ তাদের মধ্যেকার বুর্জোয়া

ভাবাদর্শ প্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রে উত্তরণের শিক্ষা দিয়েছে। এই ভাবে মধ্যবিত্ত শিল্পীকে গণশিল্পীতে পরিণত করার চেষ্টা সে যুগে হয়েছে। এই চেষ্টা আজকের দিনে আরো বেশী প্রয়োজন।

আজকের দিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিকতার পুনঃ প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ গিরীশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার পর্য্যন্ত বাংলার নাট্য জগতে প্রতিভাবান পুরুষের আবির্ভাব কম হয়নি। কিন্তু তাঁদের সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও চেতনা এবং সাংগঠনিক কায়দা আজকের নাট্য আন্দোলনের আদর্শ ও সংগঠন নীতির তুলনায় গুণ ও পরিমাণগত ভাবেই পৃথক। তার কারণ বুর্জোয়া চরম পন্থী জাতীয়তাবাদের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তারা উপরের তলার উপর নির্ভর করে এবং সেই শ্রেণীর বীরদের কথাই নাটকের মারফতে প্রচার করে। তাই উদার মানবিকতা, উদার ধর্মবোধ ও বিশ্বজনীনতার নামে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের গুণগান করে। অপর পক্ষে মার্ক্সবাদসম্মত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সমস্ত শিল্প প্রচেষ্টাকে সমাজের বৃহত্তম অংশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য সংগ্রাম ভাবনাকে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করে। তথাকথিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তম জনসংখ্যার কল্যাণই এখানে কাম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর সমানাধিকার হচ্ছে—উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগীতা করার এবং মেহনতী মানুষকে শোষণ করার অধিকার, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় হটিয়ে অথবা একত্র করে বড় ব্যবসার সৃষ্টি করে জনসাধারণকে লুন্ঠন করার অধিকার। অপর পক্ষে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মূলকথা হল, এই মৈত্রীকে মধ্যমণি করে শোষক শ্রেণী বাদে সমগ্র মেহনতী জনসাধারণের সহায়তায় সমাজের রূপান্তর সাধন করা এবং সৃজন কার্য অব্যাহত রাখা।

ক্ষুদ্র আকারে হলেও সামাজিক বিকাশের এই মূলনীতি গণনাট্য সংঘের মধ্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি কর্মী দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা—বিশেষ করে শিল্প জগতে তার প্রতিক্রিয়া বিচার করবেন, শিল্পক্রিয়ার নিজস্ব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন এবং জনসাধারণ ও শিল্পীর সামগ্রিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে সাংস্কৃতিক নীতি স্থির করবেন। তারই প্রেরণায় সৃষ্টি হবে নতুন গান, নাটক, নৃত্য। নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলিকে তারা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করবেন। ফলে যে জনসমর্থন তারা লাভ করতে থাকবেন—

তারই সহায়তায় গণতান্ত্রিক সংগঠন বৃদ্ধি করে দেশের বিস্তৃততম অংশে নূতন সংস্কৃতির বাণী পৌঁছে দেবেন।

বিভক্ত শ্রেণী সমাজে মার্ক্সবাদীদের দ্বারা সংগঠিত সংস্কৃতি আন্দোলনের বাইরে নানা ধরণের সাংস্কৃতিক দল থাকা স্বাভাবিক—যাদের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে—আবার নাও থাকতে পারে। বর্তমান কুশাসনের যুগে অনেক সময় এই সকল দলগুলির সাধারণ স্বার্থ বিঘ্নিত হয় বলে এরা সময়ে সময়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এগুলি সাময়িক প্রয়োজন মিটে গেলেই বিভক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং এই ধরণের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা কখনো গণনাট্য সংঘের স্থান নিতে পারে না। কারণ গণনাট্য সংঘে যেমন মার্ক্সবাদী নিয়ন্ত্রণ থাকা অত্যাবশ্যক—ঐ সকল দলে তা থাকা সম্ভব নয়, গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঐ সকল দলে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকাই স্বাভাবিক এবং ঐ সকল দলে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র রক্ষার কোন ব্যবস্থাও থাকতে পারে না, কারণ সাধারণ সভ্যদের অধিকার রক্ষার কোন গ্যারান্টি এই সকল দলে নাই। গণনাট্য সংঘ ভেঙ্গে অথবা তার বাইরে থেকে গত বিশ বছরে যে কয়টি নামকরা দল কলকাতায় গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে—এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। কাজেই এ প্রবন্ধে আমি সে আলোচনা করতে চাই না।

সম্প্রতিকালে শোনা যাচ্ছে যে গণনাট্য সংঘ অপেক্ষাও বিপ্লবী নাট্য সংগঠন গড়ার চিন্তা কিছু কিছু লোকের মাথায় এসেছে। এদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের একজন বলে শুনেছি। (উৎপল দত্ত ও নির্মলঘোষের নেতৃত্বে গণশিল্পী সংস্থা গঠন সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছিল) গণনাট্য সংঘ বর্তমান অবস্থায় আসার জন্য তার দায়িত্ব কতখানি সে বিচার গণনাট্য সংঘের কর্মীরা করবেন। আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে—কি সেই বিপ্লবী সংগঠন যা গণনাট্য সংঘকে পশ্চাৎপদ বলে ধিক্কার দিতে চায়? অথবা এরা কি গণনাট্য সংঘে শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেরিয়ে আসছেন?

ভারতে কংগ্রেস দল আজকাল সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছা বারবার ঘোষণা করছে। এবং গত বছর কংগ্রেসী ও বামপন্থী নাটুকে লোকেরা একটা সমাজতান্ত্রিক নাট্যসম্মেলন পর্যন্ত করে ফেল্লেন। এই সম্মেলনের প্রচারের প্রভাবে পড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়—একটা সমাজতান্ত্রিক নাটুকে দল সৃষ্টি না দেখে বৃদ্ধ বয়সে শান্তি পাচ্ছেন না এমন কথাও বলেছেন। মন্মথদার বয়স হয়েছে কাজেই এই বয়সে তাঁকে মার্ক্সবাদের বই পড়তে বলা

অত্যন্ত অন্যায় হবে—কিন্তু অতি আধুনিক নাট্য আন্দোলনের বৈপ্লবিক মার্ক্স-বাদীদের কাছে আমার প্রশ্ন হ'ল এই যে—যে স্লোগান কমিউনিষ্ট পার্টি নিজ ঘোষণায় দিতে পারে না—সেই স্লোগান কি করে একটি গণসংগঠন দেবে? কমিউনিষ্ট পরিচালিত কোন ট্রেড ইউনিয়ন কি তার কর্মসূচী বা আদর্শের মধ্যে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে? তা যদি না পারে তাহলে গণনাট্য সংঘকে বা কেন তা করতে বলা হবে? অবশ্য এই সব কথা তারা বলছেন কিনা তা' আমার জানা নেই। তাই একথা আবার বলা দরকার যে আজ যে গণনাঠ্য সংঘের সর্বভারতীয় বা রাজ্য নেতৃত্বগুলি লোপ পেয়েছে তার কারণ গোটা কমিউ-নিষ্ট পার্টির উপর শোধনবাদের প্রভাব—যার ফলে শ্রমিক ও কৃষক ফ্রণ্ট রক্ষার নামে সমগ্র সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া অথবা তাদের প্রভাবে নষ্ট হতে দেওয়া হয়েছে। তাই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শোধনবাদের বিরুদ্ধে, তার রাজনীতি ও সংগঠন কায়দার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই গণনাট্য সংঘকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে—গণনাট্য সংঘকে পাশ কাটিয়ে নয়।

কিন্তু এই অজুহাতে আজকের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নৈরাজ্যময় অবস্থার সুযোগে যদি কেউ রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই 'প্রলেটকাল্ট' নামে নাট্য জগতে যে ক্ষতিকর উগ্রপন্থা দেখা দিয়েছিল—তারই অনুকরণে সমগ্র নাট্য আন্দোলনকে ব্যাপক গণআন্দোলনের পরিচালনা থেকে সরিয়ে কয়েকটি নাট্য গোষ্ঠির সাময়িক বীরত্ব প্রদর্শনের উপর নির্ভর করাতে চান—তাহলে তা' বড়জোর বীরত্বপূর্ণ আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত হতে পারে—কিন্তু নাট্য আন্দোলনকে অগ্রসর করবে না বলে মনে করি।

মনে রাখা দরকার যে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিপ্লবী সংগঠন ভারতের সমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে চায়—তার একটি সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি আছে—যা দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী হয়। বৈপ্লবিক সংস্কৃতি আন্দোলন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচালিত হবে। কারণ বিপ্লব কেবল কয়েকটি নাটুকে দল করতে পারে বা তার নেতৃত্ব দিতে পারে—এ কথা ভাবা নিতান্ত হাস্যকর। এক বা একাধিক নাটক জনপ্রিয় হচ্ছে বলে বা এক বা একধিক প্রয়োগকর্তা মঞ্চ সফল হয়েছেন বলে তারা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি'র রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বিপ্লবী নাট্যআন্দোলনের সহজ পন্থা বার করতে পারবেন—এমন কথা কি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের দিক তাকিয়ে বলা যায়?

আজ মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সংকটের যুগে শোধনবাদী আদর্শের হাত থেকে গণসংস্কৃতিকে উদ্ধার এবং নূতন করে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা' অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক—সাংগঠনিক বিচারের পদ্ধতিতেই করতে হবে—অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়।

গণনাট্য—জুলাই, ১৯৬৫ সাল।

গণনাট্য সংঘের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ

গননাট্য সংঘের প্রভাব সংস্কৃতি জগতে স্বীকৃত। তাই ইদানিং কালে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির কোন কোন অধ্যাপক নাট্যবিষয়ক গ্রন্থে গণনাট্যের নাটক ও নাট্যকারদের নাম উল্লেখ করছেন এবং নিজ নিজ রুচিমত গণনাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত দেবার চেষ্টা করছেন। গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় এবং রাজ্য কমিটির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনও এই কাজ করেছেন। কিন্তু এই রচনাগুলির কোনটাই ইতিহাস হয়নি, কারণ এই আন্দোলনটি ব্যক্তিভিত্তিক নয়। গিরীশচন্দ্র কিম্বা শিশির কুমারের ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং তাঁদের গোষ্ঠী ও বন্ধুবর্গের মহান চেষ্টার বিবরণ দেওয়ার মত ব্যাপারের মধ্যে কেবল গণনাট্যের ইতিহাসের মালমশলা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ইতিহাসের মসলা মিলবে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম-বৃদ্ধি ও প্রসারতার ইতিহাসের মধ্যে। দুঃখের বিষয় যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সেই ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রকাশ করার নানা অসুবিধা আছে। তা ছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় দলগত কারণে অনেকে প্রকৃত ইতিহাস দিতে চাইবেন না—অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসকে নিজ নিজ পক্ষের ধারনা অনুযায়ী বিকৃত করার চেষ্টা হবে—এমন নিদর্শন ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। আর সেই সুযোগে ধনিক শ্রেণী পরিচালিত সংবাদপত্র এই আন্দোলনের উৎস সন্ধানে কখনো বৃটিশ, কখনো মস্কো বা কখনো পিকিং-এর হাত প্রমাণ করতে নানা রকম গালগল্প ফাঁদছে। অবশ্য ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সুচিন্তিত ভাবেই নিজ পার্টির সংগঠক প্রেরণ করে এই আন্দোলনকে গড়ে তুলতে সবিশেষ চেষ্টা করেছে একথা আজ অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। জাতীয় যুক্তফ্রন্ট যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সঙ্গী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত সংগ্রামশীল দেশভক্ত ব্যক্তি ও সংগঠন-গুলিকে সমবেত করছিল সেই আন্দোলনের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে প্রগতি-লেখক ও গণনাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে—এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্য-বিত্তদের অন্যান্য সংগঠনের মত সংস্কৃতি সংগঠনেও অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিনিধিদের তুলনায় কমিউনিষ্ট সংস্কৃতি কর্মীরা সার্থক সংগঠক হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতে

থাকে। গণনাট্যের প্রথম দিককার ইতিহাস এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজাদ, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা গণনাট্য আন্দোলনের যে পর্যায়ে উৎসাহ দাতা ছিলেন তার ব্যাখ্যা সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজেই গণনাট্য সংঘের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে গেলে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রথমে যারা কাজ করেছেন তাদের একত্র বসা দরকার এবং সেই বৈঠকে স্থির করা দরকার কি ভাবে এই ইতিহাসের মালমসলা যোগাড় করা হবে এবং কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে ইতিহাস লেখা হবে।

১৯৫৫ সালে পশ্চিমবাংলা গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলন হয়। তখন সেই সম্মেলন থেকে ইতিহাস লেখার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন, পঃ বাংলার নির্মল ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী, সুব্রত বন্দোপাধ্যায়, দিগিন বন্দোপাধ্যায় এবং আমার নাম ছিল। আমাকে এই কমিশনের আহ্বায়ক করা হয়। এই কমিশন গঠনের মূলে আমাদের বিবেচনায় ছিল যে বাংলাদেশে গণনাট্য গড়ার আগে কলকাতার ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুব্রত বন্দোপাধ্যায় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর যার নাম থাকা উচিৎ ছিল— অর্থাৎ বিনয় রায়—তিনি তখন মস্কোতে। সুতরাং এর পরেই আমার নাম এ'ল। কারণ বিনয় বোম্বাই চলে যাওয়ার পর বাংলা গণনাট্য সংঘের সংগঠনের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে সজল রায়চৌধুরী, নিরঞ্জন সেন এবং দিগিন বন্দোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিলেন—যদিও দিগিনবাবু কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। ১৯৫০ সালের পর নির্মল ঘোষের হাতে দায়িত্ব আসে। তা'ছাড়া নিরঞ্জন সেন সর্বভারতীয় সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে অন্যান্য শাখারও কাগজ পত্র রাখতেন। এই কমিশনের কয়েকটি বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে নিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষ ছাড়া আর সকলেই লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। নানা কারণ দেখিয়ে ওরা টালবাহনা করতে থাকেন। তবু অন্যদের রিপোর্ট এবং আমার কাছে যে সব বুলেটিন ও কাগজ পত্র ছাপানো ও হাতে লেখা আছে—তার ভিত্তিতে ইতিহাসের একটি রূপরেখা তৈরী করি—যা তখনকার দিনের 'স্বাধীনতা' কাগজের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনা সংক্ষিপ্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি ঘটনার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি।

সমসাময়িক কালে নিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষের বিশিষ্ট বন্ধু এবং গণনাট্য সংঘের ১৯৫০ সালের কর্মী টিপু দাসগুপ্তের পরমাত্মীয়দের সম্পাদিত 'শিল্পী' কাগজে গণনাট্য সংঘের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং তাতে লেখা হয় 'নবান্ন' নাটক নিরঞ্জন সেনের পরিচালনায় অভিনীত হয়েছে! প্রকৃত ব্যাপার হল—'নবান্ন' নাটকের পরিচালনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। ব্যাপারটি আমার চোখে পড়তে আমি সকলকে সতর্ক করে দিই।

ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার রাজনৈতিক বিরোধ দানা বাঁধতে থাকে এবং গণনাট্য সংঘের কমিউনিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সেই দুই ধারার বিরোধ একদিকে সজল রায়চৌধুরী ও অন্যদিকে নির্মল ঘোষের মারফতে রূপ পেতে থাকে। অবশ্য ১৯৫৫ সালের রাজ্য সম্মেলনের সময়েই এই বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল—এবং সেই বিরোধকে ধামা চাপা দিয়ে ফ্রন্ট রক্ষার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্ব প্রথমে আমাকে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং আমি রাজী না হওয়াতে কমল মিত্রকে সম্পাদক করা হয়। কিন্তু কমলবাবুর মত লোক যিনি কখনো রাজনীতি করেননি তাঁর পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব ছিল। ফলে সংগঠনের মধ্যে উপদলীয় চক্রান্ত বৃদ্ধি পেতে লাগলো—মধ্য কলিকাতায় মমতাজ আহমদের এবং দক্ষিণ কলিকাতার নিবেদিতা দাস প্রমুখদের বিদ্রোহ তারই প্রকাশ। কলকাতার আরো কয়েকটি শাখা লোপ পেল এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য কমিটির শাখা রক্ষার জন্য ব্যালে দল, রাজাবাজার ও পূর্বকলিকাতার শাখা ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেল। সেই সময় কলিকাতার বাইরের কিছু শাখা তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে গণনাট্য সংঘের নাম বজায় রেখেছিল—যার জীবন্ত প্রমাণ মেলে সর্বভারতীয় কিসান সভার ১৯৫৭ সালের বনগাঁ সম্মেলনে। এই সময় রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে কে কত লড়াই করেছিলেন—তা' আমি বেশী বলতে পারবো না—কিন্তু দুই ধারার প্রতিনিধিরা ফ্রন্ট রক্ষার ব্যাপারে প্রায় নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছিলেন। বনগাঁ কৃষক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পার্টি ও গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটি কি অবস্থায় আমাকে দেন তা 'কালান্তর' কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতীন সরকার বিশদভাবে বলতে পারবেন।

ঠিক এমনি অবস্থার উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'পাদ প্রদীপ' কাগজে তৎকালীন গণনাট্য সংঘের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী শোভা সেন গণনাট্য সংঘের ইতিহাস মূলক একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে গণনাট্য সংঘের তৎকালীন

নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করে তিনি সাধারণ সভ্যদের আহ্বান জানান এই নেতৃত্বকে হটিয়ে দিতে। সেই কাজে মত বিনিময় করার জন্য উৎপল দত্তের উক্ত পত্রিকার পাশে সমবেত হবার পরামর্শ তিনি দেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে শোভার এই প্রবন্ধ প্রকাশের আগে উৎপলবাবু এক পত্র যোগে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে। আমি একটি প্রবন্ধও তাঁকে দিয়ে আসি। কিন্তু সে প্রবন্ধ কখনো প্রকাশিত হয়নি। উৎপলবাবুর সেই পত্রখানি আজো আমার কাছে আছে। ঘটনাটি এই জন্য উল্লেখ করলাম যে গণনাট্য সংঘের এ যুগের নেতারা সংঘের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম না করে বাইরের ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গণনাট্য সংঘে বিদ্রোহ ঘটানোর যে কৌশল ১৯৫৭ সালে করেছিলেন—বর্তমান যুগে 'গণশিল্পী সংস্থা' সংগঠনে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু উৎপল বাবু ও শোভা সেনের সঙ্গে নির্মল ঘোষের যোগাযোগ কতখানি মতাদর্শ গত এবং কতখানি পারস্পরিক অবস্থানগত তা ইতিহাস বিচার করবে।

যাই হোক শ্রীমতী সেনের সেই প্রবন্ধের বিচার আজ আমার আলোচ্য নয়—এবং পাঠকদের এইটুকু জানানো দরকার যে সেই সময়কার অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে (কমলবসুর বাড়িতে) শোভাকে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল। শ্রীমতী সেনের এই প্রবন্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল কথা আছে তা' অন্য কোন প্রবন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। মোটের ওপর অল্পকালের মধ্যে মতাদর্শগত এবং সংগঠনগত সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় দিল্লী সম্মেলন থেকে পদত্যাগ করি। কাজেই গণনাট্য সংঘের ইতিহাস লেখার দলগত চেষ্টা থেকে আমার স্থান পৃথক হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি জানি এ পর্যন্ত উক্ত সংগঠন থেকে বা কোন সূত্র থেকে এই চেষ্টা আর হয়নি। কিন্তু ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে 'শিল্পীমন' তথা 'গণশিল্পী সংস্থার' মুখপত্র 'প্রসেনিয়মে' নির্মল ঘোষ 'গণনাট্য সংঘের ২৫ বছর' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখতে থাকেন। তিনি কারো কাছ থেকে পাওয়া কাগজ পত্রের সাহায্যে কিছু সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এমন এক ইতিহাস লেখেন—যা' মার্ক্সবাদী আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস না হয়ে তিনি ও তার গোষ্ঠী ও বন্ধুবর্গের মহিমাপ্রচারের ইতিহাস হয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য নানা রাজনৈতিক ঘটনা ও চরিত্র এনে গোষ্ঠীর বাইরের কিছু

লোককেও পিট চাপড়িয়েছেন। শুনেছি মার্ক্সবাদী মহলের সুস্থ অংশের প্রবল চাপের ফলে এই রচনা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ইতিহাসের নামে যে অন্যায় তা' ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে এবং এই প্রবন্ধের সাধ্যমত আলোচনা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা থাকলো। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাই যে উক্ত প্রবন্ধের কোন অংশে আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হ'লে আমি প্রতিবাদ পত্র পাঠাই এবং সেই প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করতে আমাকে আইনের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

আমি পূর্বেই বলেছি যে গণনাট্য সংঘের ইতিহাস একটি সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত—কাজেই কোন এক ব্যক্তির পক্ষে এই ইতিহাস নির্ভুল ভাবে লেখা সম্ভব নয় এবং গণনাট্য সংঘ একটি কমিশন গঠন করে সঠিকপন্থা নিয়েছিল। এখন আমরা বিচার করবো নির্মল ঘোষ প্রথম দিককার ইতিহাস লিখবার পক্ষে যোগ্য কিনা এবং অযোগ্যতার জন্য ইতিহাস বিকৃত হয়েছে, না উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি গণনাট্য সংঘের সংগঠনে আমি নির্মল ঘোষের আগে এসেছি। তৎকালীন গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিল ডি-সিলভার ২৯শে জুলাই ১৯৪৩ সালে এক পত্রে আমাকে বাংলা গণনাট্য সংঘের সংগঠন সম্পাদক পদে নিযুক্ত করার যে সংবাদ জানিয়েছেন তার হাতে লেখা ও টাইপ করা দুটি কপিই আমার কাছে আছে। প্রকৃত পক্ষে এর আগে থেকেই আমি ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের গণ-নাট্য শাখার সঙ্গে যুক্ত। তখনকার দিনের 'জনযুদ্ধ' কাগজের ব্যবস্থাপনার ভার আমার হাতে ছিল এবং সেই কাগজের সঙ্গে যুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিনয় রায় প্রভৃতিকে নিয়ে উক্ত লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রাথমিক পার্টি গোষ্ঠী তৈরী করা হয় ১৯৪৩ সালে। পরে সেই গোষ্ঠীকে কাজের সুবিধার জন্য 'পরিচয়', লেখক সংঘ, নাট্যসংঘ, ও শিল্পীসংঘের গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়। আমি বাংলা দেশের নূতন সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রায় সুরু থেকেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম—হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর চেষ্টায় গড়া লেখক গোষ্ঠীর মাধ্যমে।

হীরেনবাবুরা প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূচনা করেন যখন সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা

ও ফ্যাশিজমের উদ্ভবের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন 'পপুলার ফ্রন্ট' নীতি এবং পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের নীতি গ্রহণ করে। কাজেই প্রগতিলেখক সংঘ ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে অন্যশ্রেণীর প্রগতিশীল লোকেদের সঙ্গে কমিউনিষ্টরাও কাজ করতো এবং তাদের উদ্যমের জন্য তারা সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করতো। সেই হিসাবে আমি মার্কসবাদী সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও সংস্কৃতি আন্দোলনে অংশ নিতে থাকি এবং তখনকার অবস্থার জন্য আমার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের বিশেষ যোগ ছিল।

এই সব কারণে ১৯৪৩ সালে বিজনের লেখা প্রথম নাটক 'আগুনে' আমি অভিনয় করি। ১৯৪৩ সালের ২৫শে মে বোম্বাই শহরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে আমি যেতে পারিনি, কলকাতায় আমার বিশেষ দায়িত্ব পূর্ণ কাজ ছিল। এই সম্মেলনে বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' অভিনয় হয়েছিল এবং ওখানে যে সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয় তাতে বাংলার নামের তালিকায় বিনয় রায় সর্বভারতীয় সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ; বাংলার প্রতিনিধি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং স্নেহাংশু আচার্য এবং বাংলা কমিটির জন্য সর্বশ্রী সুনীল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে ও বিনয় রায়ের নাম ছিল। এই সম্মেলনের দুই মাসের মধ্যে সাধারণ সম্পাদিকা অনিল-ডি-সিলভা কলকাতায় এসে উক্ত কমিটির দুটি বৈঠক করে আমাকে সংগঠন সম্পাদক, শম্ভুবাবুকে নাট্য সম্পাদক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গীত সম্পাদক এবং চিন্মোহন সেহানবীশকে কোষাধ্যক্ষ করে দেন। বলতে গেলে গণনাট্য আন্দোলনের জন্য সর্বক্ষনের কর্মী জীবন এখান থেকে আমার সুরু হয়। সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে এই কাজে আমাকে পাঠাতে একদিকে পি, সি যোশী, জনাব মুজফ্ফর আহমদ এবং বিশ্বনাথ মুখর্জ্জী এবং অপর দিকে অনিল ও বিষ্ণুদের অনুরোধ ছিল। আমি তখন অসুস্থ অবস্থায় স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ী—সেখানে অনিল ও বিষ্ণুবাবু গিয়ে আমাকে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। কেবল বিষ্ণুবাবু নন, তখন শম্ভুবাবু ও বিজনেরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল আমি তাঁদের সঙ্গে যোগদান করি। কারণ তখন রাজনৈতিক নেতাদের যে বিরাট ভরসায় এই আন্দোলন অগ্রসর করা হবে বলে স্থির হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে আমায় সংযোগ গভীর ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি অনিলের সেই ইংরাজী চিঠির অনুবাদ এখানে দিতে চাই এই কারণে যে আজকালকার দিনের কর্মীরা বুঝতে পারবেন একেবারে গোড়ার দিকে কি ভাবে গণনাট্য সংঘের কাজ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমাদের নিয়োগের কথা ঘোষণা করে উক্ত চিঠিতে বলা আছে: "৪ঠা একটি অনুষ্ঠান করতে হবে। তার জন্য শীঘ্র নিমন্ত্রণ পত্র ছাড়তে হবে। প্রোগ্রামে গান ও 'ল্যাবরেটরী' নাটকের দৃশ্য থাকবে। শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং স্নেহাংশু আচার্য বক্তৃতা করবেন—বক্তৃতার বিষয়গুলি হীরেন মুখার্জীর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। দুটি সাহায্য রজনী অনুষ্ঠান করতে হবে।

"একটার জন্য বোম্বাই থেকে 'গ্রেপ্‌স অব র‍্যাথ' এবং কিছু সোভিয়েট ও চীনা ছায়া ছবি পাঠানো হবে। আর পরেরটাতে কলকাতার শিল্পীরা যোগ দেবেন এবং তাঁদের সম্মতি সংগ্রহের ব্যাপারে বিষ্ণুদেকে দায়িত্ব দিতে হবে। চটকল শ্রমিক যে নাটক লিখেছেন কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। তার মারাঠি অনুবাদ সি ভি আপ্তে করবেন এবং হিন্দির ভার চিনুকে (চিন্মোহন সেহানবীশকে) দিতে হবে। হাওড়াতে শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক দল গড়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতি ইউনিয়নের শ্রমিকদের মধ্যে যারা সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম করতে পারে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আমরা এমন শ্রমিক চাই যারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলিকে জনপ্রিয় করবে এবং টিকেট বিক্রয় করবে। বোম্বাইয়ে একাজ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও লাল স্বেচ্ছা-সেবকরা করেন। আমাদের ইউনিয়নগুলি ছাড়াও অন্যান্য ইউনিয়নের জন্য আমাদের অবশ্য নাট্যানুষ্ঠান করা দরকার। সমস্ত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন করা দরকার। তারপরে একটা ভাল নাটক তাদের দেখিয়ে আমাদের নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের জানানো যে সবদেশে নাট্য আন্দোলন এই পথেই চলেছে এবং অর্থহীন নাটকের স্থান আধুনিক নাট্য আন্দোলনে নেই।

"আমেরিকান সার্জেন্ট ভ্যান মিচেল, কলিকাতা ৭০৮০ ব্যাটালিয়ান ১২০কে রবার্ট র‍্যাণ্ডের মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান দপ্তর টাওয়ার হাউসের ঠিকানায় সংবাদ দিয়ে গত বিশ বছরের মার্কিন ষ্টেজের উপর মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা দরকার। আপনাদের নাটক দলগুলির কাছে এ বক্তৃতা হওয়া উচিত। কারণ কেবল নাটকেই যাদের উৎসাহ তারাও এই সকল বক্তৃতার মারফতে বুঝবে প্রত্যেক দেশের নাট্য জগতে নূতন কোন

ঝোঁক প্রবল হয়েছে। গ্রামোফোন কোম্পানী যে চার খানা গান রেকর্ড করবে বলে জানিয়েছে তার কি হল জানতে হবে। তারা অনেক আগেই চিঠি দিয়েছে অথচ এ বিষয়ে কিছুই করা হয়নি যদিচ আমার আগের আসার সময় থেকে কথা চলছিল। কমরেড রশিদ জাহান আর একটি কোম্পানীর কথা বিনয়কে বলে গেছেন তার খবরও নেওয়া দরকার। নাটক পাঠ, আধুনিক আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা প্রভৃতি নিয়মিত হওয়া দরকার এবং বাংলার শিল্পকলা আর সেগুলিকে আমরা কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি তাও আলোচনা করা দরকার।

"কিসান আন্দোলন—কমরেড আবদুল্লা রসুল জানিয়েছেন যে সম্প্রতি কিসান স্কুলে জেলার যে সব কর্মীরা এসেছিলেন তারা বলেছেন বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে সর্বক্ষণের গণনাট্য কৃষক ইউনিট হওয়া সম্ভব। এদেরকে শিখিয়ে নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে পাঠাতে হবে। শিক্ষার বিষয় হবে যাত্রা, নাটিকা ও গান। এই শিক্ষার টাইম টেব্‌ল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করে নিতে হবে। প্রথমে একটা ছোট খাটো সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস, তারপর চীন ও রুশিয়ার নাট্য আন্দোলনের বিবরণ। কমরেড গোপাল হালদারকে আর কারো সাহায্য নিয়ে 'অধিক ফসল ফলান,' 'কৃষক সভার সভ্য হও' এবং জাপ-বিরোধী নাটক লেখার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকের ক্ষেত্রে কোন নূতন যাত্রা বা গান হলে আমাদের কাছে খবর দেবার জন্য কৃষক কর্মীদের বলতে হবে। যে দুটি নাটক ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে তা যোগাড় করে বিষ্ণুদেকে দিয়ে ইংরাজী এবং চিনুকে দিয়ে হিন্দি করতে হবে।"

সে যুগের সর্বভারতীয় সংগঠনের সম্পাদিকার এই নোটটি তখনকার দিনের গণনাট্যসংঘ কি ভাবে কাজ করতে চাইছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ চিত্র। আর ঐ দুটি নাটক হচ্ছে বিজনের 'জবান বন্দী' এবং মনোরঞ্জনবাবুর 'হোমিও প্যাথী' যার অভিনয় হতে আর কিছুদিন লেগেছিল। এই ঘটনাগুলির বিবরণ এই কারণে দেওয়া হ'ল যে 'জবানবন্দী'র যুগ পর্যন্ত নির্মল ঘোষ বা শোভা-সেনের কোন সংযোগই ছিল না। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে 'নবান্ন' অভিনয় হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীমতী শোভা সেন আমাদের কাছে আসেন। তাঁর প্রথম শ্বশুর বাড়ীর সকলের সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং তাঁর ননদাই অধ্যাপক শান্তিময় রায় এসে আমাকে জানান যে শোভা আমাদের সঙ্গে অভিনয় করতে চান। তখন আমরা 'নবান্ন'র জন্য লোক খুঁজছি। শোভা

এসে প্রথমদিন 'নবান্ন' নাটকে যে দৃশ্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষক শহরে এসে আস্তাকুঁড়ে খাবার খেতে গিয়ে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছে সেই সময় তার স্ত্রীর উক্তিটি রিহার্সাল দিলেন এবং মনোনীত হলেন। শোভা আসার কিছুদিন পরেই চারুপ্রকাশ ঘোষ ও নিমাই ঘোষ (নির্মল ঘোষের বড দাদা, এঁদের পিসিমা চারু বাবুর মা) আসেন আমাদের বন্ধু কমরেড সুধাংশু দাসগুপ্তের মারফতে। আর এই সম্পর্ক নিয়ে নির্মল ঘোষ তখন অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে গণনাট্য সংঘের রিহার্সালরুমে যাতায়াত শুরু করলেন। কাজেই এ যুগে কমিউনিষ্ট পার্টি কিম্বা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের কার্যকরী সমিতি যার অধীনে গণনাট্য শাখা চলতো তার কার্যক্রম কি ভাবে তারা জানতে পারেন ? এক যারা এব কার্যকরী সমিতিতে জড়িত ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলে অথবা তার কাগজ পত্র দেখে। আমাদের কাছ থেকে তারা যে আগে শোনেন নি এমন নয় কিন্তু সে সব কথা বললে তো উদ্দেশ্য সফল হয় না।

সেই কারণে নির্মলবাবু ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি ছাপানো রিপোর্টের ভিত্তিতে তার উদ্দেশ্য মূলক কল্পনা বিস্তার করেছেন এবং গণনাট্য সাব-কমিটির সম্পাদক শ্রীচিত্ত ব্যানার্জীকে বাংলা গণনাট্যের প্রধান সংগঠক বলে চালিয়েছেন। তবে তার ইচ্ছা থাকলে তিনি জানতে পারতেন যে চিত্তবাবু সাব-কমিটিব সম্পাদক হিসাবে প্রকৃত পক্ষে দৈনন্দিন কেনা কাটা, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অনুষ্ঠানের আগে মঞ্চ প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখার কাজ করতেন এবং ওঁর নামের যাবতীয় রিপোর্ট আমার লেখা। 'বহুরূপী' পত্রিকার 'নবান্ন' স্মারকসংখ্যা (৩৩)-এর ১৬৪ পৃষ্ঠায় চিত্ত ব্যানার্জী লিখেছেন: 'আমি ছিলাম নেপথ্যে, নাটক মঞ্চস্থ করাব সব ভারই ছিল আমার উপর। হল ভাড়া, বিজ্ঞাপন, নিমন্ত্রণ, টিকিট ষ্টেজ সবই আমায় করতে হত।" এমন কি লেখক ও শিল্পী-সংঘের কার্যকরী কমিটির সভায় ঐ রিপোর্টগুলি নিজে তিনি কখনো পড়েন নি আমিই পড়েছি। চিত্তবাবু মিষ্টভাষী ভদ্রলোক ছিলেন এবং রাজনীতি বলতে গেলে ঐ সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রথম আসেন এবং 'নবান্ন'র প্রথম সপ্তাহের অভিনয়ের পর—তার কার্যভার চারু প্রকাশ ঘোষ গ্রহণ করেন—এই কারণে যে তিনি হিসাবপত্র রাখার ব্যাপারে বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। অপর পক্ষে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্তাহিসাবে চারুবাবুর এইসব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব এবং রসিদ ও ভাউচার ছাড়া একটি পয়সাও তার হাত থেকে বার হ'ত না। চারুবাবু এই সব বিষয়ে এত কড়া ছিলেন যে ক'ল-

কাতার বাইরে 'শহীদের ডাক' নিয়ে বিনয় রায় ও সজল রায়চৌধুরীর পরিচালনায় যে দল গিয়েছিল—তার ঠিকমত হিসাবপত্র দিতে পারেনি বলে চারুবাবু উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই ঘটনা আরো দুবছর বাদে। এই পর্যায়ে নির্মল ঘোষের কোন সংযোগ ছিল না—কাজেই চিত্তবাবু সম্পর্কে গালগপ্প করা ছাড়া উপায় কি তার পক্ষে। নির্মল ঘোষকে ঠিক প্রথম কবে দেখলাম আজ মনে পড়ে না। কিন্তু বড়বাজার থেকে আমাদের রিহার্সালরুম গোয়াবাগানে আসার পর যে সব ছাত্র কর্মী আমাদের কাছে আসতেন—তাদের সঙ্গে তাকে দেখেছি এবং তিনি অভিনয় করেছেন 'মুক্তধারায়'। তার আসার সুযোগ নিশ্চয় তার দাদা নিমাই ঘোষের মারফতে হয়—কারণ তিনি 'নবান্ন'র বিশেষ অভিনেতা ছিলেন। 'মুক্তধারা' অভিনয় হয় ১৯৪৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্র-জন্ম সপ্তাহে। এই সময়ে গণনাট্য সংঘের কার্যকরী সমিতিতে যে নির্মলের কোন ভূমিকাই ছিল না—একথা বলবেন তার পিসতুতো ভাই এবং তখনকার গণনাট্য কমিটির সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ।

তার দাদা ছাড়া সংস্কৃতি আন্দোলনের উপযুক্ত স্থানে আসার ব্যাপারে নির্মলের সিঁড়ি হ'লাম আমি। তখন বেঙ্গল আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের সংগঠন সম্পাদক ছিলাম। এটি একটি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল এবং এর সদস্যদের মধ্যে থিয়েটার, ফিল্ম, রেডিও ও গ্রামোফোনের সমস্ত শিল্পীরা ছিলেন। গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনের ফলে শিল্পকলার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন আনার সংগঠনগত এবং পেশাগত পরিবর্তনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়—যার ফলে এই আন্দোলন তৈরী হয়। ১৯৪৫ সালের শেষের দিক থেকে ওখানে কয়েকজন শিল্পী কমিউনিষ্ট বিরোধিতার নামে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে এবং উক্ত সংঘের তৎকালীন অবৈতনিক অফিস-সহকারিটি সেই চক্রান্তের শিকার হন। ফলে ওখানে আমাদের প্রভাবান্বিত লোক রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। এই জন্য প্রথমে চট্টগ্রামের কবিসমিতির বঙ্কিম সেনের ভাই শৈলেন সেনকে নিযুক্ত করার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে আনাই। সেই খবর শুনে নির্মল এসে আমাকে অনুরোধ করতে থাকে এই পদটির জন্য। কারণ এই পদটির বেতন ছিল ৫০ টাকা এবং কাজের সময় বিকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পদে তখন নির্মলের পিসতুতো ভাই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। কাজেই অপরিচিত শৈলেনকে রাখতে আমার যে অসুবিধা হ'ত—নির্মলের বেলায় তা হবেনা ভেবে নির্মলকে নিলাম। এই সময়টা হল ১৯৪৭ সালের মার্চের পর। এই

যোগাযোগ কিভাবে নির্মলের কাজে লেগেছে—এবং আন্দোলনে বিপদ সৃষ্টি করেছে—তা' অন্যত্র বলা হবে। এখানে এ কথাগুলি বললাম যে এই সময় পর্যন্ত তিনি গণনাট্য সংঘের কোন কোন অনুষ্ঠানে একষ্ট্রা বা ছোট ভূমিকা পাওয়ার সন্ধানে আছেন ও আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের বেতন-ভূক কর্মচারী হয়েছেন। পরে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আমি গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর উগ্রবামপন্থী রাজনীতির নামে এই সংগঠনটিকে উঠিয়ে দিয়ে ১৯৫০ সালের প্রথমে সোজা গণনাট্য সংঘের সম্পাদক হয়ে বসলেন! উগ্রবামপন্থায় কিছু লোক মারা পড়ে যেমন—তেমনি কিছু লোকের লাভ হয়—এ তার একটি দৃষ্টান্ত। এ যুগেও দেখছি গরম গরম কথা বলে উৎপলবাবু জেলে গেলেন (আর নরম কথা বলে বেরিয়ে এলেন) আর নির্মলবাবুও সেই পথ অনুসরণ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে ছুটলেন।

যাই হোক যে 'মুক্তধারা' নাটকে নির্মলবাবু অভিনয় করেছেন বলে ছাপানো প্রোগ্রাম উদ্ধৃত করেছেন সেটি আমার কাছেও আছে—এবং আমি আমার বর্তমান প্রবন্ধে ঠিক তার পরবর্তী অংশের যে ইতিহাস তিনি দিয়েছেন তার কয়েকটি ভুল দেখিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব।

উক্ত প্রবন্ধে নির্মল ঘোষ লিখেছেন "মুক্তধারা মঞ্চস্থ হওয়ার পরই একটা সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে গণনাট্য সংঘের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারিত হতে থাকে দেশ দেশান্তরে, আরেক দিকে বাংলা গণনাট্য সংঘের নেতাদের ভিতর প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্য আর একদিকে সুধী প্রধান ও বহু সংগঠক নেতারা। আমরা মানে যারা নেহাতই কচিকাঁচা তারা এই সংঘর্ষকে বেশ মজার চোখে দেখতাম। আমরা দেখলাম আত্ম-প্রচারের ঘটা—যদিও সত্য কথা বলতে কি এর ভিতর যে সত্যই সৃষ্টিশীল শিল্পীদের উপদলটি, তাদের নাগাল আমরা বিশেষ পেতাম না। তবে একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, সেটা হচ্ছে এই যে চতুর্থ ভারতীয় সম্মেলনের পূর্বে একদিন গোয়াবাগানের কেন্দ্রীয় মহলার বাড়ীতে সব পক্ষের একটা মোকাবিলা হ'ল। সেদিন শম্ভুদাকে দেখেছিলাম অত্যন্ত শান্ত ও স্থির। কিন্তু ইসরাইলদা (মহম্মদ ইসরাইল) ও সুধীপ্রধানকে সেদিন দেখলাম সোচ্চারে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে। এবং এমন ঘোষণাও সেদিন সভা থেকে নেওয়া হ'ল যে দাদাদের বর্জন করেই আমরা নাট্য আন্দোলন চালিয়ে যাব।"

নির্মলের এই বর্ণনার তিনটি জিনিষ আমি পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ

করছি। প্রথমটি হচ্ছে এই যে নির্মলের মতানুসারে 'মুক্তধারা' অভিনয়ের পরে সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ; দ্বিতীয়টি : নির্মল তখন নেহাত কচিকাঁচা এবং এই মত-বিরোধে আত্মপ্রচারের ঘটা দেখতেন ; তৃতীয়টি : সভায় শম্ভুদা অত্যন্ত স্থির ও শান্ত ছিলেন এবং ইসরাইল ও সুধী প্রধান বেশ সোচ্চার।

এর জবাবে আমি নির্মলের পিসতুতো ভাই চারুপ্রকাশ ঘোষের লিখিত একটি রিপোর্ট-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিচ্ছি। চারুবাবু তখন গণনাট্য সংঘের ক'লকাতার কমিউনিষ্ট কর্মীদের কমিটির সম্পাদক ছিলেন—এবং রিপোর্ট উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে লেখা আর নির্মল লিখেছেন প্রায় বিশ বছর পরে।

চারুবাবুর রিপোর্টটি বেশ বড় তাই আমি তার প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি অনুবাদ করে দিচ্ছি। চারুবাবু লিখছেন : "বাংলা গণনাট্য সংঘে দুটি বিরুদ্ধ দল সৃষ্টি হয়ে গুরুতর সংকট দেখা গেছে। এই দুঃখজনক অবস্থা আকস্মিক নয়—বরং নেতৃত্বের মধ্যে মৌলিক মত-পার্থক্য থাকার স্বাভাবিক পরিণতিতে এই ঘটনা ঘটেছে।…'নবান্ন' নাটকের প্রস্তুতি পর্বে এই পার্থক্য ধরা পড়ে। 'নবান্ন' সম্পর্কে প্রাদেশিক পার্টি নেতাদের এবং গণনাট্য সংঘের ও বন্ধুদের কতকগুলি সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক নেতারা (শম্ভু ও বিজনবাবু—সু-প্র) ভাল মনে নিলেন না এই কারণে যে ওঁরা শিল্পী নন।… শম্ভুবাবু ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া অন্যত্র 'নবান্ন' অভিনয় করতে না যাওয়ায় সংকট বৃদ্ধি পেল। তারপর বুলবুল চৌধুরী ও জ্ঞান মজুমদারদের নিয়ে ব্যালে স্কোয়াড গঠনের ব্যাপারে শম্ভুবাবুদের প্রবল আপত্তিতে মতানৈক্য আরো প্রবল হল।". চারুবাবু আরও ঘটনার উল্লেখ করে সেই সভার বর্ণনা দিয়েছেন যার কথা নির্মল উল্লেখ করেছেন। আমি সেটি অনুবাদ না করে চারুবাবুর ইংরেজীতে রাখছি—"At the general meeting Com. Bulbul said that he was in favour of a variety programme and that he might have to undergo a nasal operation in which event the production would be delayed… in view of the fact that Com. Bulbul might be incapacitated for some time—, Com Sambhu was called upon to suggest an alternative. He said that he did not consider it possible to produce any drama, 'Navanna' or 'Jaban Bandi' or any other drama for that matter. He further

said that the IPTA had attained some reputation in the realm of stage play by producing 'Navanna'; he did not wish to loose that by producing some thing below the standard set by IPTA. He mentioned that it was doubtful if such leading actors like Com. Bijon Bhattacharya and Gangapada Bose would be available for regular rehearsals, hence, he said, it would be better to go in for some kind of variety programme. He also criticised the members of the drama squad ingeneral for their characteristic unpunctuality and irregularity in attending rehearsals which he asserted, justified his apprehensions to a great extent. Most of the members present, however persisted in taking up 'Navanna' inspite of Com. Sambhu's invective. This made him furious and caused him to leave the meeting in a huff.

এরপর চারুবাবু লিখেছেন যে সুধী প্রধান বলতে উঠে রিহার্সাল সম্পর্কে শম্ভুবাবুর অভিযোগের উত্তরে সকলকে নিয়মিত রিহার্সাল করার আহ্বান জানান। চারুবাবু আরো লিখেছেন যে নাটক করার সিদ্ধান্তে ব্যালে গ্রুপ চটে গেল দেখে আলোচনা স্থগিত রেখে সভা শেষ হয় এবং তখনি সুধী প্রধান ও ইসরাইলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পরের দিন বিচিত্রানুষ্ঠান করার জন্য সভাকে অনুরোধ করবেন স্থির করেন। চারুবাবুর এই রচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নির্মল ঘোষ যা বলেছেন—তা' ঠিক নয়। অর্থাৎ সংঘর্ষটি আগেই সুরু হয়েছিল এবং তা' আত্মপ্রচারের ব্যাপার নিয়ে নয়। সংগঠনের আদর্শ ও পরিচালনা, সংগঠনের বৃদ্ধি, শিল্পগত সমস্যার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা এবং আঙ্গিকের সমস্যা প্রভৃতিই ছিল বিরোধের বিষয় এবং সভাতে শম্ভুবাবু শান্ত ও স্থির ছিলেন না। তৃতীয়তঃ তাদের বাদ দিয়ে নাট্য আন্দোলন চালাবার কোন সিদ্ধান্তই এ সভায় হয় নি। এই রিপোর্টটি লেখা হয় ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে। অবশ্য এই রিপোর্টটি পার্টিগত—কিন্তু নির্মল ঘোষ এই কথা জানতে পেরেছিলেন এবং দু তিন বছর আগে নির্মলের বড় দাদা আমার কাছ থেকে নিয়ে আরো কয়েক কপি টাইপ করিয়ে নেন। কিন্তু আসল কথাটা সত্য ইতিহাস লেখা

নয়—যেহেতু দলবাজী করে তিনি গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন তাই সেই পদমর্য্যাদার সুযোগে উদ্দেশ্যমূলক রচনা। এই প্রসঙ্গে আমি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ১৯৪৬ সালের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। এই রিপোর্টটি ছাপানো এবং এখানে বাংলা সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে:

'The very success of 'Navanna' has however affected IPTA in a different way. More attention was centred on technical perfection, skill etc, and as a result, the popular aspect, popular demand, people's living contact came to be counted less important. 'Navanna' as a big drama requiring the services of many IPTA members and friendly artists, limited IPTA's activities to Calcutta, to well constructed stages with lighting arragements, and therefore, had to be staged before only a restricted number of people. We have pointed elsewhere that folk forms of art have been neglected and only those forms which we have acquired due to our contact with the West have come to be developed by the Bengal Branch of IPTA. Recently we have tried to rectify our mistake by arranging a few performances of 'Kabi Ladai'.

নির্মল ঘোষের মত যারা পরে এসেছেন গণনাট্য সংঘে তারা ইচ্ছা করলে এই সব সূত্র থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারেন। আর এই ইতিহাসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কৌশলগত অবস্থা এবং তদনুযায়ী যে সংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকা দরকার। কিন্তু নির্মলবাবুর সে সব প্রয়োজন নেই—কারণ তিনি যে এককালে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন—তার বাক্য তো আপ্ত বাক্য!

[চারুঘোষের এবং অন্যান্য রিপোর্ট 'মার্ক্সিষ্ট কালচারাল মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' পুস্তকে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে।]

গণনাট্য—শারদীয়া সংখ্যা—১৩৭৪ সাল।

'সংঘ' বনাম 'আন্দোলন', না 'আন্দোলন' বনাম 'সুবিধাবাদী নায়কতন্ত্র'?

শ্রীউৎপল দত্ত সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার মে ১৯৭৭ সালে 'গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা' গণনাট্য সংঘ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকলের আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আলোচ্য পত্রিকাটি যাতে ব্যাপক জনসাধারণের গোচরে আনা যায় এবং গণনাট্য সংঘের অতীত ক্রিয়াকলাপের সমালোচনার আলোকে বর্তমান গণনাট্যসংঘের কর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে উৎপল-শোভা জুটির পেশাদারী সাফল্যের নিরিখে ওজন করে হেয় করা যায়—তার জন্য বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি বাড়াবার চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেভাবে গণনাট্য সংঘের পুরানো অভিনেতা—অভিনেত্রীর রচনা দিয়ে সংখ্যাটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে—তাতে আশঙ্কা হয় যে দত্ত-সেনের প্রবন্ধগুলি গণনাট্য সংঘের সহৃদয় ও নির্ভরযোগ্য সমালোচনা বলে সাধারণ পাঠক ও উৎসাহী গবেষকরা সংখ্যাটিকে গণ্য করতে পারেন।

যেহেতু আমি গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগের প্রাদেশিক সংগঠক ছিলাম—এবং শ্রীমতী সেনকে গণনাট্যে আনার ব্যাপারে আমার সামান্য ভূমিকা ছিল, সেইহেতু শ্রীমতী সেনের বক্তব্যের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য অন্ততঃ সত্যের খাতিরে গণনাট্য সংঘের সদস্য ও দরদীদের সামনে পেশ করা দরকার। 'এপিক থিয়েটারে' আমার প্রতিপাদ্য কেন পাঠালাম না এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকবর্গ আমার প্রবন্ধের মধ্যেই পাবেন।

আমি আলোচ্য পত্রিকাটির সবকটি প্রবন্ধ—বিশেষ করে গণনাট্য সংঘের পুরানো শিল্পীরা যা লিখেছেন তা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। অন্যান্য প্রবন্ধগুলির দুই একটির তথ্যগত ভুল সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রধানতঃ শ্রীমতী শোভা সেনের 'গণনাট্য সংঘ' বনাম 'আন্দোলন' প্রবন্ধটির উপর আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

প্রথমেই চোখে পড়ে 'নবান্ন' অভিনয়ের সময় ও চরিত্র লিপি সম্পর্কে শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেনের বিভ্রান্তি। মণিদি নাটক বা অভিনয় নিয়ে মাত্র সামান্য

ক'দিন কাটিয়েছেন, তাঁর ভুল হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়—। কিন্তু শ্রীমতী শোভা সেন—যিনি জীবনের অর্ধেকের বেশী নাটক করে কাটালেন এবং 'এপিক থিয়েটারের' কর্মাধ্যক্ষা—তিনি তাঁর সম্পাদক স্বামীকে এতটুকু সাহায্য করার সময় কেন পেলেন না? কারণ উৎপলবাবুর পক্ষে 'নবান্ন' যুগের ইতিহাস জানার কথা নয়—তাই দায়িত্বটা প্রধানতঃ তার হলেও কেন তিনি তাঁর কর্মতৎপরা স্ত্রীর সাহায্য পেলেন না—তা জানার কোন সুযোগ আমার নেই। শ্রীমতী কল্যাণী মুখার্জিকে (কুমার মঙ্গলম) যখন মণিদি মজুমদার বানালেন তখন শোভার চোখে তা' না পড়া আমাকে বিস্মিত করেছে। কারণ যশোরে (১৯৪৪) 'নবান্ন' অভিনয় কালে এই প্রসঙ্গে শোভা একবার বোমা ফাটাতে চেয়েছিলেন—অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের বাসায়। অধ্যাপক রায় শোভার বিশেষ আত্মীয় ছিলেন। অবশ্য শোভার নিজের প্রবন্ধেও 'নবান্ন' নাটকে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে মনোজ ভট্টাচার্য' বলে একজনকে আমদানী করেছেন—কোথা থেকে তা বুঝতে পারলাম না। অমল ভট্টাচার্য বলে একজন গোটা, তিনেক ছোট ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আর 'নবান্ন' নাটকের প্রথম সংস্করণে তার নামও আছে। অমলের পরিহাস প্রিয়তার জন্য সে সকলের প্রিয় ছিল। স্মৃতির উপর বেশী নির্ভর করে রম্য রচনা লেখা হয় তো চলে—কিন্তু ইতিহাসের গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখতে হলে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীউৎপল দত্ত মহাশয়ও এমনি ভুল (?) করেছেন—যখন তিনি লিখেছেন 'দেশব্রতীব' আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের জবাব 'দেশব্রতী' ছাপায় নি। তৎকালীন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সভাপতি হিসাবে শ্রীতাপস সেনের জবাব 'দেশব্রতী' ছাপিয়ে ছিল, অবশ্য সে জবাব উৎপলবাবু কথিত ৩১ পৃষ্ঠার জবাবের অংশ কিনা জানি না। কিন্তু সমালোচনা যে এক তরফা হয় নি এটি 'দেশব্রতী'র পাঠক মাত্রেই জানেন। তারপর 'দেশব্রতী'র সমালোচক শশাংক এবং শ্রীসরোজ দত্তকে উৎপলবাবু পৃথক করে কেন দেখাতে চেষ্টা করলেন এবং কেনই বা শ্রীচারু মজুমদার মহাশয়কে শশাংকের কাছে ক্লীব করে রাখলেন? ঘটনাটির পিছনে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসও জড়িত। 'দেশব্রতী'র কয়েকটি সংখ্যায় উৎপল-বাবুদের সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হতে থাকার সময়ে আমার এক পরিচিত অভিনেতা —যিনি 'অচলায়তন' নামক নাট্যসংস্থায় আমার পরিচালনায় নাটকাভিনয় করেছেন তিনি শ্রীসরোজ দত্তের প্রস্তাব মতো উৎপল-বিতর্কে 'দেশব্রতীতে' লিখতে অনুরোধ করেন। শ্রীসরোজ দত্ত আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু ছিলেন

—রাজনৈতিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি আমাকে জানতেন বলে প্রস্তাব পাঠান। আমি অবশ্য ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিনি—কিন্তু পূর্বোক্ত অভিনেতা জীবিত আছেন বলে আমি ঘটনাটির বিবরণ দিলাম। শশাংক একটি ছদ্মনাম এবং শ্রীসরোজ দত্তকে পুলিস বিনা বিচারে হত্যা করেছে বলেই কি উৎপলবাবু সেই সুযোগে এই বিভ্রান্তিসৃষ্টি করলেন? গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের এক সভায় (১৯৫২) শিশির কুমার ভাদুড়ি বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলে—উৎপলবাবু কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা, আবার পরিবর্তিত সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে শিশির কুমারের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে অতি-মাত্রায় উৎসাহী হওয়া, স্বল্প কালের জন্য গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে অধিকাংশ সময়ে তার আদ্যশ্রাদ্ধ করার ফাঁকে ফাঁকে 'মহান গণনাট্য সংঘ' বলে স্তুতিবাদ করে সকলকে চমৎকৃত করা, যুক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ও সি. পি এমকে একই সঙ্গে প্রশংসা করে কংশালী যুগে সি পি. এম নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদের প্রাণান্ত করার কাজে উৎসাহ প্রদান করা—, অবস্থা বুঝে খুনী কংগ্রেসী নেতৃত্বের অন্যতম 'মহান মাও সে তুংএর' ভক্ত শ্রীপ্রিয়দাস মুন্সীর 'দক্ষিণী বার্তায়' এমার্জেন্সির সমর্থনে বিবৃতি দেওয়া এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনে বামফ্রণ্টের নির্বাচনী সভায় 'পালাবদলের' দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় করাকে এযুগের গৈরিশী ঐতিহ্যের চরম বিকাশ বলে গণ্য করা যেত, যদি না নাট্য আন্দোলনের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে বিকৃত তথ্য বিতরণ করতেন। গিরীশচন্দ্র ঘোষ অমৃতলাল বসুকে নিয়ে বিনোদিনীর বাড়িতে বসে বিয়ার খেতেন—মঞ্চে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী অভিনয় করে, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের প্রশংসা পেয়ে—শেষ জীবনে চৈতন্য-লীলা প্রভৃতি করে রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন আত্মদোষ স্খালনের জন্য। অবস্থা বুঝে পেশাদার অভিনেতারা এসব করেই থাকেন। তাই উৎপলবাবুদের চেষ্টা যদি তদনুরূপ হয়ে থাকে—তাহলে তা' আন্তরিক কিনা—অবশ্য বিচার্য।

'এপিক থিয়েটার' এ প্রকাশিত শ্রীমতী শোভা সেনের প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস—এবং বিশবছর আগে শ্রীউৎপল দত্ত সম্পাদিত 'পাদ-প্রদীপ' কাগজে প্রথম প্রকাশিত। শ্রীমতী সেনের নিজের কথায় প্রকাশ তিনি তখন গণনাট্যসংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী ছিলেন। আমিও ঐ সময়ে রাজ্য কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। আমার মনে আছে যে কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা গণনাট্য সংঘের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে শোভা আলোচ্য প্রবন্ধটির একটি ছাপা প্রেস কপি আমাকে পড়তে দেন। ট্রেনের

মধ্যে পড়েই আমি শোভাকে বলি যে এই ধরণের প্রবন্ধ গণনাট্য সংঘের বাইরের কাগজে প্রকাশ করে তিনি উচিত কাজ করছেন না। তৎকালীন গণনাট্য সংঘের নেতারা—যার মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান মজুমদার প্রভৃতি রয়েছেন—তাঁরা যত ত্রুটিই করুন—তাঁরা এক সহকর্মীর কাছে এই প্রত্যাশা নিশ্চয় করতে পারেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য থাকলে তা' নিশ্চয় কমিটির সভায় প্রথম পেশ করা হবে এবং সেই অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হলে তবেই তা সংঘের বাইরের কাগজে প্রকাশিত হতে পারে। বিশেষতঃ প্রবন্ধের যে অংশে বলা হয়েছে যে গণনাট্য সংঘের সাধারণ সদস্যরা 'পাদ-প্রদীপের' মাধ্যমে সংঘের দুর্বলতার কথা আলোচনা করুক—এই আহ্বান সংঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্ররোচনাদায়ক। শোভা আমার যুক্তি উপলব্ধি করেন এবং সেই সময় স্বীকার করেন যে প্রবন্ধটির রচনায় সমীরণ দত্তের প্রভাব আছে। আমি তখন তাকে অনুরোধ করি যে প্রবন্ধটির শেষ অথবা "পাদপ্রদীপে"র কোন জায়গায় সমীরণ বাবুর নাম উল্লেখ করে শোভা ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করুন। কিন্তু সে সব কিছু না করে—প্রবন্ধটি যেমন আমাকে পড়ানো হয়েছে—তেমনি প্রকাশিত হ'ল।

এই প্রসঙ্গে জানানো দরকার যে "পাদপ্রদীপের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার আগেই শ্রীউৎপল দত্ত আমাকে এই অনুরোধ করে পত্র দেন—যাতে প্রথম সংখ্যাতেই "গণনাট্য আন্দোলনের যে কোন দিক" সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ দিই—কারণ উৎপলবাবুর সে যুগের মতে আমার "বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য এবং পাদপ্রদীপকে সম্পূর্ণ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক করতে গেলে আপনার বক্তব্য আমাদের ছাপাতেই হবে"। এছাড়া শিশির কুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমি যাতে এ বিষয়ে যোগাযোগ করি তার জন্য 'একান্ত অনুরোধ প্রার্থনা করে' উৎপলবাবু পত্র শেষ করেছিলেন। আমি অবশ্য একটি প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলাম—কিন্তু কেন জানিনা—সে প্রবন্ধ ছাপা হয়নি এবং উৎপলবাবু ফেরতও দেন নি। আমি আমার রচনা নিয়ে কখনো কোন কাগজের দারস্থ হইনি। ফলে লেখা অমনোনীত হওয়া এবং সে বিষয়ে সম্পাদকের নীরবতার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে আজ পর্যন্ত ঐ প্রথম। এর একটি কারণ অনুমান করি এই যে উৎপলবাবু গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে আমার কাছে যে ধরণের প্রবন্ধ চাইছিলেন—তা' পাননি বলে শোভা ও শ্রীসমীরণ দত্তের সহযোগে পছন্দ মতো প্রবন্ধ লিখিয়ে ছাপালেন। এই অভিজ্ঞতার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ "এপিক থিয়েটারে" না পাঠিয়ে গণনাট্য সংঘের কাগজে প্রকাশ

করার তাগিদ বোধ করেছি।

সে যাই হোক শোভার প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর উপর কোনরূপ আলোচনা না করেই শ্রীকমল বসুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের প্রাদেশিক কনভেনশনে শ্রীমতী সেনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করানো হ'ল কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। দুটি কারণে—এই কর্মপন্থা স্থির হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য ও কলকাতার জেলা নেতৃত্ব জানতেন যে গণনাট্য সংঘের মতো সব গণফ্রণ্টেই সে যুগে পার্টির মধ্যেকার দুই বিবদমান রাজনৈতিক ঝোঁক—ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টের অংশভুক্ত পার্টি কর্মীরা রয়েছেন। গণনাট্য সংঘে এই দুই বিবদমান ঝোঁকের যে কয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন তারা শিল্পকলা সৃষ্টির ব্যাপারে তখনো যথেষ্ট পারদর্শী নন—যার জন্য পার্টি'র বাইরের শিল্পীদের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ গণনাট্য সংঘের সৃষ্টির প্রথম থেকেই এ নীতি মেনে চলা হচ্ছিল। এই কারণে শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, কমল মিত্র, জ্ঞান মজুমদার প্রভৃতির উপর কমিউনিষ্ট পার্টি'র রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেকখানি নির্ভর করতেন। ১৯৫৫-৫৭ সালে আমার গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটিতে থাকার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলনে (১৯৫৫) রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ নেওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি'র রাজ্য কমিটি থেকে আমার কাছে প্রস্তাব আসে। কিন্তু আমি তখন নানা কারণে সেই গুরুদায়িত্ব নিতে অস্বীকার করি। একটি কারণ আমি প্রকাশ্য সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিদের কাছে বলেছিলাম। তা' হ'ল—আমি আত্ম-সমালোচনা করে স্থির করেছি—যৌথ নেতৃত্ব গড়ার জন্য আমি ১৫ বছরের মধ্যে সংঘের কোন নেতৃস্থানীয় পদ নেব না—অর্থাৎ সভাপতি, সহসভাপতি বা সম্পাদকের পদ নেব না। এই কারণে রাজ্য কমিটিতে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হই এবং পার্টি'র নির্দেশে শ্রীকমল মিত্রকে সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত করা হয়—সহকারী যুগ্ম সম্পাদক করা হয় পার্টি সদস্য নির্মল ঘোষ ও সজল রায় চৌধুরীকে। এরা যথাক্রমে সংযুক্ত ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টের রাজনৈতিক ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এঁদের দুইজনের ভূমিকা সেই যুগের গণনাট্য সংঘের পরিচালনা ব্যাপারে নানা রকম সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল —যার ফলে কর্মী হিসাবে এঁরা দুজনে প্রায় বসে পড়েছিলেন। আমি বেশ জানি পার্টি'র রাজ্য কমিটি বা কলিকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোনরূপ খবরদারি করা দূরে থাক—তাঁরা শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, কমল মিত্র বা

জ্ঞান মজুমদার প্রভৃতির উপর নির্ভর করতেন যাতে গণনাট্য সংঘ গণতান্ত্রিক কায়দায় পরিচালিত হয়। পার্টির বাইরের লোক দিয়ে পার্টি কর্মীদের নিয়ন্ত্রিত করার এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত লেজুঁড়েপনাতে পরিনত হয়। কিন্তু এইক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার ১৯৫৩ সালে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের সম্মেলনে উপস্থিত কমিউনিষ্ট গণনাট্য কর্মীদের কাছে কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ শিল্পকলা ক্ষেত্রে 'যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়' তাকেই কাজে লাগানোর যে নীতি বাতলান বলে শুনেছি সেই নীতি অনুযায়ী এই ধরণের সাংগঠনিক কায়দা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। তাই শোভার প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা না করে কেবল রীতিবিরুদ্ধভাবে সংগঠনের বাইরে প্রথম প্রকাশ করার জন্য নিন্দা করে তাকে যে অব্যাহতি দেওয়া হল—আপস বা সব কিছু মানিয়ে নেওয়ার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক আদর্শের ভিত্তিতেই তা করা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যন্ত বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করা যেত কিন্তু বর্তমান যুগের গণনাট্য সংঘের কর্মী ও দরদীদের জন্য আরো কিছু তথ্য না দিলে তাঁরা বুঝতে পারবেন না যে ২০ বছর পরে শ্রীমতী সেন আবার কেন ঠিক এখনি সেই বিতর্ক-মূলক প্রবন্ধ মুদ্রিত করতে গেলেন।

প্রথমতঃ শ্রীমতী সেন গণনাট্য সংঘের নেতৃত্ব এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বকে প্রায় এক করে দেখিয়েছেন এবং যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তার সময় নির্দেশ করেন নি। গণনাট্য সংঘ, 'বহুরূপী' বা লিটল 'থিয়েটার' প্রভৃতির মতো কেবল নাটকের দল হিসেবে গড়ে ওঠেনি। নৃত্য, গীত, অভিনয়, লোককলা প্রভৃতিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উপলব্ধিগত বিষয়বস্তু দিয়ে ব্যাপক জনসাধা-রণের চেতনাকে সহজ সাধ্য আঙ্গিকের মাধ্যমে জাগ্রত করা এবং সমাজ পরি-বর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের মনকে প্রস্তুত করার সাংস্কৃতিক কর্তব্য রয়েছে গণনাট্য সংঘের। গণনাট্য সংঘ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বহুমুখীন কর্ম তৎপরতার একটি নিদর্শন। কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও তার ফলা-ফলের দ্বারা গণনাট্য সংঘের গতিবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। কাজেই সেই রাজনৈতিক লাইনের কালানুক্রমিক বিচার না করে কোন গণফ্রণ্টের সাফল্য-অসাফল্য বিচার করা যায় না। তা'ছাড়া সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিশেষ করে গণনাট্য সংঘের সংগঠনের সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠনগুলির কিছু পার্থক্য আছে। মালিক-কর্মচারী ও জমিদার-কৃষকের বিরোধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন গড়ে তোলার পরিবর্তে বুর্জোয়া এবং ফিউডাল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক

আদর্শে অনুপ্রাণিত সুস্থ এবং সংগ্রামশীল সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জন্য সাংস্কৃতিক গুণ সমন্বিত কিছু পার্টি সদস্যদের সঙ্গে পার্টির বাইরের আধা-পেশাদার, পেশাদার ও হবু পেশাদার শিল্পী নিয়ে প্রায় প্রথম থেকেই কাজ করতে হয়েছে। তাই শ্রীমতী শোভা সেন যখন লিখলেন যে তিনি গণনাট্য সংঘে এসে দেখলেন নেতা বলতে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ও সুধী প্রধান—তখন তিনি ভুলই লিখলেন। ফ্রন্টের সাংগঠনিক দিক থেকে বিজন নাট্যকার, শম্ভুবাবু নাট্য পরিচালক এবং আমি প্রাদেশিক সংগঠক আর তৃপ্তি ভাদুড়ী শোভারই মতো সাধারণ সদস্যা। পার্টির দিক থেকে আমার অবস্থান সংঘের নেতৃত্বে ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী নিয়মিত দেখাশোনা করতেন এবং প্রয়োজনবোধে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভবানী সেন ও সংঘের পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের সভায় এসে নানা প্রশ্নের আলোচনায় সাহায্য করতেন। শ্রীমতী সেন 'সংঘ' বনাম 'আন্দোলনের' যে সমস্যা ১৯৫৭ সালের প্রবন্ধে তুললেন —তা' প্রথম উত্থাপন করেন শ্রীশম্ভু মিত্র—"নবান্ন" নাটকের জন্য সর্বক্ষণের দল গড়ার সূচনায়—১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে। শ্রীশম্ভু মিত্র ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীকে এক পত্রে জানাতে চেষ্টা করেন যে, যেভাবে সর্বক্ষণের কর্মী নিয়ে প্রাদেশিক নাটকের দল গড়া হচ্ছে তাতে প্রস্তাবিত নাটকের দল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাড়াটেতে পরিণত হবে বলে তাঁর আশংকা। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে পিপলস্ রিলিফ কমিটি—এই দল গঠনের জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছিল—এই আশায় যে প্রস্তাবিত দল অনুষ্ঠান করে ওই টাকা ফেরত দিতে পারবে। শম্ভুবাবুর পত্রখানি আমিই হাতে করে ভবানীবাবুকে দিই, তিনি তা' পড়ে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং সংঘের পার্টিকর্মী ও সমর্থকদের সভা ডেকে শম্ভুবাবুর পত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। চিঠিটা নষ্ট করে ফেলা হয়। শম্ভুবাবু অবস্থা বুঝে মেনে নিলেন—কারণ তখনো তিনি অখ্যাত। এই যুগের পার্টি রাজনীতিতে যেমন কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার উপর অত্যন্ত ভরসা করা হচ্ছিল—তেমনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও যারা পার্টির রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন অথচ পার্টির মারফতে একটা প্ল্যাটফর্ম চান—সেই সব পেশাদার, আধা-পেশাদার ও হবু পেশাদার শিল্পীদের 'পায়ের তলায় বসে' তাঁদের নির্দেশমতো সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্ম চালাতে বলা হয়েছিল। এরই ফলে সারা ভারতের গণ আন্দোলন থেকে সংগ্রহ করা প্রতিভাশালী পার্টি কর্মীদের নিয়ে বোম্বাই-এ কেন্দ্রীয় নাচের দল এবং

কলকাতায় নাটকের দল কিছু সর্বক্ষণের কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হল। পার্টির ক'লকাতা জেলার সংস্কৃতিকমিটির সংগঠন লোপ আমার চোখের সামনে হয়েছে। এই সংগঠনে সজল রায়চৌধুরী, তৃপ্তি ভাদুড়ি, অরুণ দাসগুপ্ত, নীহার দাশগুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন। বর্তমানে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তী জানেন—গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপের মান উন্নয়নের নামে এই দলটি ভেঙে দিয়ে—তাঁদের সকলকে কেন্দ্রীয় নাটকের দলে আনা হয়। এই ভাবে যোশীর সংস্কারবাদী রাজনীতির ফলে মান উন্নয়নের নামে একটি সত্যসৃষ্ট ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে পেশাদার ও হবু পেশাদার সাংস্কৃতিক নেতা-ভিত্তিক গোষ্ঠী গঠনের সূচনা হ'ল। কিন্তু সংস্কারবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে যতই আন্দোলন প্রবল হতে থাকে—ততই বোম্বাইয়ে এবং কলকাতায় পার্টি কর্মীদের সঙ্গে পেশাদার ও হবু পেশাদার শিল্পীদের বিরোধ দেখা দিতে থাকে। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আসা কংগ্রেস নেতাদের কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার গণফ্রন্টগুলির উপর দৈহিক আক্রমণ (কলিকাতাস্থ গণনাট্য সংঘেব কমিউন আক্রান্ত হয়েছিল)—শান্তি বর্দ্ধন, অবনী দাসগুপ্ত, ববিশঙ্কর, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতির গণনাট্য সংঘ থেকে নিষ্ক্রমণ ত্বরান্বিত করে। শম্ভুবাবুদের গণনাট্য সংঘ ছেড়ে যাওয়ার যে ইতিহাস শ্রীমতী সেন দিয়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। শ্রীমতী সেন যে তথ্যগুলি জানতেন না এমন নয়। তিনি ও তাঁর স্বামী শ্রীগোপাল (দেবব্রত) সেন—পার্টির অত্যন্ত কাছের লোক ছিলেন।

বিজন বাবু 'আনন্দবাজার পত্রিকার' কাজ ছেড়ে গণনাট্য সংঘের সর্বক্ষণেব কর্মী হন মাসিক ১৫০ টাকা ভাতায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তখন তাকে এর অনেক কম বেতন দিত। শম্ভুবাবুকে মাসে ৪৬ টাকা, তৃপ্তি ভাদুড়িকে ৭০ টাকা এবং আর কয়েকজনকে মাসে ৩০ টাকা হিসাবে দেওয়া হ'ত। শম্ভুবাবুর সে যুগে নিয়মিত কোন আয় ছিলনা এবং তৃপ্তি তো ছাত্রী ছিলেন। যখন 'নবান্ন' এর সর্বক্ষণের দল তুলে দেওয়া হয়—তখন পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে একই ভাতায় বিজন বাবুকে "স্বাধীনতা" পত্রিকায় রাখা হবে। পার্টি আশা করেছিল যে বিজনবাবু "স্বাধীনতার" ভ্রাম্যমান রিপোর্টার হিসাবে ঘুরতে পারলে আবার ভালো নাটক লিখতে পারবেন। সে যুগের "স্বাধীনতার" সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতিও এত ভাতা পেতেন না বলে জানি। নাটকের দলের সংকট —প্রথমতঃ নাটকের অভাবের জন্য হয়। বিজন 'জীয়ন কন্যা' গীতিনাট্য

লিখলেন—যা শম্ভুবাবুকে প্রযোজনায় উৎসাহিত করেনি। আরও একটি নাটক 'অবরোধ' বিজন লেখে—তাও মনোমত হয়নি। আসলে 'নবান্নে'র সাফল্যের পর কৃতিত্বের ভাগ নিয়ে ওঁদের মতান্তর শুরু হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নিয়ে আমাদের সে যুগের প্রচেষ্টাতেও শম্ভুবাবুর আপত্তি নিয়ে অনেক লেখা ইতিমধ্যে দিগীনবাবু ও আমি লিখেছি। রিভলভিং ষ্টেজ ছাড়া 'নবান্ন' জমতো না বলে শেষের দিকে তার জনপ্রিয়তা কমেছিল—ফলে সেখান থেকেও আয় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে বুলবুল চৌধুরী ও জ্ঞান মজুমদারের চেষ্টায় যে নাচের দলটি গড়ে উঠেছিল—তাঁদের কাজে প্রথমে যে রূপ বাধা শম্ভুবাবুরা দিয়েছিলেন—গুরুভক্তির আধিক্যে শ্রীমতী সেন তা' ভুলে যেতে পারেন—কিন্তু জ্ঞান মজুমদার আজো বেঁচে আছেন – এবং সে যুগের ইতিহাস লিখে তিনি আমাকে দিয়েছেন। সেই যুগে এই নাচের দলের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন শ্রীমতী সেন। শম্ভুবাবু ও তৃপ্তি বোম্বাইতে গণনাট্য সংঘের 'ধরতি কে লাল' ছবিতে অভিনয় করতে গেলে—বুলবুল ও জ্ঞানবাবু সে যুগের নৃত্যনাট্য 'এই আমার দেশ' সম্পূর্ণ করে অনুষ্ঠান করলেন। শম্ভুবাবুর বোম্বাই যাওয়াতে নাটকের দল দুর্বল হল বলে শ্রীচারু প্রকাশ ঘোষের (তিনি তখন সংঘের সম্পাদক) ঘরে একালের একজন দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট নেতার—যিনি পিপ্‌ল্‌স রিলিফ কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—সামনে আলোচনা করতে—তিনি বলে বসলেন—"এক হিসাবে ভালই হোল—নাচের দলের বাধা দূর হ'ল।" কথাটা আমার ও জ্ঞান মজুমদারের এই কারণে মনে আছে যে আমরা তখনো শম্ভুবাবুদের সহযোগিতাই কামনা করে চলেছি। তা' ছাড়া আমরা জানতাম যে গণনাট্য সংঘের সাধারণ কর্মীদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম এবং তারা সারাদিন অফিস করে অথবা সংসার করে বিনা ভাতায় গণনাট্য সংঘের রিহার্সাল বা অনুষ্ঠানে আসতেন এবং সংঘ প্রদত্ত সামান্য দু পিস পাউরুটির সঙ্গে জেলি ও একটা পাকা কলা ও এক কাপ চা খেয়ে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত অভিনয় করতেন। শ্রীমতী সেন কি ভুলে গেছেন – যে তার গুরুরা বিশেষ খাবার দাবী করে কি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন?

আগেই বলেছি—গণনাট্য সংঘ কেবল নাটকের অভিনয়ের জন্য তৈরী হয় নি, সঙ্গীত ও নাচের দল গড়াতেও তৎপর ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের" গানকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রস্তুত করা এবং নাচের মধ্যে সেগুলিকে ঢোকানো হয়েছিল। তার পর 'শহীদের ডাক' নামে যে ছায়া নৃত্য সে যুগে কুখ্যাত দাঙ্গার

পর—অর্থাৎ 'নবান্ন'র যুগের পর গণনাট্য সংঘ তৈরী করে—তা' সারা বাংলায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারত বিভাগের আগে গণনাট্য সংঘের কোন অনুষ্ঠান সারা বাংলায় এত বেশী স্থানে প্রদর্শিত হয় নি। 'ছায়া নৃত্যের' প্রথম অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি আবৃত্তি করে শম্ভুবাবু শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে সিনেমাগৃহ ত্যাগ করেন এই আশংকায় যে অনুষ্ঠানটি 'ফ্লপ' হবে এবং সংঘের দুর্নাম হবে। পরে লোক মুখে সাফল্যের সংবাদ পেয়ে বিকালে 'স্বাধীনতা' অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন—এবং আলোচ্য ছায়া নৃত্যের আরো উন্নতি করা সম্পর্কে নানা উপদেশ দেন। এছাড়া শম্ভু বাবু ও বিজন বাবুকে না পেয়েও দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নিয়ে যে নাটকাভিনয় চলছিল—একথা শ্রীমতী সেন নিজেই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ নিজেদের পছন্দমত নাটক না করতে পেরে (তারা কোন নাটকের নামও করেননি)—শম্ভুবাবুরা যখন 'ধরতি কে লালের' মারফতে বোম্বাই ও ক'লকাতার ফিল্‌ম জগতে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন—তখন সংঘের সাধারণ সদস্যরা পার্টির বাইরের শিল্পীদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন যার মধ্যে 'ছায়া নৃত্য' একটি বিশিষ্ট অবদান।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে 'ধরতিকে লাল' মারফত শম্ভুবাবু ও তৃপ্তির, গণনাট্য সংঘের বাইরের চলচ্চিত্রে যোগাযোগ, 'সৈনিক' ছবিতে শ্রীচারু প্রকাশ ঘোষ ও আমার এবং গণনাট্য সংঘের অভিনেতা নিমাই ঘোষের পরিচালনায় নির্মিত ছবি 'ছিন্নমূলে' শোভার ফিল্‌ম জগতে প্রবেশ ঘটে। শ্রীমতী সেন কি অস্বীকার করতে পারেন যে এম, পি প্রডাকশনের শ্রীমুরলী ধর চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি লাহা ও বিমল ঘোষের (অগ্রদূত) সঙ্গে পরিচয়—গণনাট্য সংঘে থাকার জন্যই হয়েছিল? 'পরিবর্তন' ছবির পরিচালক শ্রীসত্যেন বসু কি গণনাট্য সংঘের সমর্থক ছিলেন না? শ্রীউৎপল দত্তকে বাদ দিলে আজকের দিনে অনেকের ছায়া ছবিতে প্রবেশ গণনাট্য সংঘের পরিচয় ও যোগাযোগে সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক জগতে গুরুতর পরিবর্তন সূচনা করে। ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারত বিভাগ, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শাসনযন্ত্র দখল ও প্রচণ্ড কমিউনিষ্ট বিরোধীতা—কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে তীব্র আত্ম সমালোচনা ও তার রাজনৈতিক লাইনের পরিবর্তন সূচনা করে। তার প্রতিক্রিয়া সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও দেখা দেয়। মাসে দু হাজার টাকা পার্টি ফাণ্ড থেকে খরচ করে বোম্বাইয়ে গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় নাচের দল বজায় রাখবার জন্য শ্রীপুরণ চাঁদ যোশী

নিন্দিত হ'ন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কলকাতায় নাটকের দলের জন্য মোট ব্যয় ছিল—মাসে ছয় থেকে সাত (৬,৭০০)শত টাকা যা আমরা শেষের দিকে অনুষ্ঠান করে তুলতে পারছিলাম না। যাই হোক—১৯৪৭ সালের নির্বাচনের সময় গণনাট্য সংঘের কোলকাতাস্থ কেন্দ্র আক্রান্ত হ'ল। এখানেই শম্ভুবাবু বোম্বাই যাওয়ার আগে পর্যন্ত থাকতেন। কিন্তু বোম্বাই থেকে ফিরে আর থাকেন নি। ১৯৪৮ সালে শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে যখন গণনাট্য সংঘের কর্মীদের উপর কংগ্রেসী গুণ্ডারা ষ্টেনগানের আক্রমণ চালালো—এবং সুশীল ও ভবমাধব নিহত হলেন—সেই সমাবেশেও শম্ভুবাবু ও বিজন বাবুরা ছিলেন না। কাজেই কেবল অর্থনৈতিক কারণেই শম্ভুবাবুরা গণনাট্য সংঘের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি—তীব্র কংগ্রেসী আক্রমণের সামনে যখন কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯৪২/৪৭ এর পার্টি লাইন বিপ্লবী চিন্তাধারা ও সংগঠনের পথ খুঁজছে—তখন অনেকের 'সখের মজদুরী' ঘুচে গেছে। শম্ভুবাবুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এই ভাবে দীর্ঘতর হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে—আমি আত্ম-গোপন কেন্দ্র থেকে শুনতে পেলাম—শম্ভুবাবু একবার 'নবান্ন' করেছিলেন এবং আমার ভূমিকা শ্রীকালী সরকার মশায় অভিনয় করেন। কিন্তু শ্রীমতী সেন তার ভূমিকায় নামেন নি। কারণ তখনও তিনি বোধ করি তার স্বামী ও দেবর প্রভৃতির রাজনৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সুবিধাবাদের দিকে অগ্রসর হতে পারেননি। তা' ছাড়া তখনো বাইরের সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক দুর্বল ছিল।

'ছিন্নমূল' ছবিতে কাজ করার সময় শ্রীমতী সেনের ছায়াছবির জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, যদিচ 'ছিন্নমূলের' পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক সংখ্যা বেশী ছিল। ফলে আজ যাকে গুরু বলে শ্রীমতী সেন দিল্লী ও ক'লকাতার সরকার পুষ্ট একাডেমি প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন—তখন তাঁর সৃষ্ট 'বহুরূপী'তে তিনি যোগ দেওয়া উচিত বোধ করেন নি।

১৯৪৮-৫১ সালের কংগ্রেসী আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষা ও কাজ চালাবার তাগিদে গণনাট্য সংঘের কর্মীরা কোন কেন্দ্রীয় দল গঠনের পরিবর্তে ভিন্ন নামে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ চালাতে থাকেন। অতিবামপন্থার প্রাবল্য হওয়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও তাতে আচ্ছন্ন হয়। ২৫।৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন ১৯৫২ সালে কিছুটা

সংহত হ'ল—তখন সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের—যার জীবন মাত্র দশবছর, দুর্বলতা সারাবার মতো পার্টি নেতৃত্বের অভাব ঘটলো। 'মার্ক্সবাদী' কাগজে শ্রীভবানী সেনের সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রবন্ধ এমনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে 'সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে স্বাধীনতা'র দাবী সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ধ্বনিত হয়ে থাকে! ইতিমধ্যে মার্কিনী প্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ে 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা' বিষয়ক সম্মেলন হয়ে গেছে এবং কলিকাতায় এশিয়ার 'স্বাধীনতা রক্ষা'র জন্য সমিতি গঠিত হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের এককালের পয়লা নম্বরের নেতারা—তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, সিলেটের বিনোদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাদের মদত দিচ্ছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল গঠনের পারিপার্শ্বিক এইভাবে তৈরী হল—যাদের মধ্যে 'বহুরূপী' শুরুতেই প্রাধান্য পায়। কারণ গণনাট্য সংঘের শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দরদী শ্রীতুলসী লাহিড়ী, শ্রীকালী সরকার, শ্রীগঙ্গাপদ বসু ও মহম্মদ ইসরাইল যোগ দেন। কমিউনিষ্ট পার্টি আবার বৈধ হলে গণনাট্য সংঘের কমিউনিষ্ট কর্মীদের মধ্যে তখনো অতিবামপন্থায় বিশ্বাসীদের সঙ্গে তার বিরোধীদের বিবাদ চলছে—এবং আমার মত কিছু পুরানো লোক যারা এই বিবাদ থেকে আন্দোলনকে উদ্ধার করার চেষ্টায় 'নাট্যচক্রে'র মাধ্যমে 'নীলদর্পণ' করার সঙ্গে সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের সুস্থ রাজনৈতিকবোধ সম্পন্ন কর্মীদের একত্র করার চেষ্টা করছেন তাদের সঙ্গে শ্রীমতী সেন ও শ্রীগঙ্গাপদ বসুও ছিলেন। কারণ 'বহুরূপী' তখনও শক্তিশালী হয়নি।

ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তিত হয়ে গেছে—এবং 'অতিবামপন্থা' সম্পর্কে সাধারণভাবে এমনি ভীতি তখনো রয়েছে যার ভিত্তিতে সংস্কারবাদী রাজনৈতিক ঝোঁক আবার পার্টির মধ্যে দানা বাধতে থাকে। এই যুগেই শ্রীউৎপল দত্ত কিছুদিনের জন্য গণনাট্য সংঘে এসে ট্রটস্কীপন্থী এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন। আমি প্রশ্ন করি—প্রাথমিক অভিযোগ কারা করেছিল? তখনো তো শ্রীনিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষ প্রভৃতি গণনাট্য সংঘের দায়িত্বশীল পার্টি নেতা। কিন্তু কেবল তাঁদের কথায় কি এই কাজ সম্ভব যদিনা রাজ্য পার্টির রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত তাদের পিছনে থাকতো? গণনাট্য সংঘের ১৯৫২-৫৭ সালের যে নেতৃত্বকে দত্ত-সেন জুটি নানাভাবে সমালোচনা করেছেন সে নেতৃত্বে পার্টিগত অবস্থান ছিল শ্রীনিরঞ্জন সেন, নির্মল ঘোষ ও সজল রায়চৌধুরীর। শ্রীনিরঞ্জন সেন না হয়—গান, অভিনয় ও নাটক লেখাতে বিশেষ কোন দক্ষতা দেখান নি—কিন্তু নির্মল ঘোষকে তো উৎপল দত্তের নাটকে

স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাকে নিয়েই গণনাট্যসংঘ বিরোধী 'গণশিল্পী সংস্থা' নামক নকশালী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান দত্ত-সেন জুটি সৃষ্টি করেন। ১৯৫৭ সালে গণনাট্য সংঘের দিল্লী সম্মেলনের পর এই নিরঞ্জন-নির্মল-সজল নেতৃত্বইতো উৎপল বাবুকে রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের কর্মী সমাবেশে শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বলতে দেন—: গণনাট্য সংঘের সমস্ত কর্মীরা কেরালার কমিউনিষ্ট মন্ত্রী সভা গড়ার দৃষ্টান্তে পেশাদার মঞ্চ দখল করুন অর্থাৎ সকলে পেশাদার হন !

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে শ্রীমতী সেন বলেছেন যে ঐ সময় গণনাট্য সংঘের অবস্থা খারাপ ছিল। সময়টাকে নির্দিষ্ট করে বলা উচিত যে ১৯৫৭ সালে গণনাট্য সংঘ কর্তৃক 'নীলদর্পণ' নাটক করার আগের সময়। সেই যুগের যে সকল কর্মী এখনো জীবিত আছেন বা গণনাট্য সংঘের ভিতরে অথবা বাইরে আছেন তাঁরা শ্রীমতী সেনের বক্তব্য মানবেন না। ১৯৫৫ সালে গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলনের পর ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল গড়ার বিরুদ্ধে এবং ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি আন্দোলন চালাবার পক্ষে সাধারণ কর্মীদের সংহতি সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছে। দক্ষিণ কলিকাতা শাখার 'রাহু মুক্ত' যাত্রা তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং 'নবান্নের' মতো যাত্রা পালায় যুগান্তর সৃষ্টি করছে। শম্ভু বাবুরা যে গণনাট্য সংঘকে কলকাতার বাঁধা মঞ্চে আবদ্ধ করে গণসংস্কৃতি আন্দোলনকে অকালে ধ্বংসের পথে চালনা করছিলেন তাকে আবার মাঠে ময়দানে নামানো গেছে। রাজাবাজার, আড়িয়াদহ, উত্তর ও পূর্ব-দক্ষিণ ক'লকাতা, হাওড়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে ছোট নাটক ও গান প্রভৃতি নিয়ে অনুষ্ঠান করার সংখ্যা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় নাচের দল—শ্রীজ্ঞান মজুমদার ও দিলীপ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 'এক পয়সায় ভেঁপু' ও শম্ভু ভট্টাচার্যের 'রানার নৃত্য' নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আজকের দিনের অনেকগুলি বিশিষ্ট সুরকার—এই 'এক পয়সার ভেঁপু'তে সুর সংযোগ করেন। ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে বনগাঁ শহরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে গণনাট্য সংঘ ও তার সমর্থক শিল্পীদের যে সার্থক অনুষ্ঠানগুলি হয় তা' দেখে সেখানে উপস্থিত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা দিল্লীতে সারা ভারত গণনাট্য সংঘ সম্মেলন করার অনুমতি দেন। একদিকে যেমন গঠনমূলক কাজ গণনাট্য সংঘে অগ্রসর হতে থাকে অপরদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঝোঁকওয়ালাদের ধ্বংসাত্মক কাজও চলতে থাকে। দক্ষিণ কলকাতা স্কোয়াড ভেঙ্গে শৌভনিক ও আন্তিক সৃষ্টি হয়। মমতাজ আহমদ মধ্য কলকাতা দল ভেঙে 'অনুশীলন সম্প্রদায়'

গড়লেন এবং সেই ঝোঁকের লোকগুলি বনগাঁর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বানচাল করার যে চেষ্টা করেছিলেন তা বর্তমান গণনাট্য সংঘের সভাপতি শ্রীআশু সেন এবং ২৪ পরগণা কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) বিশিষ্ট নেতা শ্রীশান্তিময় ঘোষ (বাচ্চু) ভালোভাবে জানেন। প্রান্তিক শাখা একদিকে যেমন বীরু মুখার্জির 'সংক্রান্তি' তৈরীর পথে পা বাড়িয়েছিল, অপরদিকে ১৯৫৭ সালের দিল্লী সম্মেলনের জন্য 'নীলদর্পণ' নাটক গণনাট্য সংঘের অন্যান্য শাখার অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করে আমার ও জ্ঞানেশের পরিচালনায়। আর এই নাটক অভিনীত হলে ক'লকাতার বিশিষ্ট সমালোচকরা বলেন যে 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী'র পর 'নীলদর্পণ'ই শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। ইতিমধ্যে শ্রীমতী সেনের আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে। এই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে গণনাট্য সংঘের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী যে বাধা সৃষ্টি করেছিল—শ্রীমতী সেন তাতে মদত যুগিয়েছেন। এখানে বলার দরকার যে মমতাজ আহমদ যখন গণনাট্য সংঘে ছিলেন তখন মধ্যকলিকাতা শাখার 'ইসপাত' নাটকাভিনয়ে গণনাট্য সংঘের পুরানো অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ, কালী ব্যানার্জী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও অভিনয় করি এবং 'ইসপাত' নাটক পরে বহুদিন ধরে চলে। শ্রীমতী সেন এই সব সংবাদ চেপে গিয়ে বলছেন যে সে যুগে যা কিছু নাটক হয়েছে—তা' কেবল 'বহুরূপী' ও 'লিটল থিয়েটার' করেছে।

১৯৫৭ সালে দিল্লীতে সারা ভারত গণনাট্য সংঘের সম্মেলনে আমি ষ্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক হয়েও শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করি। সারা ভারত কমিটিতে অবশ্য আমাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু গণনাট্য সংঘের আদর্শসূচক ঘোষণা নিয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটিতে আমার সঙ্গে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাতে আমি দেখি যে ন্যাশনাল ফ্রন্টওয়ালাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীপুরণচাঁদ যোশী প্রায় প্রত্যক্ষভাবে—সম্মেলনের মধ্যে শিবির প্রতিষ্ঠিত করে এবং নির্মল ঘোষ প্রমুখরা হঠাৎ সব মত পরিবর্তন করেছেন। আমার প্রস্তাবিত আদর্শগত ঘোষণা ছাড়াও চীন থেকে হেমাঙ্গবাবুও একটি ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। হেমাঙ্গবাবু বর্তমানে যেসকল মতামত প্রকাশ করছেন, গণনাট্য সংঘ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত সেই ঘোষণা আজ প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যাই হোক এই যুগ বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার যুগ—সারা বিশ্বের মত ভারতে তার ধাক্কা এসে পড়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের সময় পর্যন্ত ভারতেও এই ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও ডেমক্র্যাটিক

ফ্রন্টের মধ্যেকার লড়াই যে চূড়ান্ত রূপ নিল তা হঠাৎ হয়নি। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সরকার সঙ্গীত-নাটক ও সাহিত্য একাডেমি সৃষ্টি করে এবং মার্কিন চক্র নানারকম বৃত্তি ও অনুদানের সাহায্যে সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীদের কেনার কাজ ত্বরান্বিত করেছে। গণনাট্যের পরিবর্তে 'নবনাট্য আন্দোলন' কথাটা বেশ চালু হয়েছে, সারা ভারত গণনাট্য সংঘের আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে—সর্বভারত সম্মেলন কেন, রাজ্য সম্মেলনও ১৯৫৮ সালের পর আর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির পরিস্থিতি ভিন্ন প্রকারের ছিল বলেই গণনাট্য সংঘের সাধারণ কর্মীরা কোন কোন জায়গায় সংগঠন রক্ষা করেছেন। কিন্তু শ্রীমতী সেনরা যে 'নবনাট্য আন্দোলনের' সুবিধাবাদী দিকটার পক্ষে কি-ভাবে যোগ দিয়েছেন তা' তাঁর প্রবন্ধ থেকেই দেখা যাবে। গণনাট্যের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল নবনাট্যের কোন ধারা পছন্দ তিনি করেছিলেন তা সেখানে আছে।

তিনি লিখেছেন যে 'এপিক থিয়েটারে'র প্রবন্ধ ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত। কিন্তু কেন সংক্ষেপ করলেন? 'মহান গণনাট্য সংঘের' সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়ে কেন বর্তমান যুগের গণনাট্য কর্মী ও দরদীদের কাছে তার মূল্যবান সমালোচনাকে (?) সংক্ষেপ করতে গেলেন? আর শুধু সংক্ষেপ—? তিনি প্রয়োজন মত সেই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কথা বদলিয়ে কেন দিলেন? ১৯৫৭ সালের প্রকাশিত প্রবন্ধের পাশে 'এপিক থিয়েটারের' প্রবন্ধের পরিবর্তন গুলি কি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নয়?

'এপিক থিয়েটারের' ৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় আছে "অধুনা নবনাট্য আন্দোলনের বীজমন্ত্র রোপিত হ'ল 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।" কিন্তু ৮২ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারার পর 'বহুরূপী' প্রসঙ্গে আর একদফা প্রশস্তিপূর্ণ অংশ যা প্রথমে প্রকাশিত প্রবন্ধে ছিল তা' 'এপিক থিয়েটারে' একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এই একই পাতায় 'থিয়েটার সেন্টার' কর্তৃক আয়োজিত প্রথম নাট্যোৎসব সম্পর্কে শ্রীমতী সেনের ১৯৫৭ সালের সপ্রশংস উল্লেখও একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই নয় কি যে বর্তমান যুগের বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা জানেন যে শম্ভুবাবু অনেকদিন আগেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং শ্রীতরুণ রায়ের কমিউনিষ্ট বিরোধী নাটক—ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের দিনে কমিউনিষ্টদের বিনা বিচারে গুলি করে মারতে প্ররোচিত করেছে? অথচ এই

শম্ভু-তরুণ প্রভাবান্বিত কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক একাডেমি থেকে লক্ষাধিক টাকা অনুদান পেয়ে দত্ত-সেন প্রশংসিত নবনাট্য আন্দোলনের কিছু দল নাম ও অর্থ দুই-ই পেয়েছেন এবং গণনাট্য কমিটির পরিবর্তে নবনাট্য, সংনাট্য, টোটাল থিয়েটার ও নান্দনিক থিয়েটার প্রভৃতি কথার জাল বিস্তার করে বিপ্লবী নাট্য আন্দোলনকে কুপথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন। এরপর 'এপিক থিয়েটার'-এর আলোচ্য সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা থেকে মূলের বিরাট অংশ বাদ দিয়েছেন যাতে 'ভ্রান্তির মূল্য' শীর্ষক প্যারাতে সলিল চৌধুরী, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতিদের গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করার একটি সহৃদয় ব্যাখ্যা আছে এবং পেশাদার শিল্পী হলেও যে নবনাট্য মঞ্চ তৈরী করা যায় তার আশ্বাস আছে। পাঠকদের এই নবনাট্য কথাটিকে লক্ষ্য করতে বলি যা শ্রীমতী সেন ব্যবহার করেছেন। 'একটি কর্মসূচী' শীর্ষক প্যারার ৮৬ পৃষ্ঠার শেষ চার লাইনের উপরে যেখানে গণনাট্যকে নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল—তা বর্তমানে বাদ দেওয়া হয়েছে। ঐ পাতায় (গ) শীর্ষক উপ-প্যারায় 'গণনাট্য সংঘে নেই অথচ সক্রিয়ভাবে নবনাট্য আন্দোলন অংশগ্রহণ করেছে'—লাইনটিতে 'নবনাট্য আন্দোলনের' জায়গায় বর্তমানে 'অন্য নাটকে' 'অংশগ্রহণ' করা হয়েছে। (চ) শীর্ষক উপ-প্যারায় ১৯৫৭ সনের লেখা 'নব নাট্যশালার' জায়গায় বর্তমানে 'গণনাট্যশালা' করা হয়েছে। এই ধরণের পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্তকরণকে কি অমনোযোগিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? বরং লেখিকা কিছু গোপন করতে চাইছেন—যেমন উপকথায় বর্ণিত জীবজন্তুরা সিংহ না হয়েও সিংহের পোশাক ধারণ করার চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট পার্টি বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টা প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের 'অদৃশ্য' নেতৃত্বের সমালোচনার একমাত্র অর্থ হল—গত কয় বছরে সি পি এম ও নকশালদের দ্বারা নিন্দিত হয়ে ইন্দিরা-প্রিয় দাস-সুব্রত শরণাপন্নদের বামফ্রণ্টে নেতৃত্ব করার ইচ্ছা, জনতা দলে তরুণ কান্তি ও প্রফুল্ল কান্তির যোগদানের সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলে। অবশেষে উৎপল দত্তের কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রের উপর জরুরী অবস্থার প্রভাব আছে বলে মনে করেন?

উত্তর : আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই যে অশ্লীলতা, মারামারি নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। মহারাষ্ট্র সরকার যে কার্যসূচী নিয়ে এগিয়েছেন—তা যদি পিছিয়ে না

যায় তাহলে নিশ্চয় ভাল হবে। জরুরী অবস্থায় নাটক বা চলচ্চিত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি।...*

[জরুরী অবস্থা সমর্থনে উৎপল দত্তের উপরোক্ত উদ্ধৃতি কিছু লোকের কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি। তাই একই প্রশ্নের জবাবে অভিনেতা রবি ঘোষ যা বলেছেন—তার থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন—পার্থক্য কি। রবি ঘোষ বলেছিলেন: 'ঠিক আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। তবে সাংঘাতিক সব কাণ্ডকারখানা দেখানো বন্ধ করাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

জরুরী অবস্থায় নাটকের দল, নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্র, ও সঙ্গীত শিল্পীরা আক্রান্ত হন নি এই কথাই কি বিশ্বাস করতে হবে?]

...'নেই মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড মাও সে তুং। কিন্তু আছে তাঁর সবুজ বিপ্লবী মনের চিন্তায় রাঙিয়ে দেওয়া চীনের জনগণ।'*...

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।